পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন সিলেবাস অনুসারে লিখিত।

রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যা

(নবম শ্রেণী)

ডক্টর **ডি. পি. রায়চৌধুরী,** ডি, এস্‌সি
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক,
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব।

ও

ডক্টর **এ. কে. সেনগুপ্ত,** ডি, এস্‌সি
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অজৈব রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক

মুখার্জী ব্রাদার্স
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৪৭

প্রকাশক :
শিবনাথ দাস
মুখার্জী ব্রাদার্স
১৮এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীপার্বতীচরণ রায়
দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়র্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রস্তাবনা

তিনটি মৌলিক বিষয় বা ধারণাকে ভিত্তি করিয়া সম্পূর্ণ পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের দুইটি হইল (১) স্থান বা দেশ (Space) ও (২) কাল বা সময় (Time)। এই দুইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তৃতীয় যে ধারণাটি তাহার নাম (৩) পদার্থ (Matter)। পদার্থ দেশ ও কালে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইহাদের একটিকে বাদ দিয়া অন্যটির আলোচনা সম্ভব নয়।

'দেশ' কথাটি বিজ্ঞানী যে অর্থে ব্যবহার করেন, নূতন বলিয়া তাহা বুঝিতে প্রথমে তোমাদের অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ক্রমশ ইহা বুঝিতে পারিবে, এবং আমরা মনে করি সহজেই পারিবে। 'দেশ' বলিতে প্রথমে পদার্থহীন, সম্পূর্ণ শূন্য স্থান মনে করিতে পারে।

ধর, তোমার পেনসিল দিয়া তুমি একটি রেখা টানিলে। এই রেখার উপর কোন বিন্দুর অবস্থান তুমি রেখার প্রথম বিন্দু হইতে উহার 'দূরত্ব' মাপিয়া বুঝাইতে পার। এবার কল্পনায় রেখাটি তুমি উহার নিজের সমান্তরালে খানিক দূর সরাইয়া নিলে। প্রথম রেখাটি ও তাহার সরণে একটি 'ক্ষেত্র' (Area) গঠিত হইল। ঐ ক্ষেত্রে কোন বিন্দুর অবস্থান বুঝাইতে তুমি ঐ বিন্দু হইতে প্রথম রেখার উপর একটি লম্ব টান। রেখার মূল বিন্দু হইতে লম্বের পাদবিন্দুর দূরত্ব এবং লম্বের দৈর্ঘ্য উল্লেখ করিলেই বিন্দুটির সঠিক অবস্থান বুঝাইবে। ক্ষেত্রে অবস্থান বুঝাইতে দুইবার দৈর্ঘ্যের উল্লেখ করিতে হয়।

আবার কল্পনায় ঐ ক্ষেত্রকে নিজের সমান্তরালে উপরের দিকে খানিকটা সরাও। ইহাতে একটি 'আয়তন' (Volume) গঠিত হইল। এই আয়তনের ভিতরের কোন বিন্দুর অবস্থান বুঝাইতে সেখান হইতে ক্ষেত্রের প্রথম অবস্থানের উপর লম্ব টান। এই লম্বের পাদবিন্দুর অবস্থান বুঝাইতে তোমার দুইটি দৈর্ঘ্যের উল্লেখ করিতে হইবে। তাহার সঙ্গে শেষের টানা লম্বের দৈর্ঘ্যের উল্লেখ করিয়া আয়তনের ভিতরের যে কোন বিন্দুর অবস্থান বুঝাইতে পারা যাইবে। দেখা যায় ইহাতে তিনবার দৈর্ঘ্যের উল্লেখ করিতে হয়।

ভাবিতে পার 'দেশ'-এর সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক কি? কল্পনায় প্রথম রেখাটিকে উভয় দিকে সীমাহীনভাবে প্রসারিত মনে কর। এই রেখা সীমাহীনভাবে নিজের সমান্তরালে চলিয়া সীমাহীন ক্ষেত্র তৈয়ারি করুক। এই সীমাহীন ক্ষেত্র আবার সীমাহীনভাবে নিজের অবিলম্বে চলিয়া সীমাহীন আয়তন সৃষ্টি করুক। এইভাবে যে বিরাট আয়তন সৃষ্ট হইল তাহাকেই আমরা 'দেশ' বলি। আমাদের মহাবিশ্ব

(Universe) এইরূপ দেশে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। মহাবিশ্বের আয়তন সসীম কি অসীম সে আলোচনা এখন থাক। তিনবার দৈর্ঘ্য উল্লেখ করিয়া দেশে অবস্থান বুঝাইতে হয় বলিয়া ইহাকে আমরা 'ত্রিমাত্রিক দেশ' (Three dimensional space) বলি।

দেশ মহাবিশ্বের সর্বত্র ব্যাপিয়া আছে। তাহাতে কোথাও পদার্থ আছে, কোথাও পদার্থ নাই। পদার্থ থাকিলে দেশের সেখানে বৈচিত্র্য হইল, না থাকিলে দেশ কেবল বৈচিত্র্যহীন দেশই রহিয়া গেল। বৈচিত্র্য আনিল পদার্থ।

'কাল' বা সময় নদীর স্রোতের মত বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু কালস্রোত সর্বদাই বর্তমান হইতে ভবিষ্যতের দিকে চলে—বর্তমান হইতে অতীতে কোথাও নয়। এরূপ কেন হয় সে কথা আজ পর্যন্ত কেহই বলিতে পারেন নাই। কালেও কোন বৈচিত্র্য নাই। দেশ ছাড়া কাল আমরা কল্পনা করিতে পারি না এবং কালের গতি বুঝিতে আমাদের পদার্থের দরকার হয়। সূর্য উঠিল, সূর্য অস্ত গেল—আমরা বুঝিলাম দিন রূপ কাল গত হইল।

ইট, কাঠ, বাড়ি-ঘর, গাছপালা, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত, গ্রহ, নক্ষত্র, যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই সকলই পদার্থ দেশ, কাল ও পদার্থ লইয়াই আমাদের মহাবিশ্ব। মনে করিতে পার দেশ ও কাল যেন রঙ্গমঞ্চ এবং পদার্থ সেই রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা। দেশ বা কালে কোন বৈচিত্র্য নাই।

এত যে বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ, এমন কিছু কি আছে যাহা সকল পদার্থেই বিদ্যমান? বিজ্ঞানী ইহার উত্তর দিয়াছেন—বলিয়াছেন 'আছে'। সকল পদার্থে বিদ্যমান যে ধর্ম আমরা তাহার নাম দিয়াছি 'ভর' (Mass)। কোন পদার্থের ছোট বা বড একটি খণ্ডকে আমরা বলি 'বস্তু' (Body)। কোন বস্তু অর্থাৎ পদার্থখণ্ডে, যে পরিমাণ পদার্থ আছে তাহাকেই বস্তুটির ভর বলি। দেশের ভিত্তি দৈর্ঘ্য। পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নের মূলে দৈর্ঘ্য, সময় ও ভর ভিত্তিস্বরূপ। ইহাদের বর্ণনা বা সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের বোধ নিজ হইতে গড়িয়া ওঠে। এই তিনটির সাহায্যেই পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নসংক্রান্ত সকলপ্রকার রাশিই আমরা বর্ণনা করিতে পারি। শেষোক্ত রাশিগুলিকে 'ভৌত' রাশি (physical quantity) বলা হয়।

দৈর্ঘ্য, কাল ও ভর বোধের যন্ত্রগুলি প্রকৃতি যেন আমাদের জন্মের সঙ্গে দেহের ভিতরেই দিয়া দিয়াছেন। শুইয়া থাকি, বসিয়া থাকি বা চলিতে থাকি, সময় চলিয়া যাইতেছে আমরা বুঝিতে পারি। সময় মাপনের একপ্রকার ব্যবস্থা—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন—দেহের ভিতরেই রহিয়াছে। সেকেণ্ডে মোটামুটি একবার, কখন দ্রুততর,

কখনও মন্থর গতিতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সারাজীবন ধরিয়াই চলিয়াছে। খুব কম সময় বুঝাইতে বলি 'চোখের পলক'।

দূরত্ব বোধও আমাদের অন্তর্নিহিত। 'কাছে' বা 'দূরে' আমরা শিশুকালেই বুঝিতে পারি। একটু বেশী দূরত্ব হইলে আমরা হাত মাপিয়া দূরত্ব বুঝাই। কম হইলে দুই আঙুল ফাঁক করিয়া উহা বুঝাই। বেশী হইলে দুই হাত ফাঁক করিয়া উহা বুঝাই।

পদার্থের জ্ঞান প্রধানত আসে আমাদের চোখের অনুভূতিতে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও পদার্থ ও জড়জগৎ সম্বন্ধে আমাদের নানা প্রকার জ্ঞান দেয়। কানে নানা শব্দ শুনি, গন্ধের সাহায্যে অনেক পদার্থ চিনিতে পারি, স্পর্শে উষ্ণতা বুঝি। স্পর্শ ও স্বাদের সাহায্যে অনেক পদার্থ চিনিতে, এবং দেখিতে একরকম হইলেও এক পদার্থ হইতে অন্যকে (যেমন চিনি হইতে নুন, চকের গুঁড়া হইতে ময়দা, ইত্যাদি) পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারি। হাত, পা বা পিঠের মাংসপেশীর টানে বস্তু কি রকম ভারী তাহাও বুঝিতে পারি।

ইন্দ্রিয়গুলি পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের নানা প্রকার বোধ দিতে পারিলেও, কেবল উহাদের সাহায্যে নির্ভরযোগ্য মাপন হয় না। **প্রয়োজনমত সূক্ষ্ম মাপন এবং মাপনের ফল সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারাই বিজ্ঞানের ভিত্তি।** তা ছাড়া ইন্দ্রিয়গুলি অনেক ক্ষেত্রে ভুল করে। চোখের ভুলের সঙ্গে তোমরা পরিচিত। সিনেমার পর্দার ছবিগুলি আসলে সচল না তাহা বোধহয় সকলেই জান। প্রতি সেকেণ্ডে কোন দৃশ্যের যোল বা চব্বিশ খানা ছবি ফিল্মে তুলিয়া একই গতিতে ছবিগুলি পর্দায় ফেলা হয়। চোখে কোন ছবির ছাপ $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড থাকে। কাজেই একখানার ছাপ মিলাইতে না মিলাইতে অন্য ছবি দেখা দেয়। ইহাতে ছবি সচল বলিয়া মনে হয়। চোখ আমাদের ভুল বুঝাইল; যেখানে গতি নাই সেখানে গতি দেখাইল। দৃষ্টিবিভ্রমের অন্য নানারকম উদাহরণ আছে।

অন্য একটি উদাহরণ দেখ। এক পাত্রে ঠাণ্ডা জল এবং অন্য পাত্রে গরম জল নিয়া দুহাত পাত্রে ডুবাও। পরে অন্য পাত্রে রাখা অল্প গরম জলে দু হাত এক সঙ্গে ডুবাও ইহাতে আগের 'ঠাণ্ডা' হাতে মনে হইবে জল গরম ও 'গরম' হাতে মনে হইবে জল ঠাণ্ডা। তোমার স্পর্শেন্দ্রিয় ঠকিল। কান ভুল শোনা, দুজনে একই গন্ধ দুরকম মনে করা—ইন্দ্রিয়ের এরকম ভুলের বা গরমিলের উদাহরণ তোমরা অনেক পাইয়াছ এবং একটু নজর রাখিলে আরও পাইবে। এই সকল কারণে বিভিন্ন ভৌতরাশি মাপনের জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে হয়। একই মাপন স্থূলভাবে বা সূক্ষ্মভাবে করিতে সাধারণত বিভিন্ন গঠনের যন্ত্র দরকার হয়। বিজ্ঞানের ছাত্র শিক্ষার প্রথম স্তরে স্থূল মাপনেই সন্তুষ্ট থাকেন।

SYLLABUS

CLASS—IX

(Common to both Physics & Chemistry)
Page limit of the text-book.

Common to both Physics & Chemistry	— 30	pages
Physics	— 47	,,
Chemistry	— 53	,,
Total	— 130	pages

(A single text-book covering the items)
[Double Demy (1/16). Small Pica Type.]

1. Systems of measurement. Different physical quantities and their units. Measuring devices. Ordinary scale, common balance, measuring cylinders, clocks. [14 pages]
2. Matter and energy. Mass and weight, conservation of mass and conservation of energy. Different forms of energy. Transformation of energy (non-quantitative treatment). [8 pages]
3. Change of state. Freezing, melting, boiling, evaporation and condensation. Melting point and boiling point, Factors affecting them. Idea of latent heat. [8 pages]

PHYSICS

CLASS—IX 47 pages

1. Rest and motion ; Displacement, speed, velocity, acceleration and retardation. Newton's laws of motion. Definition of force. (Equations of motion excluded. Rotational motion excluded). [10 pages]
2. Work, energy and power—potential and kinetic energy. Units (No sums). Simple mechines-inclined plane, wheel and axle and levers (Not mathematical). [9 pages]
3. Nature of heat. Heat and temperature. Factors determining the quantities of heat. Heat as a form of energy. Relationship with work. [8 pages]

4. Source of light. Ray of light. Reflection and Refraction of light. Total internal reflection. Explanation of some natural phenomena on the basis of refraction and total reflection. Propagation and velocity of light. Convex lens and its focussing action. Focal length. Convex lens as a magnifying glass.
Dispersion of light, Spectrum (Demonstration). [20 pages]

CHEMISTRY 53 pages

CLASS—IX

1. (i) Physical states of matter—reasons for existence of the three states—Melting and boiling points.
(ii) Identification of matter—physical and chemical properties—How matter (solid, liquid and gas) differs in physical properties (touch, colour, smell, solubility, magnetic property etc.) and chemical properties (behaviour on heating, treatment with acids etc.)
(iii) Physical and chemical changes : factors which induce and regulate chemical changes viz. contact, temperature, pressure, catalysis etc. Exothermic and Endothermic change :
(iv) Elements and compounds—Metals and Nonmetals.
[16 pages]
2. Solution—Solvent and solute : Unsaturated and saturated solution. Solubility and its relation with temperature.
[4 pages]
3. Symbols, formula and chemical equations : Significance of chemical equations and balancing, simple equations.
[5 pages]
4. Electrolysis—Electrolytes and non-electrolytes—Decomposition of water : Electroplating. [6 pages]
5. Ideas of acids, bases and salts : Neutralization. [3 pages]
6. Oxidation and reduction [2 pages]
7. Liquid air. Nitrogen and CO_2 Cycle (Elementary ideas) : use of the rare gases in air, Neon lighting, [5 pages]
8. Simple method of preparation and properties of Oxygen, Hydrogen, Nitrogen, Ammonia, Carbon dioxide, Sulphur dioxides, Sulphuretted hydrogen. [12 pages]

বিষয়সূচী

প্রথম অংশ

দ্বিতীয় অংশ—পদার্থ-বিদ্যা

তৃতীয় অংশ—রসায়ন

প্রথম অংশ

(রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যা উভয়ে প্রযোজ্য)

I-1. মাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি (Systems of measurement)। পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন যে বর্তমানে এত আগাইয়া গিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে সূক্ষ্ম মাপন। মাপন সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিনের একটি উক্তি খুবই মূল্যবান। উক্তিটির ভাবার্থ এইরূপ—"আলোচ্য বিষয় মাপিয়া সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারিলে তখনই বোঝা যাইবে উহা সম্বন্ধে কিছু জানা গিয়াছে। অন্যথায় ঐ বিষয়ে জ্ঞান অতি সামান্য এবং সন্তোষজনক নয় মনে করিতে হইবে।" উক্তিটির মূল্য তোমরা ক্রমশ বুঝিতে পারিবে; কথাটি মনে রাখিও।

আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে দৈর্ঘ্য, সময়, ওজন, আয়তন প্রভৃতি কয়েকটি রাশি মাপিতে হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সকল রাশির সংখ্যা আরও অনেক বেশী এবং বিচিত্র; তাহাদের কথা পরে বলা হইবে। কিছু মাপিতে গেলে দেখিতে পাইবে তোমরা অনুরূপ একটি রাশির সঙ্গে উহার তুলনা করিতেছ। তোমাকে যদি স্কুলের তোমার বসিবার বেঞ্চটির দৈর্ঘ্য কত মাপিতে বলা হয়, তুমি হয়ত হাত মাপিয়া বলিবে উহা পাঁচ হাত। বেঞ্চ কতটা চওড়া জানিতে চাহিলে তুমি বিঘৎ মাপিয়া হয়ত বলিবে উহা দেড় বিঘৎ। বেঞ্চের বসিবার কাঠখানা কত মোটা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি হয়ত বলিবে দুই আঙুল।

তোমার কাছে একফুট লম্বা স্কেল থাকিলে উপরের প্রশ্নগুলির হয়ত অন্য রকম উত্তর দিতে। বলিতে 'বেঞ্চ লম্বায় সাত ফুট, চওড়ায় দশ ইঞ্চি এবং উহার কাঠ এক ইঞ্চি মোটা। কিংবা আরও সূক্ষ্ম মাপ বলিবার চেষ্টায় বলিতে ঐ রাশিগুলি 7 ফুট 2 ইঞ্চি, 10·3 ইঞ্চি ও 0·9 ইঞ্চি।

এমনও হইতে পারে যে তোমার স্কেলের অন্য পাশে সেন্টিমিটারে দাগ কাটা আছে এবং তুমি জ্ঞাতব্য রাশিগুলি সেন্টিমিটারে মাপিয়া বলিলে।

বেঞ্চের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ মাপনের যে উদাহরণ এখানে আমরা আলোচনা করিলাম তাহা হইতে মাপন সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি :

১। দৈর্ঘ্য রূপ রাশিটি মাপিতে আমরা পরিমেয় রাশিকে (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বা বেধকে) অনুরূপ আর একটি রাশির (অর্থাৎ হাত, বিঘৎ, আঙুল, ইঞ্চি বা সেন্টিমিটারের) সঙ্গে তুলনা করিয়াছি।

২। তুলনার জন্য যে রাশিটি নেওয়া হয়, তাহাকে ঐ রাশির 'একক' বলে। এখানে 'হাত', 'বিঘৎ', 'আঙুল', 'ইঞ্চি', 'সেন্টিমিটার' এইগুলিকেই একক হিসাবে নেওয়া হইয়াছে।

৩। এককের তুলনায় পরিমেয় রাশিটি কতগুণ সেই সংখ্যা এবং এককের নাম বলিলে পরিমেয় রাশির মান সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়।

উপরের উদাহরণ হইতে 'একক' সম্বন্ধেও কয়েকটি বিষয় দেখিবার আছে :

(ক) 'হাত', 'বিঘৎ', 'আঙুল' জাতীয় একক কাজের পক্ষে সুবিধার নয়, কারণ বিভিন্ন লোকের হাত, বিঘৎ বা আঙুলের মাপ সমান নয়। এ রকম একক ব্যবহার করিলে বিভিন্ন লোক একই জিনিসের দৈর্ঘ্য মাপিয়া বিভিন্ন মান পাইবে। এক জনের মাপে যাহা ঠিক পাঁচ হাত, অন্যের মাপে তাহা হয় কিছু বেশী না হয় কিছু কম হইবার সম্ভাবনা বেশী।

(খ) ইঞ্চি বা সেন্টিমিটার একক হিসাবে অনেক ভাল, কারণ সকল স্কেলেই দেখা যায় ইঞ্চিগুলির দৈর্ঘ্য বা সেন্টিমিটারগুলির দৈর্ঘ্য সমান। ইহাতে উপরের (ক)-অংশে বলা গোলমালটা হইতে পারে না।

(গ) ইঞ্চি বা সেন্টিমিটার একক হিসাবে ভাল মানিলাম। কিন্তু উহাদের মধ্যে কোন্‌টি লইব ?

(ঘ) কেহ একটি কেহ অন্যটি লইলেও দুয়ের সম্পর্ক অর্থাৎ এক ইঞ্চিতে কত সেন্টিমিটার বা এক সেন্টিমিটারে কত ইঞ্চি, তাহা জানা থাকা দরকার। তাহা হইলে ইহাদের যে এককেই মান প্রকাশ করা যাক না কেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবে।

(ঙ) তবে একই রাশির (এখানে আলোচিত ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যের) ভিন্ন প্রকার এককের সংখ্যা যত কম হয় ততই ভাল। একথা সকল রাশির এককের ক্ষেত্রেই খাটে।

অতএব পৃথিবীর সর্বত্র, অর্থাৎ সব দেশে, একই রাশির মাত্র একটি করিয়া একক থাকিলে সব চেয়ে সুবিধা হয়। বিজ্ঞান ইহা করিতেই প্রয়াস পাইয়াছে। মাপ ও মাপন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে। বর্তমানে তাঁহারাই বৈজ্ঞানিক মাপনের এককগুলি স্থির করিয়া দেন। বিজ্ঞানে জাতিভেদ বা রাষ্ট্রভেদের বিচার নাই; পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিকই বিজ্ঞানসংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেদের একই গোষ্ঠীর লোক বলিয়া মনে করেন এবং উপরোক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশ মানিয়া চলেন। বৈজ্ঞানিক মাপনে এজন্য পৃথিবীময় মাত্র একটি পদ্ধতিই প্রচলিত। উহার সঠিক নাম আমরা পরে বলিব; এখন ঐ পদ্ধতিকে আমরা **মেট্রিক পদ্ধতি** (Metric system) বলিয়া উল্লেখ করিব।

বিজ্ঞানীরা নিজেদের এক গোষ্ঠীর লোক বলিয়া মনে করিলেও বিভিন্ন দেশে ভাষা, কৃষ্টি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি নানাপ্রকারের প্রভেদ রহিয়াছে। দৈনন্দিন ব্যাপারে নিজেদের জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র বা ঐতিহ্যগত প্রভেদ কেহ সহজে ছাড়িতে চান না। দৈনন্দিন কাজে দৈর্ঘ্য, ওজন, আয়তন ইত্যাদি মাপনের ক্ষেত্রেও এই প্রভেদ রহিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দেশে এগুলিতে নানাপ্রকার পার্থক্য দেখা গেলেও দুটি পদ্ধতি সব চেয়ে বেশী প্রচলিত। ইংরেজী ভাষা-ভাষী দেশে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত অনেকগুলি দেশে এই সকল কাজে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজেও **বৃটিশ পদ্ধতি** (British বা English system) বলিয়া একটি পদ্ধতি প্রচলিত। ফ্রান্স্ ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং তাহাদের পূর্বতন বা বর্তমান উপনিবেশগুলিতে প্রধানত সকল কাজেই মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলিত। মেট্রিক পদ্ধতির উৎপত্তি ফ্রান্সে ও বৃটিশ পদ্ধতির উৎপত্তি ইংলণ্ডে।

মেট্রিক পদ্ধতিই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও বৃটিশ পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমরা কিছু কথা বলিব। জান বোধ হয় কিছুকাল হইতে ভারত সকল বিষয়েই মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। আগে এখানে বৃটিশ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

প্রশ্ন। মাপনের মেট্রিক ও বৃটিশ পদ্ধতি কাহাদের বলে বুঝাইয়া বল।

I-2. বিভিন্ন ভৌত রাশি ও তাহাদের একক (Different physical quantities and their units)। পদার্থ-বিদ্যার সূত্রগুলি প্রকাশ করিতে যে সকল রাশির দরকার হয় তাহাদের আমরা 'ভৌত রাশি' (Physical quantity) বলি। ইহাদের সবগুলিই পরিমেয়, অর্থাৎ ইহাদের মাপা যায়। ভৌত রাশি কথাটি আরও বিস্তৃত অর্থেও অনেকে ধরিয়া থাকেন। যে রাশি মাপা যায় এবং যাহার মাপনের ফল সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়, তাহারা সকলেই ভৌত রাশি।

পদার্থ-বিদ্যা বা রসায়নে দৈর্ঘ্য, সময় ও ভর ছাড়া ক্ষেত্রফল, আয়তন, ঘনত্ব, বেগ, ভরবেগ, ত্বরণ, বল, চাপ প্রভৃতি অন্যান্য বহুপ্রকার রাশি মাপিতে হয়। ইহাদের সবগুলির সঙ্গে তোমাদের এখনও পরিচয় ঘটে নাই ; ক্রমশ ঘটিবে।

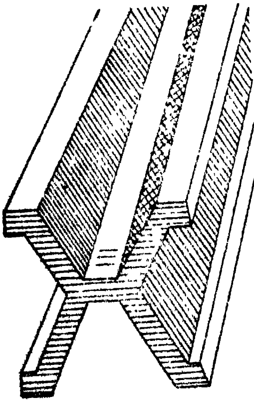
প্রত্যেক রাশির মাপনের জন্য একটি করিয়া এককের দরকার হয় একথা আমরা আগেই বুঝিয়াছি। প্রত্যেক রাশির জন্য পরস্পর সম্পর্কবিহীন একটি করিয়া একক আমরা অবশ্যই নিতে পারিতাম। তাহাতে যতগুলি রাশি ততগুলি একক হইত, এবং উহাদের সংখ্যা হইত প্রচুর। অতগুলি আলাদা আলাদা একক লইয়া কাজ করিতেও অসুবিধা হইত অনেক।

কিন্তু বিজ্ঞানী এ অসুবিধা হইতে দেন নাই। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমশ বুঝিতে পারিলেন মৌলিক তিনটি রাশির, অর্থাৎ (১) দৈর্ঘ্য, (২) ভর ও

(৩) কালের একক স্থির করিয়া দিলে উহাদের দিয়াই প্রয়োজনীয় অন্যান্য রাশির এককও স্থির করা যায় ; প্রত্যেকের জন্য আলাদা একক দরকার হয় না।

[প্রসঙ্গত এখানে বলিয়া রাখি, বিদ্যুৎ, তাপ ও আলোক সম্বন্ধীয় মাপনে ঐ তিনটি মৌলিক এককের সাহায্যে সকল মাপন প্রকাশ করা যায় না। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ঐ তিনটি ছাড়া চতুর্থ আর একটি এককের দরকার হয়। তাপ এবং আলোকেও ঐ রূপ। কিন্তু ইহা লইয়া তোমাদের এখন চিন্তা করার কিছু নাই। উহাদের সঙ্গে যথাকালে তোমাদের পরিচয় ঘটিবে।]

I-2.1. মেট্রিক পদ্ধতির মৌলিক একক। আগেই বলিয়াছি বিজ্ঞানের কাজে পৃথিবীর সর্বত্র মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলিত এবং উহার জন্ম ফ্রান্সে। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর নবগঠিত ফরাসী-সরকার দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য একটি সংস্থা গঠন করিয়া উহার উপর অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দৈর্ঘ্য, ভর ও কালের একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি বা 'মানক' (Standard) স্থির করার ভার দেওয়া হয়। এই সংস্থা স্থির করিলেন মানকগুলি প্রাকৃতিক কোন না কোন স্থির রাশি অনুসারে ঠিক করা হইবে। সাব্যস্ত হইল দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি বা মানক হইবে 'বিষুব রেখা হইতে প্যারিসের মধ্য দিয়া যে দ্রাঘিমা রেখা উত্তর মেরু পর্যন্ত গিয়াছে, সেই দ্রাঘিমা বরাবর মাপা দৈর্ঘ্যের এক কোটি বা দশ 'মিলিয়ন' (10^7) ভাগের এক ভাগ'। সেই অনুসারে একটি মাপকাঠি তৈয়ারি হয়, এবং তাহাকেই দৈর্ঘ্যের মানক (Standard) মিটার (Metre) বলা হয়। ইহার হিসাবে পৃথিবীর পরিধি হওয়া উচিত ছিল চার কোটি বা চল্লিশ 'মিলিয়ন' (4×10^7) মিটার। পরে সূক্ষ্মতর মাপনে টের পাওয়া যায় যে বাস্তব মিটার দণ্ডটি কল্পিত মিটারের চেয়ে প্রায় 0·2 মিলিমিটার ছোট। তাহা সত্ত্বেও পরে আন্তর্জাতিক সম্মতিক্রমে ঐ বাস্তব মিটারকেই দৈর্ঘ্যের মানক ধরা হয়।


I.1 চিত্র

এই মিটার দণ্ড 90 ভাগ প্ল্যাটিনাম ও 10 ভাগ ইরিডিয়ামের সংকর ধাতুতে তৈয়ারি। উহার এক অংশ I.1 চিত্রে দেখান হইয়াছে। দণ্ডের ছেদ, এবং চওড়া ও খাড়াই ছবিতে যেমন দেখা যাইতেছে আসলে প্রায় তাহাই। দণ্ডের দুই প্রান্তের কাছে তিনটি করিয়া সমান্তরাল সূক্ষ্ম দাগ কাটা আছে। (এক পাশের তিনটি দাগ ছবিতে দেখান আছে।) দুপাশের

দাগগুলির ঠিক মাঝখানের দাগ দুটির মধ্যে 0° সেলসিয়াস (0°C বা 0°সি) উষ্ণতায় যে দূরত্ব, তাহাই এক **মিটার**। এই দণ্ডটি মাপ সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার জিম্মায় প্যারিসের কাছে সুরক্ষিত আছে। ইহাকে 'মূল আন্তর্জাতিক মিটার' (International Prototype Metre) বলে। বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঠিক এই রকম দণ্ড তৈয়ারি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী ঐ বৈজ্ঞানিক সংস্থা আরও ঠিক করেন যে, যে কোন মানকের ভগ্নাংশ ও গুণিতাংশ দশমিক প্রথায় প্রকাশ করা হইবে, এবং বিশেষ বিশেষ গুণিত বা ভগ্ন অংশ বুঝাইতে মানকের নামের আগে একটি বিশেষ শব্দাংশ বা উপসর্গ বসাইতে হইবে। বেশী ব্যবহৃত উপসর্গগুলির নাম নিচে দেওয়া হইল .

মেগা	=	দশ লক্ষ গুণ (10^6) বা 'মিলিয়ন' (Million)	সেণ্টি	=	শতাংশ (10^{-2})
কিলো	=	হাজার গুণ (10^3)	মিলি	=	সহস্রাংশ (10^{-3})
			মাইক্রো	=	দশলক্ষাংশ (10^{-6}) বা মিলিয়ন অংশ

এক সেণ্টিমিটার মিটারের শতাংশ। এক কিলোমিটার এক হাজার মিটার। আন্তর্জাতিক প্রথার অনুকরণে আমরা মিটারকে সংক্ষেপে 'মি' (ইংরেজী m), কিলোমিটারকে 'কিমি' (ইংরেজী km), সেণ্টিমিটারকে 'সেমি' (ইংরেজী cm) ইত্যাদি রূপে লিখিব। উপসর্গ ও মানকের নামের মাঝখানে কোন ফুটকি বা ড্যাশ চিহ্ন দিব না। [ইংরেজী বা অন্য ভাষায় centimetre-কে c-m বা c. m. না লিখিয়া কেবল cm লেখা হয়। সংক্ষিপ্ত নামের পরেও কোন ফুটকি না দেওয়াই- বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রথা। বিজ্ঞান সব কিছুতেই অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য বর্জন করিতে চায়।]

ভরের মানকের নাম **কিলোগ্রাম** (Kilogram)। ইহার সহস্রাংশের নাম **গ্রাম** (Gram)। দশ সেণ্টিমিটার বাহুবিশিষ্ট ঘনকে 4° সেলসিয়াস (বা সেণ্টিগ্রেড) উষ্ণতায় এক বায়ুমণ্ডল চাপে যে পরিমাণ বিশুদ্ধ জল ধরে তাহার ভরকেই ভরের মানক ধরিতে চাওয়া হইয়াছিল। সেই অনুসারে মিটার দণ্ডের মত একই সংকর ধাতুতে সমান উচ্চতা ও ব্যাসের (প্রায় 39 মিমি) একটি বেলন (cylinder) তৈয়ারি করা হয়। পরে দেখা যায় ঐ পরিমাণ জলের চেয়ে বেলনটি 28 মিলিগ্রাম বেশী ভারী। তাহা সত্ত্বেও এই বেলনের ভরকেই মিটার দণ্ডের মত আন্তর্জাতিক সম্মতিক্রমে ভরের মানক ধরা ঠিক হয়। এই বেলনকে 'মূল আন্তর্জাতিক কিলোগ্রাম' (International Prototype Kilogram) বলে। ইহা মূল মিটারের সঙ্গে একই জায়গায় রাখা আছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঠিক একই রকম বেলন তৈয়ারি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী ঐ সংস্থা আয়তনেরও একটি মানক ঠিক করেন। তাহার নাম হয় **লিটার** (Litre)। 4° সেলসিয়াস উষ্ণতায় এক বায়ুমণ্ডল চাপে এক কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ জলের আয়তনই হইল এক লিটার।

মিটার, কিলোগ্রাম বা লিটারের ক্ষেত্রে উষ্ণতার উল্লেখ দরকার, কারণ উষ্ণতা বদলাইলে দৈর্ঘ্য বদলায়। তা ছাড়া বিভিন্ন উষ্ণতায় নির্দিষ্ট ভর জলের আয়তনও আলাদা হয়। 4° সেলসিয়াসে (আসলে 3.8°-তে) জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। তাই কিলোগ্রাম ও লিটারের ক্ষেত্রে জলকে তাহার ঘনতম অবস্থায় লইবার কথাই বলা হইয়াছে। জলের আয়তন চাপের সঙ্গে সামান্য হইলেও একটু বদলায়। তাই সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট চাপের কথাও বলা হইয়াছে। জান বোধ হয় আগে যাহাকে সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী বলা হইত এখন তাহাকেই সেলসিয়াস ডিগ্রী (Celsius degree বা °C) বলা হয়। বেতার ঘোষণায় উষ্ণতার উল্লেখ সেলসিয়াস ডিগ্রীতে করা হয়, কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।

প্রশ্ন। মিটার ও কিলোগ্রাম কিভাবে স্থির করিতে চাওয়া হইয়াছিল? লিটার কাহাকে বলে?

কালের মানক **গড় সৌর সেকেণ্ড (Mean solar second)** বা সংক্ষেপে 'সেকেণ্ড' (সে)। পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনের জন্য যে কোন স্থানে পর পর দুইবার মধ্যরেখা (meridian) বা সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করিতে সূর্যকে যে সময় নিতে দেখা যায়, তাহা হইল এক সৌর দিন। নিজ কক্ষে পৃথিবীর গতি বৎসরের সব ঋতুতে সমান হয় না বলিয়া, বৎসরে সকল সৌর দিনও সমান হয় না। গ্রীষ্মকালে পৃথিবী নিজ কক্ষে একটু দ্রুত চলে বলিয়া সৌর দিন বড় হয়, শীতকালে ছোট। সৌর দিনের গড় মানকে 24 ঘণ্টায়, ঘণ্টাকে 60 মিনিটে এবং মিনিটকে 60 ভাগ করিলে সময়ের যে ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায় তাহাই এক গড় সৌর সেকেণ্ড। গড় সৌর দিনে $24 \times 60 \times 60 = 86,400$ গড় সৌর সেকেণ্ড হয়। ভূগোলে হয়ত পড়িয়াছ দূর তারাগুলি সাপেক্ষে পৃথিবী নিজ অক্ষে পুরা এক পাক ঘুরিতে সময় নেয় 86,164 সেকেণ্ড। ইহাকে এক নাক্ষত্র দিন বলে। বৎসরে নাক্ষত্র দিনের সংখ্যা সৌর দিনের চেয়ে ঠিক এক বেশী।

মানক ও এককের প্রভেদ। কোন রাশি মাপিতে এককের দরকার হয় বলিয়াছি। কিন্তু সেই একক পাইবার জন্য কোন মাপকাঠি যদি ঠিক করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই মাপকাঠিকে বলে মানক (Standard)। একক মানকের সমান বা অংশ বিশেষও হইতে পারে।

(ক) এককের সি-জি-এস্ পদ্ধতি (C. G. S. System of units)। মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেণ্ড যথাক্রমে দৈর্ঘ্য, ভর ও কালের মাপকাঠি বা মানক

হিসাবে ব্যবহার করা হইবে ইহা ঠিক হইয়া গেলে বিজ্ঞানে মাপনের জন্য কোন্‌টির কোন্ অংশ একক হিসাবে ব্যবহার করা হইবে তাহা স্থির হয়। প্রথমে মিটারের শতাংশ সেন্টিমিটারকে দৈর্ঘ্যের একক, কিলোগ্রামের সহস্রাংশ গ্রামকে ভরের একক এবং গড় সৌর সেকেণ্ডকেই কালের একক নেওয়া সাব্যস্ত হয়। এই তিনটি হইল সিজিএস্ পদ্ধতিতে মাপনের **মৌলিক একক**।

যৌগিক একক (Derived units)। ক্ষেত্রফল (Area), আয়তন (Volume), ঘনত্ব (Density), বেগ (Velocity), ভরবেগ (Momentum), ত্বরণ (Acceleration), বল, চাপ প্রভৃতি অন্যান্য ভৌত রাশির একক এই তিনটি মৌলিক এককের সাহায্যেই প্রকাশ করা যায় বলিয়া উহাদের জন্য আলাদা এককের কোন ব্যবস্থা করা দরকার হয় না। এক সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের একক হইতে পারে। ইহার জন্য কোন ধাতুপাত নিয়া তাহার ক্ষেত্রফলকে একক বলার দরকার হয় না। এক সেমি বাহুবিশিষ্ট ঘনকের আয়তন আয়তনের একক, সেকেণ্ডে এক সেমি দূরত্ব বেগের একক, এক গ্রাম ভরের বস্তু সেকেণ্ডে এক সেমি বেগে চলিলে উহার ভরবেগকে ভরবেগের একক হিসাবে নেওয়া যায়। অন্যভাবে ইহাদের কাহারও একক ঠিক করা দরকার হয় না। উল্লিখিত অন্যান্য রাশিগুলির ক্ষেত্রেও একক একইভাবে ঠিক করা হয়। উহার যেটি যখন আমাদের আলোচনায় আসিবে তখন তাহার এককের কথা বলা হইবে।

এক ঘন সেণ্টিমিটার (1 সেমি^{3}) আয়তনের একক হইলেও তরল পদার্থের আয়তন মাপনে লিটার ও তাহার সহস্রাংশ মিলিলিটারও ব্যবহৃত হয়। ঔষধ সংক্রান্ত ব্যাপারে মিলিলিটারে (ইংরেজীতে ml) প্রচলন বেশী; পণ্যের (যেমন কেরোসিন, পেট্রল ইত্যাদির) ব্যাপারে লিটার। পদার্থ-বিদ্যার কাজে আমরা মিলিলিটার ব্যবহার করি না; কিন্তু রসায়নে ইহা ব্যবহার হয়। 1 মিলিলিটার $=1{\cdot}000028$ সেমি^{3} হওয়ায় দুয়ের প্রভেদ অতি সামান্য। সাধারণ কাজে এ প্রভেদ উপেক্ষা করা যায়। এই কারণ 1 মিলিলিটার বা 1 ঘন সেন্টিমিটার জলের ভর 1 গ্রাম ধরা যায়।

সেন্টিমিটার, গ্রাম ও সেকেণ্ডকে মৌলিক এক ধরিয়া বৈজ্ঞানিক মাপনের যে পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইল তাহার নাম হইল এককের সিজিএস্ পদ্ধতি। লক্ষ্য কর সি, জি, এস্ (c. g. s) অক্ষর তিনটি সেন্টিমিটার (centimetre), গ্রাম (gram) ও সেকেণ্ড (second) কথা তিনটি আদ্যক্ষর।

(খ) এককের এম্-কে-এস্ পদ্ধতি (M. K. S. System of units)। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও উহার প্রয়োগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, এবং অন্য কোন কোন কারণেও, সিজিএস্ পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি অসুবিধা দেখা গেল। ইহা লইয়া

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থায় অনেক আলোচনা হয়, এবং ঐ অসুবিধাগুলি যথাসম্ভব দূর করার জন্য তাঁহারা 1954 খ্রীষ্টাব্দে এক সম্মেলনে (Tenth General Conference of Weights and Measures) মিলিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে মিনার, কিলোগ্রাম ও সেকেণ্ডকে যথাক্রমে দৈর্ঘ্য, ভর ও কালের একক হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অন্যান্য ভৌত রাশির এককও এই নূতন মৌলিক এককগুলি অনুসারে পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে ব্যবহৃত এককের এই পদ্ধতিকে এম্ কে এস্ (mks) পদ্ধতি বলে। লক্ষ্য কর এম্, কে, এস্ অক্ষর তিনটি মিটার (metre) কিলোগ্রাম (kilogram) ও সেকেণ্ড (second) কথা তিনটির আদ্যক্ষর। ইঞ্জিনিয়ারিং-এও এম্‌কেএস্ পদ্ধতি ব্যবহৃত হইতেছে। উন্নত দেশগুলি হইতে সিজিএস্ পদ্ধতি কার্যত লোপ পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা এ বিষয়ে কিছু পিছাইয়া আছি, কারণ অনেকে তাঁহাদের পরিচিত পুরাতন সিজিএস্ পদ্ধতি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রথম হইতে এম্‌কেএস্ পদ্ধতি অনুসরণ করিলে একাধিক পদ্ধতি শিখিতেও হয় না, এবং পরে অনেক অসুবিধার হাত হইতে বাঁচা যায়।

এম্‌কেএস্ পদ্ধতিতেও যৌগিক এককগুলি ইহার মৌলিক একক তিনটি হইতেই পাওয়া যায়।

প্রশ্ন। এককের এমকেএস্ ও সিজিএস্ পদ্ধতিতে প্রভেদ কি? উভয় পদ্ধতির মৌলিক এককগুলি বর্ণনা কর।

মৌলিক একক হইতে যৌগিক একক কিভাবে পাওয়া যায় তাহার তিনটি উদাহরণ দাও।

এক ঘন সেন্টিমিটার বা এক মিলিমিটার জলের ভর এক গ্রাম ধরা যায় কেন?

I-2. 2. বৃটিশ বা এফ্ পি এস্ পদ্ধতি (British or F P S. System)। এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক ফুট (foot), ভরের একক পাউণ্ড (pound) ও কালের একক সেকেণ্ড (second)। ইংরেজী কথা কয়টির প্রথম অক্ষর লইয়া পদ্ধতির নামকরণ হইয়াছে। ইংলণ্ড উহার উৎপত্তিস্থান; তাই উহাকে বৃটিশ পদ্ধতিও বলা হয়। লণ্ডনে রাখা বিশেষ একটি ব্রোঞ্জদণ্ডের দুই প্রান্তের কাছের দুইটি দাগের মধ্যে 62° ফারেনহাইট উষ্ণতায় যে দূরত্ব, তাহা হইল এক গজ (yard)। ফুট ইহার তৃতীয়াংশ। ভরের একক পাউণ্ড একই জায়গায় রাখা একটি প্ল্যাটিনাম বেলনের ভর। সেকেণ্ড আমাদের পরিচিত গড় সৌর সেকেণ্ড। বৃটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুসারে ইহাদের প্রচলন হয়।

বৃটিশ পদ্ধতির যৌগিক এককগুলি ইহার মৌলিক এককগুলির সাহায্যেই ঠিক করা।

বৃটিশ পদ্ধতিতে আয়তনের একটি ব্যবহারিক একক হইল গ্যালন (gallon)। ইহা 62° ফারেনহাইট উষ্ণতায় দশ পাউণ্ড জলের আয়তন।

মেট্রিক ও বৃটিশ পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্ক

1 পাউণ্ড = 453·6 গ্রাম	1 কিলোগ্রাম (কেজি) = 2·2046 পাউণ্ড
1 ইঞ্চি = 2·54 সেমি	1 মিটার = 39·37 ইঞ্চি
1 ফুট = 30·48 সেমি	1 সেন্টিমিটার = 0·3937 ইঞ্চি

এই তালিকাটি এক পদ্ধতির মাপকে অন্য পদ্ধতির মাপে পরিণত করিতে পারে। ইহার প্রথম ও তৃতীয় সম্পর্কটি মনে রাখিলেই বাকী সবগুলি পাওয়া যায়।

বৃটিশ পদ্ধতির তুলনায় মেট্রিক পদ্ধতির বড় সুবিধা হইল মেট্রিক পদ্ধতিতে দশমিক ব্যবহার। এককের গুণিতাংশ ও ভগ্নাংশগুলি মাত্র দশমিক বিন্দুর জায়গা বদলাইয়া বা 10-এর ঘাত পরিবর্তন করিয়াই পাওয়া যায়। কিন্তু বৃটিশ পদ্ধতিতে তাহা নয়। উদাহরণ দেখ—1 কিমি $=10^3$ মি $=10^5$ সেমি, ইত্যাদি। কিন্তু 1 মাইল = 1760 গজ = 1760 × 3 ফুট = 1760 × 3 × 12 ইঞ্চি।

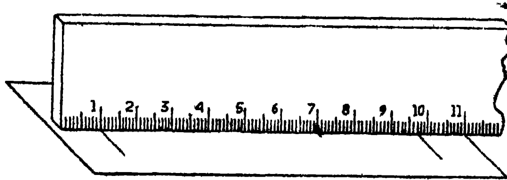
তাছাড়া, মেট্রিক পদ্ধতি মূল মানকগুলিকে প্রাকৃতিক স্থির রাশির সঙ্গে মিলাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ মানকগুলির সেরকম কোন গুণ নাই। মেট্রিক মানক ঈপ্সিত মানকের সঙ্গে সঠিক না মিলিলেও, প্রাকৃতিক স্থির রাশির সঙ্গে মানকের সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছে। এরকম করিলে মূল মানক কোন ভাবে নষ্ট হইলেও উহা ফিরিয়া আবার গড়া যায়। সাম্প্রতিককালে মিটার ও সেকেণ্ডকে প্রাকৃতিক স্থির রাশির সঙ্গে আরও সঠিকভাবে সম্পর্কিত করা হইয়াছে। ক্রমশ হয়ত কিলোগ্রামকেও করা হইবে।

প্রশ্ন। বৃটিশ পদ্ধতির তুলনায় মেট্রিক পদ্ধতির সুবিধা কি? এক পাউণ্ডে কত গ্রাম এবং এক ইঞ্চিতে কত সেন্টিমিটার বল। 100 গজ দৌড়ের মাঠ বাড়াইয়া 100 মিটার করিতে উহা আগের কত শতাংশ বাড়াইতে হইবে? এক গ্যালন জল ও পাঁচ লিটার জলে ভরের প্রভেদ মোটামুটি কত গ্রাম?

I-3. মৌলিক রাশিগুলির মাপন যন্ত্র (Measuring devices)। বিজ্ঞানসংক্রান্ত মাপনের প্রথম স্তরে দেখিতে পাইবে তোমাকে দৈর্ঘ্য ভর বা সময় মাপিতে হইতেছে। প্রাথমিক স্তরের কয়েকটি মাপনযন্ত্র সম্বন্ধে নিচে কিছু বলা হইল। বিভিন্ন সূক্ষ্মতায় মাপনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্র দরকার। বেশী সূক্ষ্ম মাপন যন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়ায় জটিলতা বেশী। প্রাথমিক স্তরে মাপনের জন্য যে সূক্ষ্মতা দরকার, সেই সূক্ষ্মতা দিতে পারে এমন যন্ত্রের কথাই এখানে বলা হইবে। কেবল মাত্র যন্ত্রগুলির বর্ণনা পড়িয়া বিশেষ কোন লাভ হইবে না। শিক্ষক মহাশয়ের সহায়তায় যন্ত্রগুলি দেখিও ও তাহা দিয়া কিছু মাপিও, তবেই উপকার পাইবে ও শিখিবে

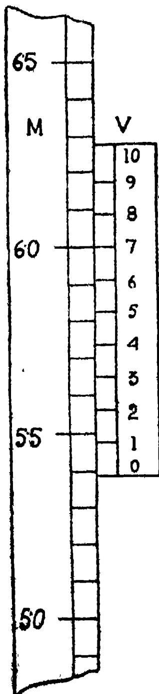
I-3. 1. দৈর্ঘ্য মাপন। পরীক্ষাগারে দৈর্ঘ্য মাপন প্রাথমিক স্তরে বেশীর দিকে বড়জোর 2-3 মিটার ও কমের দিকে মিলিমিটারের দশাংশ (বড় জোর শতাংশ) পর্যন্ত হইতে পারে। সূক্ষ্মতা বুঝিয়া দু তিনটি যন্ত্রের সাহায্যেই এরূপ মাপন হইতে পারে।

(ক) **মিটার স্কেল।** ইহা এক মিটার লম্বা কাঠের বা ইস্পাতের একটি স্কেল। স্কেলে সেন্টিমিটারের দাগ কাটা। প্রত্যেক সেন্টিমিটারকে আবার দশভাগ করিয়া



I.2 চিত্র

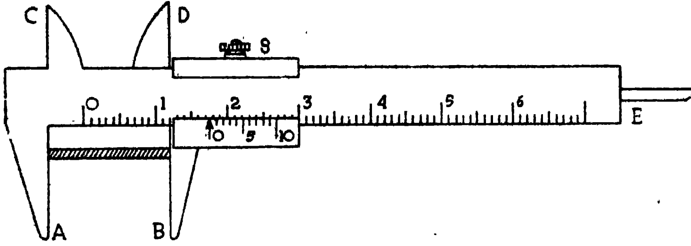
মিলিমিটারের দাগ কাটা থাকে। ইহার সাহায্যে কোন দূরত্ব মিটার, সেন্টিমিটার ও মিলিমিটারে মাপা যায়। মিলিমিটারের ভগ্নাংশ কিছুটা চোখের আন্দাজে (Eye estimation-এ) ঠিক করা যায়। কিন্তু ইহার জন্য অভ্যাস দরকার। দুই বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব মাপিতে স্কেলের দাগগুলি উহাদের যত কাছে পার আনিবে (I.2 চিত্র দেখ)।



I.3 চিত্র

(খ) **ভার্নিয়ার স্কেল (Vernier scale)।** মিলিমিটারের ভগ্নাংশ আরও সঠিকভাবে পাইতে মূল স্কেলের সঙ্গে আর একটি স্কেল ব্যবহার করা যায় ; ইহাকে ভার্নিয়ার (vernier) স্কেল বলে। দুই স্কেলের ভাগগুলি সমান নয়। 9 মিলিমিটারকে 10টি সমান ভাগ করিয়া ভার্নিয়ার স্কেলে দাগ কাটা থাকিলে, দুই স্কেলের এক এক ভাগের তফাত হইবে 1/10 মিলিমিটার (0·1 মিমি=0·01 সেমি)। এই তফাতকে ভার্নিয়ার স্কেলের স্থিরাঙ্ক (vernier constant) বলে। I.3 চিত্রে দেখান ভার্নিয়ার স্কেলের 7-এর দাগ মূলস্কেলের 6·0 দাগের সঙ্গে মিলাইয়া রাখা হইয়াছে। ঐখান হইতে হিসাব করিলে দেখিতে পাইবে ভার্নিয়ারের শূন্য (0) দাগের পাঠ মূল স্কেলে 5·37। মূল স্কেলের ছোট দাগগুলি যদি মিলিমিটার বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ভার্নিয়ারের সাহায্যে মিলিমিটারের ভগ্নাংশ তুমি 0·7 বলিয়া পাইয়াছ। এরূপ ভার্নিয়ারে 0·1 মিমি পর্যন্ত পাওয়া যায়।

(গ) স্লাইড ক্যালিপার্স (Slide Calipers)। ইহাতে (I.4 চিত্র) ভার্নিয়ারের প্রয়োগ দেখিতে পাইবে। যখন পরিমেয় বস্তুর দৈর্ঘ্য বেশী হয় না, তখনই মাপন সূক্ষ্ম হওয়া দরকার; নহিলে মাপনে ত্রুটি তুলনায় বেশী হয়। স্লাইড ক্যালিপার্সে মূল স্কেলের দৈর্ঘ্য মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার (ধর 10 বা 15 সেমি) হয়



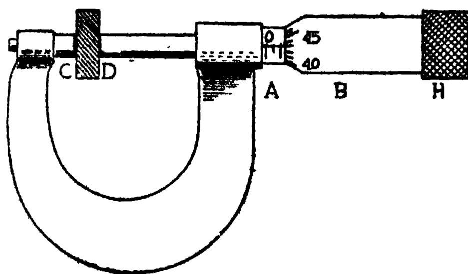
I.4 চিত্র

এবং ইহার ভার্নিয়ারের স্থিরাঙ্ক হয় সাধারণত 0·1 মিমি। S স্ক্রুর সাহায্যে ভার্নিয়ার সরাইয়া যে কোন জায়গায় আটকান যায়। মূল স্কেলের A ও ভার্নিয়ারের B দাঁড়া দুইটি গায় গায় ঠেকিয়া থাকিলে মূল স্কেলের ও ভার্নিয়ারের 0-দাগ দুটি মিলিয়া থাকে। যে বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপিতে হইবে তাহার এক দিক A-তে এবং অন্য দিক ভার্নিয়ারের B-তে ঠেকাইয়া S স্ক্রু আঁটিয়া দেখ ভার্নিয়ারের কোন্ দাগ মূল স্কেলের কোন্ দাগের সঙ্গে মিলিয়াছে। ইহা হইতে I.3 চিত্রের মত হিসাব করিয়া নির্ণেয় দৈর্ঘ্য পাইবে। I.4 চিত্রে A ও B-র মধ্যের দণ্ডের দৈর্ঘ্য মূল স্কেলের 1·75 ঘর ইহা বুঝিতে পার কি?

C, D-র সাহায্যে কোন নলের ভিতরের মাপ ও E-র সাহায্যে কিছুর গভীরতা মাপা যায়।

(ঘ) স্ক্রু গেজ (Screw gauge)। I.5 চিত্রে ইহার চেহারা দেখান হইয়াছে। H মাথা ঘুরাইলে A বেলনের ভিতর দিকে সুষম থাক কাটা স্ক্রুর সাহায্যে একটি দণ্ডের সমতল D প্রান্ত আগায় বা পিছায়। A-র গায় বেলনের অক্ষের সমান্তরালে মিলিমিটার (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্ধ মিলিমিটারেরও) দাগ কাটা একটি রৈখিক স্কেল থাকে। স্ক্রুর থাক (pitch) এক বা আধ মিলিমিটার হয়, অর্থাৎ H-মাথা সম্পূর্ণ এক পাক ঘুরাইলে D-তল এক বা আধ মিলিমিটার সরে। এই দূরত্বকেই যন্ত্রের থাক (pitch) বলে। H ঘুরাইলে A-র বাহিরে B বেলনও আগায় পিছায়। B-র বাঁ দিকের ঢালু প্রান্তের পরিধিকে 50 বা 100 সমান ভাগ করিয়া দাগ কাটা থাকে। D যখন C-র গায় ঠেকিয়া থাকে, তখন A-র রৈখিক

স্কেলের ও B-র গোল স্কেলের 0-দাগ দুইটি মিলিয়া থাকে। যাহা মাপিতে হইবে তাহা C ও D-র ফাঁকে উহাদের গায় ঠেকিয়া থাকে। এই অবস্থায় রৈখিক স্কেল হইতে মিলিমিটার বা অর্ধ মিলিমিটার, এবং গোল স্কেল হইতে তাহার 50 বা 100



I.5 চিত্র

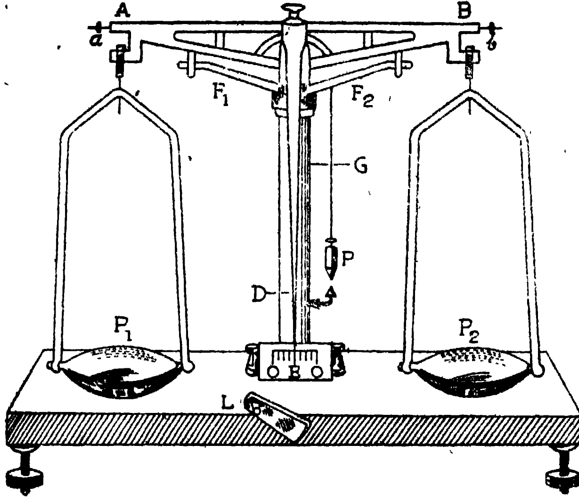
অংশ পর্যন্ত পাঠ পাওয়া যায়। যন্ত্রের থাক এক মিলিমিটার ও গোল স্কেলে 50 ভাগ থাকিলে, গোল স্কেলের এক ভাগ সরানতে D 1/50 = 0·02 মিমি সরে। এইরূপ অংশকে, অর্থাৎ যন্ত্রের সাহায্যে দৈর্ঘ্যের যে ন্যূনতম অংশ মাপা যায় তাহাকে, যন্ত্রের 'অল্পতমাঙ্ক' (Least Count) বলে।

[মিটার স্কেল দিয়া একটি আস্ত পেনসিলের দৈর্ঘ্য, এবং স্লাইড ক্যালিপার্স ও স্ক্রু গেজ দিয়া বিভিন্ন স্থানে উহার ব্যাস মাপিয়া দেখিও।]

I-3. 2. ভর মাপন। দোকানে ও বাজারে দাঁড়িপাল্লা দিয়া ওজন করিতে সকলেই দেখিয়াছ। ইহা ভর মাপন। কেহ এক কিলোগ্রাম (কেজি) জিনিস কিনিলে, কেহ 200 গ্রাম, কেহ বা মসলার দোকানে মাত্র 10 গ্রাম ছোট এলাচ কিনিলে। কয়লা কিনিতে হয়ত 40 কেজি চাহিবে। লক্ষ্য করিয়া থাকিবে বেশী ওজনের জন্য যে রকম দাঁড়িপাল্লা ব্যবহৃত হয়, কম ওজনের জন্য তাহা নয়। সোনারের দোকানের নিক্তিতে গ্রামের দশমাংশও মাপা যাইতে পারে। নিক্তি এবং ছোট বা বড় দাঁড়িপাল্লা সবগুলি একই উপায়ে ভর মাপে। সকল ক্ষেত্রেই জানা কতকগুলি ওজন, যেমন 10 কেজি, 1 কেজি, 500 গ্রাম, 100 গ্রাম, 10 গ্রাম, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। দাঁড়িপাল্লা বা নিক্তির এক পাত্রে এই জানা ওজনগুলি থাকে, অন্যদিকে থাকে পণ্য। দাঁড়িপাল্লার আড়া ঠিক সোজা (অনুভূমিক) হইলেই (অর্থাৎ একদিকে কাত হইয়া না থাকিলেই) বোঝা গেল ওজন ঠিক হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক মাপনের সাধারণ তুলা (Common balance)। বৈজ্ঞানিক মাপনে সাধারণত কয়েক গ্রামের চেয়ে বেশী ভারী পদার্থ মাপিবার দরকার হয় না এবং

মাপনের সূক্ষ্মতা প্রাথমিক স্তরে এক গ্রামের দশমাংশ হইলেই চলে। ইহার জন্য যে দাঁড়িপাল্লা, বিজ্ঞানের ভাষায় 'তুলা', ব্যবহৃত হয় তাহার গঠন I.6 চিত্রে দেখান হইয়াছে। AB তুলাদণ্ড বা তুলার আড়া (Balance beam), P_1 ও P_2 তুলার পাত্র (Pan)। AB দণ্ডের ঠিক মাঝখানে এক খণ্ড তেশিরা ইস্পাত বা আগেট



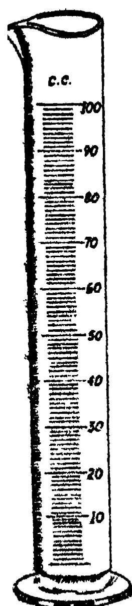
I 6. চিত্র

(agate) পাথরের টুকরা দণ্ডের আড়াআড়ি করিয়া লাগান। উহার একাধার নিচমুখী ; ইহাকে ক্ষুরধার (Knife-edge) বলে। ক্ষুরধার তুলার মাঝখানের G স্তম্ভের মাথায় সমতল পাতের উপর বসান। P_1 ও P_2 পাত্র দুইটি ক্ষুরধার হইতে সমান দূরত্বে AB আড়া হইতে ঝুলান। ক্ষুরধারের সঙ্গে লাগান লম্বা একটি কাঁটা বা 'সূচক' (Pointer) D আড়া দুলিলে, E-স্কেলটির উপর দিয়া এপাশ ওপাশ সরিতে পারে। ব্যবহারের কাল ছাড়া অন্য সময় তুলা পাত্র সমেত আড়া F_1F_2 ফ্রেম বা মঞ্চের উপর স্থিরভাবে বসান থাকে। কাজের সময় L লিভার ঘুরাইয়া মঞ্চ নামাইয়া নিলে ক্ষুরধারের উপর AB দুলিতে থাকে ও D সূচক E স্কেলের উপর আনাগোনা করে। AB-র দুপাশে a ও b ভার দুইটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সূচককে E স্কেলের ম্যাঝখানে সরান যায়। দরকার হইলে a, b-র সাহায্যে প্রথমে D-কে E-র মাঝখানে আনিয়া নেওয়া হয়। পরে L লিভার উল্টাদিকে ঘুরাইয়া AB-কে মঞ্চে আটকাইয়া P_1 পাত্রে পরিমেয় বস্তু ও P_2 পাত্রে আন্দাজ মত ভর বসাইয়া L আবার ঘুরাইয়া সূচক কোন্ দিকে সরিল দেখিতে হয়। আবার AB-কে মঞ্চে আটকাইয়া দরকার মত জানা ওজন বাড়াইয়া বা কমাইয়া সূচককে ক্রমে প্রাথমিক দাগে আনিতে হয়।

এই অবস্থা ঘটিলে পরিমেয় বস্তুর ভর জানা ওজনগুলির ভরের সমান হয়। এইভাবে ভর মাপা হয়।

মনে রাখিও প্রতিবার ওজন বাড়াইবার বা কমাইবার আগে AB-কে যন্ত্রে আটকাইয়া লইতে হইবে। নহিলে যন্ত্রের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। জানা ওজনগুলি একটি বাক্সে সাজান থাকে। ইহাকে 'ওজনের বাক্স' (Weight box) বলে। এই ওজনগুলি কখনও হাতে ধরিতে নাই। উহাদের ধরিবার জন্য বাক্সে একটি চিমটা (Tongs) দেওয়া থাকে। ওজনগুলি 500 গ্রাম হইতে 0·2 বা 0·1 গ্রাম পর্যন্ত হইতে পারে।

তুলাপাত্র দুলিতে থাকিলে D সূচকের সঠিক অবস্থান জানা যায় না বলিয়া ওজনও ঠিক হয় না। হাওয়ায় যাহাতে তুলা পাত্রগুলি না দোলে সে জন্য সম্পূর্ণ তুলাটি দুপাশে বা সামনে দরজাওয়ালা একটি কাচের বাক্সে থাকে। দরজা খুলিয়া বস্তু ও ওজন বসান হয়। তুলার আড়া যে G স্তম্ভের উপরে বসান থাকে তাহাকে ঠিক খাড়া রাখা দরকার। সে জন্য G-তে একগাছা ওলন দড়ি (P) লাগান থাকে। P-র সরু মাথা G-তে লাগান আর একটি কাঁটার ঠিক উপরে থাকিলেই বোঝা যায় G-স্তম্ভ ঠিক খাড়া হইয়াছে। তুলার পাটাতনের নিচে লেভলিং স্ক্রু (Levelling screw) আছে। দরকার হইলে ঐগুলি ঘুরাইয়া G-কে ঠিক খাড়া করা হয়। ইহা অবশ্য দরকার।



I.7 চিত্র

সূক্ষ্মতর মাপনের তুলায় জটিলতা বেশী। উহাতে এক মিলিগ্রাম (·0·001 গ্রাম) সূক্ষ্মতায় মাপন হইতে পারে। ইহার চেয়েও সূক্ষ্মতর মাপন যন্ত্র আছে।

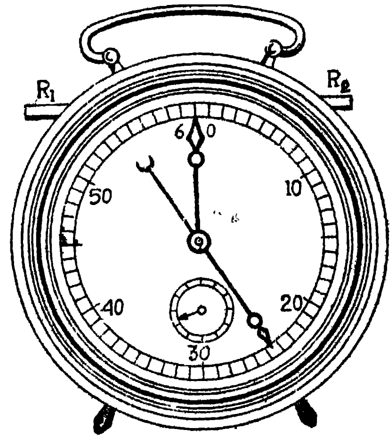
I-3.3. আয়তন মাপন। কঠিন, তরল বা বায়বীয় বস্তুর আয়তন মাপন এক উপায়ে হয় না। প্রধানত তরলের আয়তন মাপনের জন্য ঘন সেন্টিমিটারে দাগ কাটা কাচের বা পলিথিনের বেলন ব্যবহার করা হয় (I.7 চিত্র)। ইহাদের আমরা **'মাপক বেলন'** (**Measuring Cylinder**) বলি। বিভিন্ন আয়তনের জন্য সরু, মোটা, খাট, লম্বা নানা আকারের বেলন ব্যবহার হয়। 5 ঘন সেন্টিমিটার হইতে 1000 ঘন সেন্টিমিটার পর্যন্ত মাপার জন্য বিভিন্ন বেলন থাকে। আকার বুঝিয়া বেলনগুলির সবচেয়ে ছোট দাগের মান 1 ঘন সেমি হইতে 0·1 ঘনসেমি পর্যন্ত হইতে পারে। ঘন সেন্টিমিটারকে ইংরেজীতে cubic centimetre বলে ও সংক্ষেপে উহাকে cm^3 লেখা হয়। রসায়নে সাধারণত

cm^3 এর বদলে c.c. বা cc-র প্রচলন বেশী দেখা যায় ; মাপক বেলনের দাগগুলি মিলিলিটারে (ml-এ)-ও দেওয়া থাকে।

যে সকল কঠিন বস্তু জলে ডোবে অথচ গলে না, এমন বস্তুর আয়তনও মাপক বেলনের সাহায্যে পাওয়া যায় কি ভাবে, তাহা এখন আমাদের আলোচ্য নয়।

I-3.4. সময় মাপন। ঘড়ির সাহায্যে সময় মাপা হয়। দেওয়াল ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি (Timepiece), পকেট ঘড়ি, হাতঘড়ি—কতরকমের ঘড়িই না আছে ! উহারা সকলেই 12 ঘণ্টা হইতে 1 মিনিট বা এক সেকেণ্ড পর্যন্ত মাপে। বিজ্ঞানের কাজে আমাদের সময়ের একটা ব্যবধান মাপিতে হয়। কোন ক্রিয়া বা কোন গতি আরম্ভ হইল। আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত কতটা সময় গেল তাহাই আমাদের জানা দরকার হয়। সমস্ত কাজটি হয়ত কয়েক মিনিট বা কয়েক সেকেণ্ডেই শেষ হয়। এ জন্য সাধারণত বিশেষ গঠনের দুরকম ঘড়ি ব্যবহার করা হয়। একটির নাম 'স্টপ-ক্লক' (Stop-clock) (I.8 চিত্র) ও অন্যটির নাম 'স্টপ-ওয়াচ' (Stop-watch) (I.9 চিত্র)। ইহাদের ইচ্ছামত চালান ও থামান যায়।

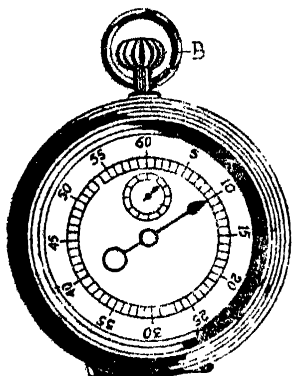
স্টপ-ক্লক (I.8 চিত্র) দেখিতে প্রায় টেবিল ঘড়ির মত। উহার বড় কাঁটা সেকেণ্ডের কাঁটা ও অন্য কাঁটাটি মিনিটের কাঁটা। মিনিটের কাঁটা ঘুরাইয়া শূন্যের (অর্থাৎ 60-এর) ঘরে আনার ব্যবস্থা থাকে। কোন কোন ঘড়িতে আরও ছোট একটি কাঁটা ঘড়ির নিচের অংশে গোল স্কেলের উপর ঘুরিয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আধ ঘণ্টা সময় বুঝায়। স্টপ-ক্লকের সবচেয়ে দরকারী অঙ্গ উহার উপরের দিকের R_1R_2 দণ্ড। এই দণ্ড একদিকে ঠেলিলে ঘড়ি চলিতে আরম্ভ করে, অন্যদিকে ঠেলিলে ঘড়ি বন্ধ হয়। ইহাতে চলা আরম্ভ হইতে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান সহজে দেখিয়া নেওয়া যায়। স্টপ-ক্লকের সেকেণ্ডের কাঁটা নিজ হইতে এক এক ধাক্কায় সাধারণত আধ সেকেণ্ড করিয়া সরে। অতএব ইহাতে আধ সেকেণ্ড পর্যন্ত সূক্ষ্মতায় সময়ের ব্যবধান মাপন চলিতে পারে।



I.8 চিত্র

'স্টপ-ওয়াচ' দেখিতে অনেকটা পকেট ঘড়ির মত। উহাতে সেকেণ্ডের দাগগুলি 1/5 বা 1/10 সেকেণ্ডে ভাগ করা থাকে। কাঁটাও এক এক ধাক্কায় 1/5 বা 1/10

সেকেণ্ড সরে। ইহাতে সময়ের ব্যবধান মাপন স্টপ-ক্লকের চেয়ে সূক্ষ্মতর হইতে পারে।



I.9 চিত্র

ঘড়ি চালাইতে বা বন্ধ করিতে ঘড়ির মাথার B চাবিটি টিপিতে হয়। প্রথমবার টিপিলে বন্ধ ঘড়ি চলিতে শুরু করে, আবার টিপিলে ঘড়ির চলা বন্ধ হয়। তৃতীয়বার টিপিলে সেকেণ্ড ও মিনিটের কাঁটা শূন্যের ঘরে ফিরিয়া আসে।

খেলার প্রতিযোগিতায়, দৌড় বা সাঁতারের ক্ষেত্রে সময় মাপিতে স্টপ-ওয়াচের ব্যবহার কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।

প্রশ্ন। দৈর্ঘ্য, ভর, কাল ও আয়তন মাপনের একটি করিয়া যন্ত্রের নাম উল্লেখ কর, এবং উহাদের কোন্‌টিতে কত সূক্ষ্মতায় মাপন সম্ভব তাহার আভাস দাও।

I-4. পদার্থ ও শক্তি (Matter and Energy)। 'প্রস্তাবনা'য় আমরা এক জায়গায় বলিয়াছি আমাদের মহাবিশ্ব যেন 'দেশ' (Space) ও 'কাল' (Time)-এ গঠিত একটি রঙ্গমঞ্চ, এবং পদার্থ সেই মঞ্চে অভিনেতা। পদার্থকে অভিনয় করায় কে? এবং এ অভিনয়ই বা কি রকম? যে অভিনয় করায় তাহার নাম আমরা দিয়াছি 'শক্তি' (Energy)। পদার্থে শক্তি সংযোগ হইলে পদার্থের কোন না কোন পরিবর্তন আনার ক্ষমতা আসে। এই পরিবর্তনই অভিনয়। এই কথাগুলি এখন আমরা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এখানে বলিয়া নেওয়া ভাল যে পদার্থের গঠনসংক্রান্ত বিষয়গুলি ও বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে অন্য পদার্থ গঠন প্রধানত রসায়নের অন্তর্গত। পদার্থ-বিদ্যার আলোচ্য বিষয় পদার্থ ও শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া। মনে করিও না রসায়নে শক্তির ক্রিয়া নাই; সকল পরিবর্তনের মূলেই রহিয়াছে শক্তি। রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যা দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা শাস্ত্র নয়, মৌলিক অনেকগুলি বিষয় উভয়েরই অন্তর্গত। জীবন বিজ্ঞানের মূলেও পদার্থ ও শক্তি লইয়া কাজ; একথা সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই সত্য। বিভিন্ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে মাত্র। পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থ ও শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার মূলসূত্রগুলি জানিতে পারাই বিজ্ঞানীর লক্ষ্য।

I-4.1. শক্তি (Energy)। শক্তি কি? বলা যাক যাহা পরিবর্তন ঘটাইতে পারে তাহাই শক্তি। শক্তি কোন্ পদার্থ নয়; কিন্তু উহার বিবিধ রূপ আছে। বিভিন্ন রূপগুলির নাম সাধারণত এই রকম করা হইয়া থাকে—(১) যান্ত্রিক শক্তি, (২) বৈদ্যুত শক্তি, (৩) চৌম্বক শক্তি, (৪) আলোক শক্তি, (৫) শব্দ শক্তি,

(৬) তাপ শক্তি, (৭) রাসায়নিক শক্তি ও (৮) পারমাণবিক শক্তি। যান্ত্রিক শক্তিকে দুই ভাগ করা হয়—(ক) স্থিতিশক্তি ও (খ) গতিশক্তি। এ দুটির কথা পরে 'পদার্থ-বিদ্যা' অংশের II-3.1 ও II-3.2 বিভাগে কিছু বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার শক্তির কিছু উদাহরণ আমরা এখানে দিব। ধর স্থিতিশক্তি। যে ঘড়ি স্প্রিং-এ চলে তাহাতে দম দিলে স্প্রিং-এর আকার বদলায় এবং এই কারণে উহা ঘড়ির যন্ত্রাংশগুলি চালাইবার ক্ষমতা পায়। দম না দিলে ঘড়ি চলে না। স্প্রিং-এর শক্তি স্থিতিশক্তি। স্থিতিশক্তির সংজ্ঞা পরে দেওয়া হইবে ('পদার্থ-বিদ্যা অংশের II-3.2 বিভাগ)।

কামানের গোলা দেওয়াল ভাঙিয়া ফেলিতে পারে। স্থির অবস্থায় থাকিলে গোলা দেওয়ালে কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারিত না। গোলার বেগের জন্যই দেওয়াল ভাঙিয়াছে। চলন্ত গোলার শক্তি গতিশক্তি। ঢিল ছুড়িয়া গাছ হইতে আম পাড়া ঢিলের গতিশক্তির জন্য সম্ভব হয়।

বৈদ্যুত শক্তির উদাহরণ বৈদ্যুতিক পাখার চলন, বৈদ্যুতিক মোটর ঘোরা, বিজলী বাতি জ্বলা, ইত্যাদি। বৈদ্যুত শক্তির সাহায্যে জলকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিচ্ছিন্ন করা যায়।

চৌম্বক শক্তি লোহাকে কাছে টানিয়া আনে; চৌম্বক সমমেরু একে অন্যকে ঠেলিয়া কোন কোন মাপন যন্ত্রে কাঁটা ঘোরায়।

আলোক শক্তি চোখের ভিতর রেটিনা (Retina) নামক পর্দায় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইয়া দৃষ্টির অনুভূতি জাগায়। খুব ছোট কণাকে আলোকশক্তি ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিতে পারে। ধূমকেতুর লেজ ইহার একটি উদাহরণ। লেজার (Laser) নামক ব্যবস্থায় সৃষ্ট তীব্র আলোকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ধাতুপাতে ছেঁদা করা যায়। আতশী কাচের সাহায্যে সূর্যের আলো কেন্দ্রীভূত করিয়া হয়ত তোমরা কেহ কেহ কাগজ জ্বালাইতে দেখিয়াছ।

শব্দশক্তি আসলে কম্পনের যান্ত্রিক শক্তি; উহা আলাদা কোনপ্রকার শক্তি নয়।

তাপশক্তির কথা 'পদার্থ-বিদ্যা' অংশের II-5.2 ও II-5.3 বিভাগে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অংশের I-5.4 বিভাগেও কিছু পাইবে।

কয়লা জ্বলিয়া আমাদের তাপ দেয়। ইহা কয়লাতে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তির জন্য হয়। চলাফেরা করা, কথা বলা ইত্যাদি যাহা কিছু আমরা করি তাহার মূলে আমাদের খাদ্যে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি। না খাইলে কতটুকু কাজ করার ক্ষমতা থাকে? ডাইনামাইট দিয়া সেতু উড়াইয়া দেওয়া বা পাহাড় ভাঙিয়া খনিজ পদার্থ বাহির করা ডাইনামাইটে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তির ক্রিয়া।

অ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার কথা বোধ হয় তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। এই বোমার বিস্ফোরণে হঠাৎ যে বিপুল পরিমাণ শক্তি মুক্ত হইয়া ধ্বংস ঘটায় তাহা

পারমাণবিক শক্তি। শুনিয়া আশ্চর্য হইবে পারমাণবিক শক্তি আসে কিছু পদার্থ শক্তিতে পরিণত হওয়ায়।

শক্তি কি আমরা কোন ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করিতে পারি? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানী বলিবেন শক্তি সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, অর্থাৎ কেবলমাত্র শক্তিকে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে টের পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয় যাহা অনুভব করে তাহা পদার্থের উপর শক্তির ক্রিয়ায় পদার্থের পরিবর্তন। পরিবর্তন শক্তি নয়; পরিবর্তন শক্তির ক্রিয়া। আলোকশক্তি আমরা চোখে দেখিতে পাই না; কিন্তু উহা যখন কোন বস্তুতে পড়িয়া সেখান হইতে আসিয়া আমাদের চোখে পড়ে তখন বস্তুটি আমরা দেখিতে পাই। আলোকশক্তি অদৃশ্য। কোনপ্রকার শক্তিই সোজাসুজি ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করা যায় না।

প্রশ্ন। শক্তি কাহাকে বলে সংক্ষেপে বুঝাও। বিভিন্ন প্রকার শক্তির নাম কর, এবং উহাদের যে কোন তিনটির উদাহরণ দাও।

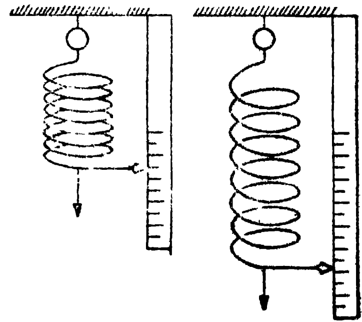
I-4.2. পদার্থ (Matter)। পদার্থ কী—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে খুঁজিতে হইবে পদার্থ অত বিচিত্র রকমের হইলেও সকল প্রকার পদার্থের একই কোন ধর্ম আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কি। আমাদের বর্তমান জ্ঞান হইতে ইহার উত্তর এখন আমরা সহজেই দিতে পারি—যদিও এ উত্তর পাইতে বিজ্ঞানীর বহুদিন লাগিয়াছিল। পৃথিবীতে যত রকম পদার্থ আছে, দেখা গিয়াছে পৃথিবী তাহাদের সকলকেই নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। সকল পদার্থেরই তাহা হইলে এমন কিছু একটা আছে যাহার জন্য পদার্থ-খণ্ড (বস্তু) পৃথিবীর আকর্ষণ অনুভব করে, এবং আটকা না থাকিলে বা অন্য কোন বাধা না থাকিলে এই আকর্ষণে মাটিতে পড়ে। এই যে 'এমন কিছু' যাহা সকল পদার্থেই আছে, এবং যাহার জন্য উহারা পৃথিবীর আকর্ষণ অনুভব করে, তাহাকেই আমরা নাম দিয়াছি 'ভর' (Mass)। বলিতে পার পৃথিবী হইতে অনেক দূরে যে সকল পদার্থ আছে—গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা—এগুলিও কি পৃথিবীর আকর্ষণ অনুভব করে এবং উহাদেরও কি ভর আছে? জটিলতা না বাড়াইয়া আমরা সংক্ষেপে উত্তর দিব 'হাঁ, উহাদেরও ভর আছে।' পদার্থের এই 'ভর'কে বলা হয় 'মহাকর্ষীয় ভর' (Gravitational mass)। সকল পদার্থেরই ভর আছে এবং তুলার সাহায্যে যে ভর আমরা মাপি উহা মহাকর্ষীয় ভর।

প্রশ্ন। পদার্থের বৈচিত্র্যের মধ্যে কি ঐক্য দেখা গিয়াছে? উহার নাম কি? ঐক্যের প্রকৃতি সংক্ষেপে বল।

I-4.3. ভর ও ভার (বা ওজন) (Mass and Weight)। পৃথিবী যে বলে কোন বস্তুকে টানে, সেই বলের সাহায্যে আমরা ভরের ধারণা আনিয়া থাকিলেও, সেই আকর্ষণ কিন্তু ভর নয়। কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষক বলকে আমরা ঐ

বস্তুর 'ভার' বা 'ওজন' বলি। ভার ভরের উপর নির্ভর করে, কিন্তু ভার ও ভর আলাদা জাতীয় রাশি। ভার এক প্রকার বল, কিন্তু ভর বল নয়। কোন বস্তুতে পদার্থের পরিমাণকে আমরা বস্তুটির ভর বলি।

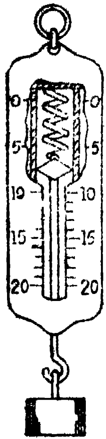
একখানা বই হাতের তেলোর উপর রাখিলে হাতের মাংসপেশীতে যে টান অনুভব কর তাহা ঐ বইয়ের ভারের জন্য। মাটিতে রাখা একখানা ইট তুলিতে অনুরূপ পেশীর টান ইটের ভারের জন্য। বইখানা হয়ত ইটের তুলনায় অনেক হালকা, ইট ভারী। বইয়ের ভর কম, ইটের ভর বেশী বলিয়া উহাদের ভারে তফাত হইয়াছে। উহাদের ভর মাপিতে দাঁড়িপাল্লার সাহায্য নিতে হইবে। হয়ত দেখিবে বইয়ের ভর 0·25 কেজি (250 গ্রাম) এবং ইটের ভর 2.240 কেজি (2240 গ্রাম)। আকর্ষক বল মাপিতে হইলে বল মাপার কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে। পেঁচান স্প্রিং-এর সাহায্যে বল মাপা যায়। স্প্রিং খাড়া রাখিয়া উহার উপরের প্রান্ত শক্ত করিয়া আটকাইয়া দিয়া অন্য প্রান্তে টান দিলে স্প্রিং লম্বা হইবে। বেশী টানে উহা বেশী লম্বা হইবে। স্প্রিং কতটা লম্বা হইল তাহা দেখিয়া বল বেশী কি কম তাহা বোঝা যায়। বল মাপিবার এ রকম স্প্রিং বানান যায় (I-10 চিত্র)। নির্দিষ্ট স্থানে ভর তুলনা করিবার জন্য স্প্রিং-এর সঙ্গে স্কেল লাগাইয়া নেওয়া যায়। ইহাকে স্প্রিং তুলা (spring balance) বলে (I. 11 চিত্র দেখ)।


I 10 চিত্র

ভূপৃষ্ঠের বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষক বলকে আমরা উহার ভার বা ওজন বলিয়াছি। যদি একই বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেক উপরে নিয়া উহার ভার অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষক বল, ধর স্প্রিং-এর সাহায্যে দেখা হয়, তাহা হইলে দেখিব বল, অর্থাৎ বস্তুটির ওজন, ভূপৃষ্ঠে ওজনের চেয়ে কম। কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় মাপিলে দেখিব ভূপৃষ্ঠে ভর মাপিতে অন্য পাল্লায় যে ভর বসাইতে হইয়াছিল, এখানেও তাহাই করিতে হইতেছে, অর্থাৎ ভর একই আছে। খনির গভীরতায় নিয়া গেলেও দেখিব ভর একই আছে, কিন্তু ভার কমিয়াছে।

বস্তুর ভার উহার ভরের সমানুপাতিক (অর্থাৎ একই জায়গায় ভর দ্বিগুণ করিলে ভারও দ্বিগুণ হইবে ; ভরকে যতগুণ করিব ভারও ততগুণ হইবে)। কিন্তু ভার ভূকেন্দ্র হইতে বস্তুর দূরত্বের উপরেও নির্ভর করে। ভূপৃষ্ঠে আকর্ষক বল সব চেয়ে বেশী। ভূকেন্দ্র হইতে দূরত্ব ইহার চেয়ে বাড়িলে বা কমিলে ভার কমে। কিন্তু কোন

ক্ষেত্রেই ভরের পরিবর্তন হয় না। শুনিলে হয়ত আশ্চর্য হইবে যে নকল উপগ্রহে বস্তুর ভার একেবারেই থাকে না, কিন্তু ভর অপরিবর্তিত থাকে। ভূকেন্দ্রে কোন বস্তু নিয়া পরীক্ষা করা সম্ভব হইলে দেখা যাইত সেখানেও বস্তুর ভর ঠিক আছে, কিন্তু কোন ভার নাই। নকল উপগ্রহে বা ভূকেন্দ্রে বল মাপিবার স্প্রিং-এ যত ভরই ঝুলাও না কেন, স্প্রিং লম্বায় বাড়িবে না, কারণ ভর ভার হারাইয়াছে। ভারহীন অবস্থায় দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করিয়া ভরও তুলনা করা যায় না, এ কথাটিও মনে রাখিও। তবে ভর অন্যভাবে মাপা যায়, ইহার উপায় পরে জানিতে পারিবে। (II-2.2 বিভাগ)



I-11 চিত্র

ভূপৃষ্ঠেও ভারের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। বিষুব অঞ্চলে আকর্ষণ কম অর্থাৎ ভার কম, এবং মেরু অঞ্চলে বেশী। তফাত হয় প্রায় হাজার ভাগে পাঁচ ভাগ। বিষুব অঞ্চলে এক কেজি ভরের ভার মেরু অঞ্চলে বাড়িয়া প্রায় এক কেজি পাঁচ গ্রামের ভারের সমান হয়। কিন্তু এক কেজি ভর বিষুব অঞ্চলে যাহা মেরু অঞ্চলেও তাহাই। একাধিক কারণে নির্দিষ্ট ভরের উপর পৃথিবীর আকর্ষণের তফাত হয়।

পৃথিবীর নিজেরও ভর আছে; উহা প্রায় $5{\cdot}98 \times 10^{24}$ কেজি। ভরের মূল ধর্মই হইল অন্য ভরকে আকর্ষণ করা। আকর্ষণের মান আকর্ষক ও আকৃষ্ট ভরের ও উহাদের দূরত্বের বর্গের উপর নির্ভর করে। চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের তুলনায় প্রায় 81·5 গুণ কম। উহার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় চতুর্থাংশ (0·27)। এই কারণে চাঁদের পিঠে কোন বস্তুর উপর চাঁদের আকর্ষণ অর্থাৎ চাঁদের পিঠে কোন বস্তুর ভার পৃথিবীর পিঠে উহার ভারের তুলনায় প্রায় 6 গুণ কম। এখানে তুমি এক কুইন্টাল (100 কেজি) চালের একটি বস্তা তুলিতে পারিবে না। কিন্তু চাঁদের পিঠে হইলে উহা তুমি অক্লেশে বহন করিতে পারিবে, কারণ চাঁদে উহার ভার ভূপৃষ্ঠে প্রায় 16 কেজি ভরের ভারের সমান। অথচ এক কুইন্টাল দু জায়গায়ই 100 কেজি ভর। খবরের কাগজে চাঁদের পিঠে অভিযাত্রীদের ছবি হয়ত দেখিয়াছ। তাঁহাদের পোশাক যেমন ভারী, তেমন ভারী ভারী যন্ত্র বহন করিয়া চাঁদের পিঠে তাঁহাদের চলাফেরা করিতে হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে অত ভার তাঁহারা বহন করিতে পারিতেন না।

প্রশ্ন। ভর ও ভারে প্রভেদ বুঝাইয়া বল। ভর আছে অথচ ভার নাই, এমন অবস্থা কোথায় হইতে পারে? গ্রহ, নক্ষত্র হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বস্তুর ভর বা ভার কোন্‌টি আছে?

I-4.4. ভরের নিত্যতা বা ভর-সংরক্ষণ (Conservation of mass)। কোন বস্তুতে যে-কোন ভৌত পরিবর্তনই ঘটাও না কেন, তাহাতে উহার ভরের কোন

পরিবর্তনই হইবে না। উহাকে ভাঙিয়া টুকরা কর, গুঁড়া কর বা তাপে গলাও, অসাবধানতায় উহার কোন অংশ হারাইয়া না গিয়া থাকিলে দেখিবে পরিবর্তনের আগে ও পরে ভর একই আছে। নির্দিষ্ট ভর জলে নির্দিষ্ট ভর চিনি গুলিয়া দ্রবণ ওজন করিলে দেখিবে উহার মোট ভর জল ও চিনির ভরের যোগফল। দ্রবণে চিনির বা জলের ভর বদলায় নাই।

-খানিকটা লোহাচুর ও খানিকটা গন্ধক ওজন করিয়া জানা ভরের বদ্ধ পাত্রে উহাদের মিশাইয়া যথেষ্ট উষ্ণ করিলে লোহাচুর ও গন্ধকে কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়া নূতন একটি যৌগ সৃষ্ট হইবে, এবং কিছু লোহাচুর বা কিছু গন্ধক হয়ত উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে। এখন সবগুলি একসঙ্গে আবার ওজন করিলে দেখিবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে উহাদের যে ভর ছিল, বিক্রিয়ার পরও মোট ভর তাহাই আছে।

ভৌত বা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বস্তুর মোট ভরের কোন পরিবর্তন হয় না, এরকম অগণিত উদাহরণ আমাদের জানা আছে। মনে রাখিতে হইবে পরস্পর ক্রিয়াশীল বস্তুগুলির কোন অংশ অসাবধানতায় যেন হারাইয়া বা উবিয়া না যায়। এজন্য পরীক্ষাগুলি বদ্ধ পাত্রে করা দরকার। উপযুক্ত সতর্কতায় যতদূর সম্ভব সূক্ষ্মভাবেই আমরা ভৌত বা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভর পরিবর্তন মাপার চেষ্টা করিয়াছি, কোন ক্ষেত্রেই আমরা মোট ভরের কোন পরিবর্তন দেখিতে পাই নাই।

এই অভিজ্ঞতা হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে 'ভরের সৃষ্টি বা বিনাশ নাই—ভর নিত্য (বা সংরক্ষিত) রাশি'। এই সিদ্ধান্তকেই **ভরের নিত্যতার সূত্র** বা **ভর-সংরক্ষণ সূত্র** বলে।

প্রশ্ন। ভরের নিত্যতা বলিতে কি বুঝায় উদাহরণ দিয়া বল।

I-4.5. শক্তির নিত্যতা বা শক্তি-সংরক্ষণ (Conservation of energy)। ভর মাপা যত সহজ শক্তি মাপা মোটেই তেমন সহজ নয়। গতিশক্তি আমরা মাপিতে পারি ; স্থিতিশক্তির কেবল পরিবর্তন মাপা যায়। বৈদ্যুত শক্তিও আমরা অনেক ক্ষেত্রে মাপিতে পারি। যেখানে যে পরিবর্তন হয় সকলই শক্তির ক্রিয়ায়, ইহা আমরা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু পরিবর্তন ঘটাইয়া শক্তি বিনষ্ট হয় না ; উহা অন্য প্রকার শক্তিরূপে থাকে।

কোন বস্তু মাটি হইতে উপরে তুলিলে উহা স্থিতিশক্তি পায়। ছাড়িয়া দিলে উহা মাটিতে পড়িতে গতিশক্তি লাভ করে। মাপনে দেখা যায় স্থিতিশক্তি হ্রাস গতিশক্তি বৃদ্ধির সমান। উপরের দিকে ঢিল ছুড়িলে উহাকে গতিশক্তি দেওয়া হইল। উপরে উঠিতে ঢিলের বেগ ক্রমশ কমিয়া ঢিল মুহূর্তেক স্থির থাকিয়া আবার নিচে পড়িতে থাকে। গতিশক্তি বেগের উপর নির্ভর করে। ঢিলের ওঠানামার পথের সকল

জায়গায় উহার গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির যোগফল সমান থাকে। (গণিতের সাহায্যে ইহার প্রমাণ তোমরা পরে পাইবে।) এই দুই প্রকার শক্তির একটি অন্যটিতে পরিণত হয়, এবং একটি যতটা বাড়ে অন্যটি ঠিক ততটা কমে। এই প্রকার উদাহরণ হইতে দেখা যায় যান্ত্রিক শক্তি নিত্য বা সংরক্ষিত রাশি। ঢিলের যান্ত্রিক শক্তি যতক্ষণ যান্ত্রিক থাকে, ততক্ষণ উহার মান স্থির। ঢিল মাটিতে পড়ার পর যান্ত্রিক শক্তি খানিকটা শব্দশক্তিতে পরিণত হয়, খানিকটা ঢিলের ও মাটির আকার ও আয়তন বিকৃতি ঘটাইয়া শেষ পর্যন্ত তাপ শক্তিতে পরিণত হয়।

বৈদ্যুত শক্তি বৈদ্যুত মোটরে মোটর ঘুরিবার যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়। উভয় শক্তিই যথেষ্ট সূক্ষ্মতায় মাপা যায়। মাপনে দেখা যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুত শক্তি ব্যয়ে সব সময়ই নির্দিষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়। যান্ত্রিক শক্তি বা বৈদ্যুত শক্তিকে তাপ শক্তিতেও পরিণত করা যায়। এখানেও উপযুক্ত অবস্থায় এবং সূক্ষ্ম মাপনে দেখা যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিক বা বৈদ্যুত শক্তি ব্যয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া যায়।

এই সকল অভিজ্ঞতা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করি 'শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নাই—উহা নিত্য (বা সংরক্ষিত) রাশি'। এই সিদ্ধান্তকেই **শক্তির নিত্যতার সূত্র** বা **শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র** বলে। শক্তির রূপান্তর হয় মাত্র এবং রূপান্তরে যে কোন প্রকারের নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য শক্তিতে পরিণত হয়। সকল ক্ষেত্রে মাপিতে না পারিলেও শক্তির নিত্যতায় আমরা বিশ্বাস করি।

বর্তমান শতাব্দীতে আমরা নূতন একটি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি উপযুক্ত পরিবেশে তীব্র ঘনীভূত শক্তি ভরে পরিবর্তিত হইতে পারে। আবার উপযুক্ত পরিবেশে ভরও শক্তিতে পরিণত হয়। অ্যাটম বোমায় বা হাইড্রোজেন বোমায় শেষোক্ত ক্রিয়া হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ ভরের বদলে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। এই কারণে এখন আমরা ভর ও শক্তিকে আলাদা আলাদা ভাবে সংরক্ষিত রাশি না বলিয়া ভর+শক্তিকে সংরক্ষিত রাশি বলি। ইহাতে বুঝায় মহাবিশ্বে ভর ও শক্তির যোগফল অপরিবর্তনীয় রাশি।

পদার্থ হইতে কিছু শক্তি আলোক, তাপ বা শব্দশক্তি রূপে বিকিরিত হইলেও উহার ভর কমে। কিন্তু এই কমা এত সামান্য যে সূক্ষ্মতম মাপনেও তাহা আমরা ধরিতে পারি না। ধরিতে পারি না বলিয়াই সাধারণ ব্যাপারে ভর ও শক্তিকে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে সংরক্ষিত রাশিই বলি।

সাধারণ ব্যাপারে শক্তির ও ভরের নিত্যতা এবং সকল ব্যাপারে শক্তি+ভরের নিত্যতা বিজ্ঞানের ভিত্তি। আজ পর্যন্ত কোন অবস্থায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই।

প্রশ্ন। (১) শক্তির নিত্যতা বা শক্তি-সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝায়? উত্তরে উদাহরণ দিবে। (২) আধুনিক বিজ্ঞান কি ভর ও শক্তিকে আলাদা আলাদা ভাবে সংরক্ষিত রাশি বলিয়া মনে করে? উত্তরের কারণ দেখাও।

I-4.6 শক্তির রূপান্তর (Transformation of energy)। শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নাই, উহা রূপান্তরিত হয় মাত্র। এই উক্তির সমর্থনে উপরের I-4.5 উপবিভাগে আমরা কিছু কথা বলিয়াছি। এখানে রূপান্তর সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। প্রথমে মনে রাখিও শক্তি পদার্থেই থাকে এবং এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে সঞ্চালিত হইবার সময়ই সাধারণত রূপান্তরিত হয়। [বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ (Electromagnetic radiation) রূপ শক্তি পদার্থ আশ্রয় না করিয়াই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ইহার কথা এখন থাক।]

একটি বীজ মাটিতে পুঁতিলে। তাপশক্তি ও বীজের ভিতরের পদার্থের রাসায়নিক শক্তির ক্রিয়ায় উহা ক্রমে অংকুরিত হইবে এবং পরে সূর্যের আলোকশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ক্রমে বড় হইবে।

আমরা যখন কথা বলি তখন দেহস্থ খাদ্যের জ্বলনের রাসায়নিক শক্তি ফুসফুস ও বাক্‌যন্ত্রের পেশীতে সংকোচন ঘটায়; ইহা স্থিতিশক্তিতে রূপান্তর। সংকুচিত পেশী ফুসফুস হইতে বায়ু ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়; ইহা গতিশক্তিতে রূপান্তর। ইহাতে স্বরতন্ত্রী (vocal cords) কাঁপে ও শব্দ উৎপন্ন হয়। শব্দশক্তি ছড়াইয়া পড়িয়া বিভিন্ন পদার্থে শোষিত হইয়া সাধারণত তাপশক্তিতে পরিণত হয়। চলার সময় দেহস্থ রাসায়নিক শক্তি মাংসপেশীতে সংকোচন ঘটাইয়া পেশীতে স্থিতিশক্তি দেয়। পেশীর স্থিতিশক্তি রূপান্তরিত হইয়া পা ও হাত চালনা করিয়া উহাদের গতিশক্তি দেয়।

কয়লা জ্বালাইয়া উহার রাসায়নিক শক্তিকে তাপে রূপান্তরিত করিয়া আমরা রেলগাড়ির ইঞ্জিনে তাপশক্তিকে চাকা ঘুরিবার যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করিয়া গাড়িকে গতিশক্তি দেই। ইঞ্জিনের হুইস্‌ল্‌ দিতে জলীয় বাষ্পের কিছু তাপ ও কিছু চাপশক্তি শব্দশক্তিতে পরিণত হয়।

মোটর গাড়িতে বা এরোপ্লেনে কয়লার বদলে পেট্রল জ্বালানির কাজ করে। প্রধানত কয়লা এবং জ্বালানি খনিজ তেল হইতেই আমরা আমাদের বেশীর ভাগ কলকারখানার যন্ত্র চালাইবার শক্তি পাই। বৈদ্যুতিক শক্তিও ইহা করে। কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তিও আসে কয়লা বা অন্য জ্বালানির রাসায়নিক শক্তি হইতে। এখন কোথাও কোথাও উহা পারমাণবিক শক্তি হইতে আসিতেছে। আমাদের দেশের কয়েক জায়গায়ও ইহা হইতেছে। রাসায়নিক শক্তির তুলনায় পারমাণবিক শক্তি লক্ষাধিক গুণ তীব্র। ইহা পরে বুঝিবে।

কয়লা বা খনিজ জ্বালানি উহার রাসায়নিক শক্তি পাইয়াছে সূর্য হইতে, কারণ কোটি কোটি বৎসর আগের গাছ এবং খুব ছোট অসংখ্য জীবদেহ মাটির নিচে চাপা পড়িয়া ক্রমশ চাপে ও তাপে কয়লায় ও খনিজ তেলে পরিবর্তিত হইয়াছে।

সূর্যের তাপে বিভিন্ন স্থান উষ্ণ হওয়ায় বায়ু স্রোত বহে, গাছের পাতা নড়ে, ঝড় হয়। সূর্যের তাপই সমুদ্র, নদ, নদী হইতে জলকে বাষ্প করিয়া মেঘের সৃষ্টি করে। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জলকণার গতিশক্তি আসে মেঘের স্থিতিশক্তি হইতে। এই স্থিতিশক্তি আসিয়াছে সূর্যের তাপ হইতে। পারমাণবিক শক্তি ও পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপশক্তি ছাড়া পৃথিবীর আর সকল শক্তির মূল হইল সূর্য। প্রথমোক্ত শক্তি দুটি আমরা অল্প দিন হইল কাজে লাগাইতে শুরু করিয়াছি। এ জন্য আগে বলা হইত 'পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির উৎস সূর্য।' সূর্য শক্তি ছড়ায় প্রধানত বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ রূপে।

সূর্যে ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া শক্তি যোগাইতেছে। এক সময় আসিবে যখন সূর্যের এই রূপান্তরের সামর্থ্য আর থাকিবে না। পৃথিবীতে তখন আর শক্তিস্রোত আসিবে না।

প্রাকৃতিক জ্বালানি, পারমাণবিক জ্বালানি ও পৃথিবীর নিজস্ব তাপ শেষ হইলে সূর্যের শক্তিস্রোতই কার্যত পৃথিবীতে শক্তি আগমের একমাত্র উৎস হইবে। তাহাও শেষ হইলে পৃথিবী শক্তিহীন জড়পিণ্ডে পরিণত হইবে; কোন পরিবর্তনই আর ঘটিবে না। তাহার আগেই সব জীবন শেষ হইয়া যাইবে, সমস্ত জল বরফে পরিণত হইবে এমন কি বায়ুমণ্ডল প্রথমে জমিয়া তরল ও পরে কঠিন হইয়া থাকিবে। তবে ইহা লইয়া চিন্তিত হইও না। সূর্যের শক্তিস্রোত শেষ হইতে কোটি কোটি বৎসর কাটিয়া যাইবে। তাহার মধ্যে অনেক কিছু ঘটিতে পারে।

প্রশ্ন। (১) বিভিন্ন প্রকার শক্তির নাম কর এবং শক্তির রূপান্তরের পাঁচটি উদাহরণ দাও।

(২) 'পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির উৎস সূর্য'—এই কথাটি আলোচনা কর।

I-5 পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন (Change of State)। পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় বা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকিতে পারে। কি অবস্থায় থাকিবে তাহা পদার্থের প্রকৃতি এবং উষ্ণতা ও কিছুটা চাপের উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ বিশুদ্ধ কোন কঠিন পদার্থের উষ্ণতা ক্রমশ বাড়াইতে থাকিলে উহা প্রথম তরলে ও পরে বায়বীয় (বা বাষ্পীয়) অবস্থায় পরিণত হইবে। আবার কোন গ্যাস বা বাষ্পকে ক্রমশ ঠাণ্ডা করিতে থাকিলে উহা প্রথমে তরলে, পরে কঠিনে পরিণত হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ বরফ লইয়া আমরা পরীক্ষা করিতে পারি। একটি পাত্রে বরফ নিয়া উহা উষ্ণ করিতে থাকিলে প্রথমে বরফ গলিয়া জল হইবে। জলকে উষ্ণ করিয়া

চলিলে একটা বিশেষ উষ্ণতায় আসিয়া উহা ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হইবে। জলীয় বাষ্প চোখে দেখা যায় না। জল গরম করিবার বা ফুটাইবার সময় জলের উপর হইতে ধোঁয়ার মত যাহা বাহির হইতে দেখি তাহা বাষ্প নয়; উহা বাষ্প জমিয়া ক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি। একটু পরেই উহা মিলাইয়া গিয়া আবার বাষ্পে পরিণত হয়।

অতি সাধারণ এই উদাহরণটি হইতে কয়েকটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করিতে পারি :—

১। **গলন (Melting)**। বরফ গলিয়া জলে পরিণত হইতেছে ইহা পরিষ্কার দেখিতে পাইবে। একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় (0°C) বরফ গলে। গলিবার সময় বরফের উষ্ণতা স্থির থাকে।

কঠিন অবস্থা হইতে তাপ প্রয়োগে তরল হওয়াকেই আমরা 'গলন' বলি। গলনে বস্তুর আয়তন একটু বাড়ে বা কমে। ন্যাপথালিন গলিলে উহার আয়তন বাড়ে। বরফ গলিলে উহার আয়তন কমে। আয়তন পরিবর্তন কোন ক্ষেত্রেই বেশী নয়। বরফ গলিলে উহার আয়তন প্রায় 1/12 অংশ কমে।

২। **কঠিনীভবন বা হিমন (Freezing)**। জলকে জমাইয়া বরফে পরিণত করা যায়। ইহার জন্য জলের উষ্ণতা কমাইয়া একটি বিশেষ উষ্ণতার নিচে আনিতে হইবে। এই উষ্ণতা আর বরফের গলনের উষ্ণতা একই। চার ভাগ বরফে এক ভাগ নুন মিশাইলে উহা খুব ঠাণ্ডা হয়। একটা ছোট শিশিতে খানিকটা জল নিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া নুন মিশান বরফে ঢাকিয়া উহা ক্রমশ ঠাণ্ডা হইতে দিলে দেখা যাইবে শিশির জল একসময়ে বরফ হইয়া গিয়াছে। শিশিটি যদি কেবল বরফে ঢাকিয়া রাখ তাহা হইলে কিন্তু জল জমিবে না। ইহার কারণ I-5. 4 বিভাগে বলা হইয়াছে। শৈত্যে তরল জমিয়া কঠিনে পরিণত হওয়াকেই 'কঠিনীভবন' (বা সংক্ষেপে 'হিমন') বলা হয়।

৩। **স্ফুটন বা ফুটন (Boiling)**। একটি পাত্রে জল নিয়া উনানে বসাইয়া রাখিলে উহা ক্রমশ গরম হয়। ক্রমে দেখা যায় পাত্রের গায়ে বিন্দু বিন্দু আকারে বায়ু জমিতেছে। জলে গুলিয়া থাকা বায়ু উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে বিন্দুগুলি জল হইতে বাহির হইয়া যায়। জলের উপর হইতে একটু ধোঁয়া উঠিতেও দেখা যায়। এই ধোঁয়া জলের উপর হইতে ওঠা জলীয় বাষ্প জমা ছোট ছোট জলকণা। উহারা বায়ুতে জলীয় বাষ্প হইয়া মিলাইয়া যায়। ক্রমে দেখিবে জলের তলের দিক হইতে ছোট ছোট বুদ্বুদ বাহির হইয়া জলের ভিতরে খানিকটা উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে ও চুরচুর শব্দ হইতেছে। এগুলি জলীয় বাষ্পের বুদ্বুদ এবং ইহাদের সৃষ্টি জল ফোটার সূচনা। কিছু পরেই জলের সর্বাঙ্গ হইতে এই রকম

বাষ্প উঠিতে থাকিবে। ইহাই স্ফুটন। একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরলের সর্বাঙ্গ হইতে তরলের বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হওয়াকে স্ফুটন বলে। স্ফুটনের সময় তরলের উষ্ণতা বদলায় না।

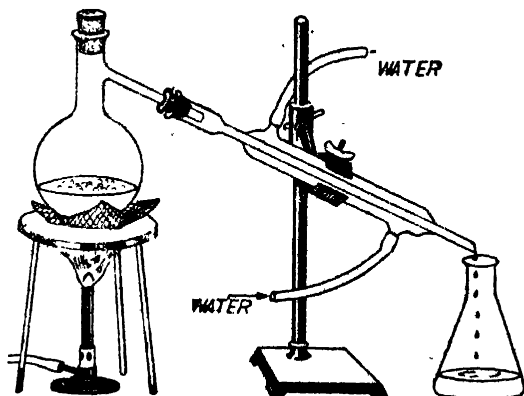
৪। **বাষ্পীভবন বা বাষ্পন (Evaporation)।** স্ফুটন ছাড়াও তরল অন্য একটি প্রক্রিয়ায় বাষ্পে পরিণত হইতে পারে। ইহাকে বাষ্পীভবন বা 'বাষ্পন' বলে। টেবিলে বা মেজেতে একটু জল পড়িয়া ছিল। কিছু পরে দেখিলে জল সেখানে নাই; উবিয়া বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে। ভিজা কাপড় রোদে শুকাইতে দিলে; কিছুক্ষণের মধ্যে উহা শুকাইয়া গেল। এগুলি বাষ্পনের উদাহরণ। স্ফুটন যে উষ্ণতায় ঘটে তাহার চেয়ে কম উষ্ণতায় তরলের বাষ্পে পরিণত হওয়াকে বাষ্পন বলে। কোন কোন তরলে বাষ্পন খুব দ্রুত হয়—যেমন স্পিরিট বা কোহল। কোনটিতে আবার সহজে হয় না—যেমন তেল। যে তরল সহজে বাষ্পিত হয় তাহাকে 'উদ্বায়ী' বলে।

স্ফুটন ও বাষ্পনে প্রভেদ। (ক) স্ফুটন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ঘটে। বিভিন্ন তরলে এই উষ্ণতা বিভিন্ন। স্ফুটনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলাদা করিয়া তাপ প্রয়োগ করিতে হয় এবং স্ফুটনে তরলের সর্বাঙ্গ হইতে বাষ্প বাহির হয়। স্ফুটনের হার তাপ প্রয়োগের হারের উপর নির্ভর করে।

(খ) বাষ্পন সকল উষ্ণতায়ই ঘটে, এবং উষ্ণতা বাড়িলে বাষ্পন বেশী তাড়াতাড়ি হয়। একই উষ্ণতায় বিভিন্ন তরলের বাষ্পনের হার বিভিন্ন। বাষ্পনেও তাপের দরকার হয়; কিন্তু ইহা সাধারণত আলাদা করিয়া দেওয়া হয় না। তরল নিজেই তাহার আশপাশ হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পনে তরল কেবলমাত্র উপরের তল হইতে বাষ্পে পরিণত হয়, সর্বাঙ্গ হইতে নয়। অতএব তরল যত ছড়াইয়া থাকে উহার বাষ্পন তত তাড়াতাড়ি হয়। একই পরিমাণ জল একটি গেলাস হইতে উবিয়া যাইতে যে সময় নিবে, একখানা থালায় ছড়াইয়া দিলে উবিবে অনেক তাড়াতাড়ি। তাছাড়া তরলের উপরেই ঐ তরলের বাষ্প বেশী মাত্রায় থাকিলে বাষ্পন আস্তে আস্তে হয়। ইহার উদাহরণ বর্ষার দিনে ভিজা কাপড় শুকান। বর্ষার দিনে বায়ুতে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে বলিয়াই কাপড় শুকাইতে চায় না।

৫। **তরলীভবন বা তরলন (Condensation)।** ইহা স্ফুটন ও বাষ্পনের বিপরীত প্রক্রিয়া। ঠাণ্ডায় বাষ্প জমিয়া তরলে পরিণত হওয়াকেই 'তরলীভবন' বা 'তরলন' বলে। শীতকালের কাছাকাছি ভোরবেলা গাছের পাতায় পাতায় যে শিশির দেখিতে পাও, তাহা বায়ুর জলীয় বাষ্প জমা জলকণা। রসায়নে পাতন (distillation) প্রক্রিয়া তরলনের খুব সুন্দর উদাহরণ। এক পাত্রে তরল ফুটাইতেছ। উহার সব

দিক বন্ধ, কেবল মুখের ছিপির ভিতর দিয়া একটি লম্বা নলের এক প্রান্ত পাত্রের একটু ভিতরে ঢুকান। নলের অন্য প্রান্ত একটি ঠাণ্ডা পাত্রে শেষ হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নলের বাহিরে জল স্রোত বহাইয়া নল ঠাণ্ডা করা হয় (I-12 চিত্র)। দেখিবে ফুটন্ত তরলের বাষ্প ঠাণ্ডা হওয়ায় তরল হইয়া অন্য পাত্রে জমিতেছে। ফুটন্ত জলের কেতলির মুখের কাছে বাটি ধরিলে এই বাটিতেও জল জমিতে দেখিবে। কেতলিতে



I-12 চিত্র

জল বাষ্প হইয়াছে। সেই বাষ্প বাটিতে ঠাণ্ডায় আবার জলে পরিণত হইয়াছে। কুয়াশা ও মেঘ খুব ছোট ছোট জলকণার সমষ্টি। বায়ুর জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় জমিয়া কুয়াশায় বা মেঘে পরিণত হইয়াছে। তরলনের জন্য বাষ্পের উষ্ণতা স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে কম হওয়া দরকার। উষ্ণতা বেশী থাকিলে তরলন হইবে না।

উপরে আমরা যে পাঁচটি প্রক্রিয়ার কথা বলিলাম, অধিকাংশ বিশুদ্ধ পদার্থেই উহা ঘটিতে পারে। তবে কোন কোন পদার্থে উষ্ণতা বাড়িলে উহা গলিবার বা বাষ্প হইবার আগেই উহাতে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিতে পারে। তখন উহাতে সকল প্রক্রিয়াগুলি দেখা যায় না। তুঁতের (কপার সালফেট ; $CuSO_4, 5H_2O$) রং গাঢ় নীল ; উষ্ণ করিলে উহা ক্রমে সাদাটে হয়। তুঁতেতে কিছু জল রাসায়নিক বন্ধনে থাকে। উষ্ণ হইলে ঐ জল রাসায়নিক বন্ধন ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়। মারকিউরিক অক্সাইড (HgO) একরকম হলদে (বা লাল) গুঁড়া। উষ্ণ করিলে না গলিয়া উহাতে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়া উহা অক্সিজেন গ্যাস ও তরল পারায় (Mercury-তে) পরিণত হয়। কোন কোন পদার্থ, যেমন আয়োডিন (Iodine), নিশাদল (NH_4Cl) প্রভৃতি উষ্ণ করিলে তরল না হইয়া সোজাসুজি গ্যাসীয় অবস্থায় চলিয়া যায়।

প্রশ্ন। (১) গলন, স্ফুটন ও বাষ্পন কি ভাবে হয় বর্ণনা কর। ইহাদের বিপরীত প্রক্রিয়াগুলি কি ? (২) স্ফুটন ও বাষ্পনে প্রভেদ বুঝাইয়া বল।

I-5.1. গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক (Melting point and Boiling point)। যে সকল বিশুদ্ধ মৌল বা যৌগ তাপ প্রয়োগে গলে তাহাদের গলন একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় হয়। ঐ উষ্ণতাকে ঐ পদার্থের 'গলনাঙ্ক' (Melting point) বলে। ইহারা যখন তরল হইতে কঠিনে পরিণত হয়, তখনও কঠিনীভবন বা হিমন একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ঘটে। এই উষ্ণতাকে তরলের 'হিমাঙ্ক' (Freezing point) বলে। কেলাসিত (Crystalline) বিশুদ্ধ মৌল বা যৌগের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক একই। বিশুদ্ধ না হইলে দুই-এ তফাত হয়। অকেলাসিত পদার্থের (যেমন মাখন, চর্বি, মোম, কাচ, ইত্যাদির) স্থির গলনাঙ্ক নাই। ইহাদের কোন কোনটির গলন ও হিমন বিভিন্ন উষ্ণতায় হয়। মাখন 28°C হইতে 33°C-র মধ্যে গলে, কিন্তু জমে 20°C হইতে 22°C-র মধ্যে। মিশ্রণেরও কোন স্থির গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক থাকে না।

বিশুদ্ধ তরলে যখন স্ফুটন হয় তাহাও এক নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ঘটে। ইহাকে স্ফুটনাঙ্ক (Boiling point) বলে। অবিশুদ্ধ তরলের স্থির স্ফুটনাঙ্ক থাকে না।

গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক উভয়েই পরীক্ষণীয় কঠিন বা তরলের উপরস্থ চাপের (সাধারণত বায়ুমণ্ডলের চাপের) উপর নির্ভর করে। চাপ পরিবর্তনে গলনাঙ্কের চেয়ে স্ফুটনাঙ্কের পরিবর্তন হয় অনেক বেশী। এজন্য গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক উল্লেখ করিতে উহা কত চাপে পাওয়া গিয়াছে তাহা বলা দরকার—বিশেষ করিয়া তরলের ক্ষেত্রে। এই গোলমাল এড়াইবার জন্য এক প্রমাণ বায়ুমণ্ডলের যে চাপ (One standard atmospheric pressure) সেই চাপে গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বাহির করা হয়, এবং এই মানকে 'প্রমাণ' (normal) গলনাঙ্ক বা 'প্রমাণ' স্ফুটনাঙ্ক বলা হয়। তবে সন্দেহের অবকাশ না থাকিলে 'প্রমাণ' কথাটি প্রায়ই উল্লেখ করা হয় না। উল্লেখ না থাকিলে উহা সাধারণত 'প্রমাণ' বলিয়া মনে করা হয়। 'প্রমাণ' উল্লেখ করাই ভাল।

তরলকে কঠিনে পরিণত করিতে গিয়া কখন কখন দেখা যায় হিমাঙ্ক পার হইয়া গেলেও তরল কঠিন হয় নাই। এই ঘটনাকে 'অতিশীতলন' (Supercooling) বলে। জলের হিমাঙ্ক 0°C। কিন্তু অল্প পরিমাণ বিশুদ্ধ জলকে পরিষ্কার পাত্রে ধীরে ধীরে শীতল করিয়া 0°C-র নিচেও, এমন কি −20°C পর্যন্ত, উহাকে তরল অবস্থায়ই রাখা গিয়াছে। মেঘে তুহিনকণা জমার ব্যাপারে অতিশীতলন ঘটে।

তরল ফুটাইতে গিয়াও কখন কখন দেখা যায় স্ফুটনাঙ্ক পার হওয়া সত্ত্বেও তরল ফোটে নাই। ইহাকে 'অতিতাপন' (Superheating) বলে।

নিচের সারণিতে কয়েকটি পদার্থের প্রমাণ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক সেলসিয়াস ডিগ্রীতে (°C) দেওয়া হইল।

গলনাঙ্ক (°C)			স্ফুটনাঙ্ক (°C)		
প্ল্যাটিনাম	—	1769°	গন্ধক	—	444·6°
তামা	—	1083°	পারা	—	357°
সোনা	—	1063°	গ্লিসারিন	—	290°
রূপা	—	960·8°	জল	—	100°
দস্তা	—	419·5°	কোহল	—	78°
সীসা	—	327·3°	ক্লোরোফর্ম	—	61°
টিন	—	231·9°	ইথার	—	35°
গন্ধক	—	119°	অক্সিজেন	—	−183°
ন্যাপথালিন	—	80·2°	হাইড্রোজেন	—	−253°
পারা	—	·39°	হিলিয়াম	—	−269°

প্রশ্ন। গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কাহাকে বলে ? কি রকম ক্ষেত্রে পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক স্থির থাকে না, বা একেবারেই থাকে না উদাহরণের সাহায্যে বল।

I-5.2. গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

(ক) চাপ। বিশুদ্ধ পদার্থে গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক চাপের উপর নির্ভর করে তাহা আগেই বলিয়াছি। বরফের মত যে সকল পদার্থ গলিলে আয়তনে কমে, তাহাদের উপর চাপ বাড়াইলে তাহারা আরও সহজে গলে, অর্থাৎ গলনাঙ্ক আরও কম হয়, যদিও কমার পরিমাণ খুব সামান্য। বরফের উপর চাপ এক বায়ুমণ্ডল না হইয়া প্রায় 133 বায়ুমণ্ডল হইলে বরফ −1°C উষ্ণতায় গলিবে। ইহার অর্থ এই বর্ধিত চাপে বরফ ও জল −1°C-তে একসঙ্গে থাকিতে পারিবে ; জল জমিবে না।

ন্যাপথালিন বা মোমের মত যে সকল পদার্থ গলিলে আয়তনে বাড়ে, তাহাদের ক্ষেত্রে ক্রিয়া বরফের বিপরীত। চাপ বাড়াইলে তাহারা আরও বেশী উষ্ণতায় গলিবে, অর্থাৎ বেশী চাপে গলাইতে ইহাদের আরও বেশী উষ্ণ করিতে হইবে।

স্ফুটনাঙ্কের ক্ষেত্রে চাপের ক্রিয়া অনেক বেশী। সব তরলের ক্ষেত্রেই চাপ বাড়াইলে স্ফুটনাঙ্ক উপরে ওঠে, অর্থাৎ তরল আরও বেশী উষ্ণতায় ফোটে। জল এক বায়ুমণ্ডল চাপে 100°C-তে ফোটে। জলের উপর চাপ মোট দুই বায়ুমণ্ডল হইলে জল প্রায় 120°C উষ্ণতায় ফুটিবে। তোমাদের অনেকের বাড়িতে রান্নার জন্য হয়ত

'প্রেসার কুকার' ব্যবহার হয়। প্রথমে কুকারের জল ফুটিয়া বাষ্প বাহির হইলে বাষ্প বাহির হইবার মুখে একটি ভার চাপা দেওয়া হয়। ইহাতে বাষ্পের চাপ আরও না বাড়িলে উহা ভার ঠেলিয়া বাহির হইতে পারে না। বাষ্পের চাপ এই ভাবে হয়ত দুই বায়ুমণ্ডলের মত হয়; এবং জল 100°C-র বদলে 115°—120°C-তে ফোটে। উষ্ণতা বেশী থাকায় সব জিনিস সিদ্ধ হইতে সময় কম লাগে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের বয়লারে জল বেশী চাপে ফুটান হয়। ইহাতে নির্গত বাষ্পের চাপও বেশী হয়।

পাহাড়ের উপরে বায়ুর চাপ কম; সেখানে জলও কম উষ্ণতায় ফোটে। মোটামুটি প্রতি হাজার ফুট উচ্চতায় জলের স্ফুটনাঙ্ক 1°C করিয়া কম হয়। এভারেস্ট শৃঙ্গে জল 70°C তে ফুটিবে।

গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের উপর চাপের ক্রিয়া এরূপ কেন হয় তাহা বোঝার চেষ্টা করা যাইতে পারে। গলিলে যদি আয়তন কমে, তবে চাপ বাড়াইলে আয়তন কমাতে সাহায্য করা হয় বলিয়া গলনের জন্য প্রমাণ গলনাঙ্ক অবধি যাইতে হয় না; তাহার কমেই গলন হয়। কিন্তু অবস্থা পরিবর্তনে আয়তন বাড়িলে চাপ বাড়াইবার ক্রিয়া হয় বিপরীত, কারণ বাড়ান চাপের বিরুদ্ধে আয়তন বাড়াইতে হইবে; অতএব উষ্ণতাও বাড়াইতে হয়।

(খ) অপবস্তু (Impurity)। পদার্থ বিশুদ্ধ না হইয়া উহাতে অপবস্তু থাকিলে গলনাঙ্ক বদলায়—সাধারণত কমে; কমার পরিমাণ অপবস্তুর প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অপবস্তু কম থাকিলে গলনাঙ্কের পরিবর্তনও সামান্য হয়। এই কারণে গলনাঙ্ক মাপিয়া পদার্থের বিশুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

তরলে অপবস্তু দ্রবিত থাকিলে উহার স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে। বাড়ার পরিমাণ অপবস্তুর আপেক্ষিক পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অপবস্তু বেশী থাকিলে স্ফুটনাঙ্ক বেশী বাড়ে, কম থাকিলে কম বাড়ে। এই কারণে স্ফুটনাঙ্ক মাপিয়া তরলের বিশুদ্ধতা বোঝা যায়।

প্রশ্ন। কি কি কারণে গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্কের পরিবর্তন হইতে পারে? 'প্রমাণ' স্ফুটনাঙ্ক কাহাকে বলে? 'প্রমাণ' কথাটি বলিবার দরকার কি?

পাহাড়ের উপরে ও ইঞ্জিনের বয়লারে জলের স্ফুটনাঙ্ক সাধারণ স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে বেশী না কম?

I-5. 3. লীন তাপ (Latent heat)। কোন পদার্থে তাপ যোগ করিয়া যাইতে থাকিলে উহার উষ্ণতা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। পদার্থটি কঠিন অবস্থায় থাকিলে গলনাঙ্কে পৌঁছিয়া উহা গলিতে থাকে এবং তাপ পাইয়া চলিলেও গলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহার উষ্ণতা বদলায় না। পদার্থটি তরল অবস্থায় থাকিলে স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছিয়া উহা বাষ্পে পরিণত হইতে থাকে, এবং তাপ পাওয়া সত্ত্বেও বাষ্পনের সময় তরলের উষ্ণতা বদলায় না। গলনাঙ্কে পৌঁছিয়া আরও তাপ না পাইলে কঠিনের গলন হয় না, এবং স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছিয়া আরও তাপ না পাইলে তরলেরও স্ফুটন হয় না।

ইহা দেখিয়া আমরা প্রশ্ন করিতে পারি তাপে উষ্ণতা বাড়ে, কিন্তু গলন বা স্ফুটনের সময় তাপ পাওয়া সত্ত্বেও উষ্ণতা বাড়ে না কেন? তখন যে তাপ দেওয়া হইল তাহা কোথায় গেল—কি শক্তিতে রূপান্তরিত হইল? এই 'কোথায় যাওয়া' তাপের নামই 'লীন তাপ'। সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় 'একক ভরের কঠিন পদার্থকে উষ্ণতা পরিবর্তন না করিয়া সম্পূর্ণরূপে তরলে পরিণত করিতে যে পরিমাণ তাপের দরকার হয়, তাহাকে ঐ পদার্থের গলনের লীন তাপ (Latent heat of fusion) বলে'। বাষ্পনের ক্ষেত্রে অনুরূপে বলা হয় 'একক ভর তরলকে উষ্ণতা পরিবর্তন না করিয়া সম্পূর্ণরূপে বাষ্পে পরিণত করিতে যে তাপ দরকার হয় তাহা ঐ তরলের বাষ্পনের লীন তাপ (Latent heat of evaporation)'।

I-5. 4. **লীন তাপ কোথায় বিলীন হয়।** লীন তাপ কোথায় গেল এ প্রশ্নটির উত্তর বুঝিতে হইলে কঠিন, তরল বাষ্পীয় পদার্থের গঠন সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার। পদার্থের উপাদানভূত অণুগুলি পদার্থের কঠিন অবস্থায় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ, সকল দিকেই একটি জ্যামিতিক সজ্জায় সাজান থাকে। অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয় প্রকার বলই ক্রিয়া করে। দুই বলের ক্রিয়ায় অণুগুলি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় পরস্পর হইতে নির্দিষ্ট একটা দূরত্বে থাকে। কিন্তু স্বস্থানে উহারা স্থির না থাকিয়া অতি দ্রুত, ধর সেকেণ্ডে 10^{18} বার, কাঁপিতে থাকে। উহাদের কম্পনে গতিশক্তি থাকে। উষ্ণতা বাড়াইলে কম্পনের শক্তিই প্রধানত বাড়ে। উষ্ণতার সঙ্গে অণুগুলির পারস্পরিক দূরত্বও সামান্য বাড়ে বলিয়া উহাদের স্থিতিশক্তিও একটু বাড়ে। সাধারণ অবস্থায় তাপশক্তি এ দুটিই বাড়ায়।

তাপযোগে কম্পন ক্রমশ বেশী জোরাল হইতে থাকিলে একটা অবস্থা আসে যখন অণুগুলি স্বস্থানে থাকিতে পারে না এবং উহাদের জ্যামিতিক সজ্জা ভাঙিয়া যায়। ইহাই গলন। কঠিনের জ্যামিতিক সজ্জা ভাঙিতে শক্তির দরকার। লীন তাপই সেই শক্তি যোগায়। এ সময় কম্পনের গতিশক্তি বাড়ে না; সজ্জা ভাঙিয়া যাওয়ায় অণুগুলির স্থিতিশক্তি বাড়ে। (89 পৃষ্ঠার III-1 চিত্র দেখ।)

তরলের জ্যামিতিক সজ্জা নাই, কিন্তু অণুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব গড়ে কঠিনে উহাদের দূরত্বের চেয়ে বেশী আলাদা নয়। তরলে অণুগুলি স্থান ছাড়িয়া যথেচ্ছ চলিতে পারে এবং উহাদের গড় গতিশক্তি কঠিন গলিবার আগে কঠিনের অণুর গড় গতিশক্তির সমানই থাকে।

বাষ্পনে আয়তন অনেক বাড়ে। এক ঘন সেমি জল 100°C-তে প্রায় 1650 ঘন সেমি হয়। অতএব বাষ্পে অণুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব অনেক বেশী। এই দূরত্বে নিতে হইলে তরলের অণুগুলিকে পরস্পরের টান হইতে কার্যত বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

তাহাতে শক্তির দরকার। লীন তাপ এই শক্তি যোগায়। ইহা স্থিতিশক্তি। একই উষ্ণতায় বাষ্প অণুর গড় গতিশক্তি তরল অণুর গড় গতিশক্তির সমান। উষ্ণতা অণুর গড় গতিশক্তির উপর নির্ভর করে। লীন তাপ অণুর স্থিতিশক্তি বাড়ায়, গতিশক্তি বাড়ায় না ; তাই লীন তাপযোগে উষ্ণতা বাড়ে না।

বাষ্প যখন ঘনীভূত হইয়া তরলে পরিণত হয় তখন অণুগুলি আবার কাছে আসায় উহাদের স্থিতিশক্তি কমে। স্থিতিশক্তির হ্রাস তাপরূপে প্রকাশ পায়। একক ভর বাষ্প যখন উষ্ণতা না বদলাইয়া সম্পূর্ণরূপে তরলে পরিণত হয়, তখন উহা যে পরিমাণ তাপ ছাড়িয়া দেয় তাহাকে 'তরলনের লীন তাপ' (Latent heat of condensation) বলে। ইহা ঐ একই উষ্ণতায় তরলের বাষ্পনের লীন তাপের সমান। তরল কঠিন হইতে গিয়া একই কারণে তাপ ছাড়ে। এই তাপ বাহির করিয়া দিতে না পারিলে হিমাঙ্কে থাকিলেও তরল জমিবে না। জল নিয়া এই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। ছোট একটি শিশিতে একটু জল নিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া বরফ দিয়া শিশি ঢাকিয়া রাখ। জল জমিবে না। উহার হিমনের লীন তাপ (Latent heat of freezing) বাহির করিয়া নিতে উহাকে আর একটু ঠাণ্ডা করা দরকার (এ তাপও গলনের লীন তাপের সমান। এ জন্য চার ভাগ বরফ ও এক ভাগ নুনের মিশ্রণ নাও। ইহা বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। ইহাতে বসাইলে শিশির জল হইতে তাপশক্তি বাহির হইয়া যাইতে পারিবে ও জল জমিবে।

একটু ফুটন্ত জল গায়ে পড়িলে যে জ্বালা হয়, সমান ওজনের ও উষ্ণতার জলীয় বাষ্প গায় লাগিতে দিলে জ্বালা হইবে তাহার চেয়ে অনেক বেশী। বাষ্প প্রথমে জমিয়া জল হইতে তাহার লীন তাপ ছাড়িবে। জমা জল ঠাণ্ডা হইবার তাপের তুলনায় লীন তাপ কয়েকগুণ বেশী ; তাই জ্বালাও বেশী।

বরফ নিজ গলনাঙ্কে (0°C-তে) থাকিয়া তাপ না দেওয়া সত্ত্বেও গলে বলিয়া তোমার মনে হইতে পারে। কিন্তু বরফের আশে পাশের সব বস্তু বরফের চেয়ে গরম বলিয়া বরফ তাহাদের কাছ হইতে পরিবহণ ও বিকিরণে তাপ পায় ; তাই গলিতে পারে। থার্মফ্লাস্কে বরফ অনেক বেশীক্ষণ বরফ অবস্থায়ই থাকিতে পারে কারণ উহাতে পরিবহণ ও বিকিরণে তাপ প্রবেশ খুব কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন। (১) লীন তাপ কাহাকে বলে? তাপযোগে উষ্ণতা বৃদ্ধি হইলেও লীন তাপে তাহা হয় না কেন?

লীন তাপ কি শক্তিতে পরিণত হয়?

(২) পদার্থ কঠিন, তরল, বায়বীয় এই তিন অবস্থায় থাকিতে পারে—তাহার কি কারণ দেখাইতে পার?

(৩) একটি ছোট শিশিতে জল নিয়া উহাকে সম্পূর্ণভাবে বরফে ঢাকিয়া রাখিলে জল জমিবে কি না, কারণ দেখাইয়া বল।

দ্বিতীয় অংশ

পদার্থ-বিদ্যা

II-1. বলবিজ্ঞানের গোড়ার কথাঃ স্থিতি ও গতি (Rest and Motion)।

সম্ভবত গতিই মানুষের মনে বিজ্ঞানের প্রথম প্রেরণা জাগায়। আকাশে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারার গতির প্রকৃতি জানিতে ও বুঝিতে চাওয়ার ফলে জ্যোতির্বিদ্যার (Astronomy-র) সৃষ্টি হয়। অল্প কায়িক পরিশ্রমে বেশী ফল পাইতে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা প্রয়োজনে মানুষ যন্ত্র বানাইতে শেখে ; ক্রমে যন্ত্রবিষয়ক মূলতত্ত্বগুলিও জানিতে পারে। এই সকল জানিতে ও বুঝিতে বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছিল। তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন মনীষীরা এই সকল তত্ত্বকে সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে II-1 হইতে II-3 বিভাগ পর্যন্ত ও উহাদের উপবিভাগে 'গতি' (motion), গতির কারণ স্বরূপ 'বল' (force), বলের ক্রিয়া ও সরল তিনটি যন্ত্র সম্বন্ধে একেবারে গোড়ার কয়েকটি কথা বলিব।

পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম কাজ হইল কোন প্রাকৃতিক ঘটনার সঠিক বর্ণনা দেওয়া ইহার জন্য কোন কোন শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতে হয়। গতির বর্ণনায়ও আমাদের এরূপ কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা প্রথমে এরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ স্পষ্ট বুঝিতে চেষ্টা করিব।

১। **বস্তু (Body)**। ছোট বা বড় যে কোন পদার্থ খণ্ডকেই আমরা 'বস্তু' বলিব। একটুকরা পাথর, একখানা বই, একখণ্ড ইট, ইত্যাদি সবই 'বস্তু'।

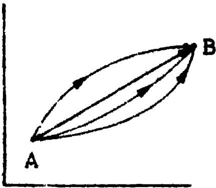
২। **কণা (Particle)**। কণা বলিতে সাধারণ ভাষায় আমরা পদার্থের খুব ছোট একটি খণ্ড বা অংশ বুঝি, যেমন ধূলিকণা, জলকণা, ইত্যাদি। গতিবিষয়ক বিজ্ঞানে কণা কথাটির একটু অন্য রকম অর্থ আছে। 'কণা' পদার্থের অতি ক্ষুদ্র এক অংশ ; উহার ভর আছে, কিন্তু উহার আয়তন উপেক্ষা করিয়া একটি জ্যামিতিক বিন্দু দিয়াই উহার অবস্থান আমরা বুঝাই। বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত ছোট বা বড় বস্তুর আকারের (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধের) তুলনায় উহাদের দূরত্ব যদি অনেক বেশী হয়, তাহা হইলেও ঐ বস্তু যত বড়ই হউক না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা উহাকে কণা বলিয়াই ধরি। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর গতি আলোচনায় সূর্য ও পৃথিবীকে উপরোক্ত বিশেষ অর্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কণা বলিয়া ধরা যায়।

৩। স্থিতি (Rest) ও গতি (Motion)। কোন বস্তু তাহার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বস্তু সাপেক্ষে স্থির থাকিলে আমরা বলি উহা 'স্থিতি'তে আছে। পারিপার্শ্বিক সাপেক্ষে উহা চলিতে থাকিলে বলি উহার 'গতি' আছে।

চলন্ত রেলগাড়ির মধ্যে একজন যাত্রী গাড়ির মেঝেয় বা উপরে রাখা বাক্সটিকে স্থির মনে করিবেন। বাক্স তাহার পরিপার্শ্ব সাপেক্ষে স্থির আছে। কিন্তু গাড়ির বাহিরে মাটিতে দাঁড়ান দর্শক বাক্সটিকে সচল মনে করিবেন। অতএব স্থিতি ও গতি কথা দুইটি আপেক্ষিক (relative)। একজনের দৃষ্টিতে যাহা স্থির, অন্যের দৃষ্টিতে তাহা সচল হইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিপার্শ্ব বলিতে আমরা ভূপৃষ্ঠই বুঝি। ভূপৃষ্ঠ সাপেক্ষে বাক্সটির গতি আছে। গাছপালা, বাড়িঘর ভূপৃষ্ঠ সাপেক্ষে স্থির, কিন্তু অন্য গ্রহ হইতে তাহাদের সচল মনে হইবে, কারণ পৃথিবীর সঙ্গে তাহারা চলিতেছে। কোন বস্তুই গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, ইত্যাদি সব কিছু সাপেক্ষে স্থির হইতে পারে না।

দুইটি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব সময়ের সঙ্গে বদলাইতে থাকিলে সুবিধার জন্য উহাদের যে কোনটিকে স্থির ও অপরটিকে সচল ধরা যায়। গতিও আপেক্ষিক—ইহা সকল সময়েই এক বস্তু সাপেক্ষে অন্য বস্তুর স্থান পরিবর্তন।

৪। সরণ (Displacement)। কোন কণা এক অবস্থান হইতে অন্য অবস্থানে গেলে উহার প্রথম অবস্থান বিন্দু হইতে দ্বিতীয় অবস্থান বিন্দু পর্যন্ত সরল রৈখিক দূরত্বকে কণার 'সরণ' বলে। সরণ বুঝাইতে সরণের মান ছাড়া দিক্‌ও বলিতে হয়। সরিবার সময় কণা কোন্ পথে আদি অবস্থান A (II-1 চিত্র) হইতে শেষ অবস্থান B-তে গিয়াছে তাহার উপর সরণ নির্ভর করে না। A হইতে B অবধি টানা সরল রেখাটি সরণ নির্দেশ করে। সরণ আদি ও শেষ অবস্থানের দূরত্ব ও গতির দিক্ বুঝায়।



II.1 চিত্র

৫। বেগ (Velocity) ও দ্রুতি (Speed)। সময়ের সহিত সরণ পরিবর্তনের হারকে 'বেগ' বলে। দুই সেকেণ্ডে পূর্বদিকে সরণ এক মিটার হইয়া থাকিলে বেগ পূর্বদিকে 1 মিটার÷2 সেকেণ্ড=প্রতি সেকেণ্ডে 50 সেমি ; ইহাকে 0·5 মি/সে রূপেও লেখা যায়। (মিটারের সংক্ষিপ্তরূপ 'মি' ও সেকেণ্ডের 'সে'।) বেগ কথাটিতে কেবল স্থান পরিবর্তনের হার বুঝায় না, উহাতে সরণের দিক্‌ও বুঝায়। বেগের মান ও দিক্ উভয়ই আছে।

বস্তু বা কণা সরলরেখায় না চলিয়া বক্ররেখায় চলিলে গতির সময় উহার দিক্ পরিবর্তন হইতে থাকে। এ ক্ষেত্রে দিকের কথা না আনিয়া আমরা কেবল কি হারে

বস্তু বা কণাটি পথ চলিতেছে (দূরত্ব অতিক্রম করিতেছে) তাহাই বলিতে পারি। (সময়ের সহিত কোন বস্তু বা কণার দূরত্ব অতিক্রম করার হারকে 'দ্রুতি' বলে।) দ্রুতিতে দিকের কোন উল্লেখ থাকে না। গোল মাঠে সাইকেল রেস্ হইতে থাকিলে বলিতে পার যে প্রথম হইয়াছে তাহার দ্রুতি ছিল ঘণ্টায় দশ মাইল বা ষোল কিলোমিটার। গতি সরলরেখায় হইলে সে ক্ষেত্রে বেগ কথাটির প্রয়োগ সহজ হয়, কারণ দিক্ ঠিক আছে। (বেগের দিক্ না বলিয়া কেবল মান বলিলে উহা দ্রুতি।) বেগ ও দ্রুতিতে উপরোক্ত প্রভেদ আছে বলিলেও বেগ সর্বদা গতির অভিমুখে এ কথা মনে রাখিলে উহার প্রয়োগে কোন অসুবিধা হয় না।

কোন বস্তু বা কণা সমান সময়ে (তা সে সময় যতই কম হউক না কেন) সমান দূরত্ব অতিক্রম করিলে উহার বেগকে 'সুষম' (uniform) বলা হয়। অন্যথায় বেগ 'অসম' (non-uniform)। সুষম বেগে সরণ বেগ ও সময়ের গুণফলের সমান (সরণ = সুষম বেগ × গতি কাল)। চলার পথে বেগ অসম হইলে পথের মোট দৈর্ঘ্যকে মোট সময় দিয়া ভাগ করিয়া আমরা 'গড় বেগ' (Mean বা average velocity) পাই।

৬। ত্বরণ (Acceleration)। সময়ের সহিত বেগ বৃদ্ধির হারকে 'ত্বরণ' বলে। বেগের মান ও দিক্ উভয়ই আছে বলিয়া ত্বরণেরও মান এবং দিক্ দুইই থাকিবে। ত্বরণের উদাহরণ স্বরূপ রেলগাড়ির চলা ধরিতে পার। স্টেশনে গাড়ি থামিয়া আছে এবং ধর রেল লাইন সোজা। স্থির অবস্থায় গাড়ির বেগ শূন্য। ইঞ্জিন চলিতে শুরু করিল। প্রথমে উহার গতি মন্থর থাকে এবং ক্রমশ উহা বাড়ে। বেগ প্রথমে কম এবং ক্রমে বেশী। চলিতে আরম্ভ করিয়া গাড়ির বেগ বাড়িতেছে—আমাদের নূতন ভাষায় উহার 'ত্বরণ' ঘটিয়াছে (বা উহা 'ত্বরিত' হইয়াছে)। এ রকম বহু উদাহরণ পাইবে। আমরা দাঁড়াইয়া আছি, চলিতে শুরু করিলাম। আমাদের ত্বরণ হইল না ? হাতের ঢিল ছুড়িয়া মারিলে। ঢিলটি হাতে প্রথমে স্থিতিতে ছিল ; উহার বেগ ছিল শূন্য। হাত নাড়ার সঙ্গে উহা বেগ পাইল। দুই অবস্থার মধ্যে উহার বেগ পরিবর্তন ঘটিয়া উহা ত্বরিত হইল।

রেলগাড়ি চলিতে গিয়া ধর প্রথম সেকেণ্ডে গড়ে মাত্র এক মিটার গেল। উহার গড় বেগ 1 মি/সে। দশম হইতে একাদশ সেকেণ্ডে উহা যেন 7 মিটার গেল। এই এক সেকেণ্ডে উহার বেগ 7 মি/সে। দশ সেকেণ্ডে গাড়ির বেগ 1 মি/সে হইতে বাড়িয়া 7 মি/সে হইল। অতএব উহার

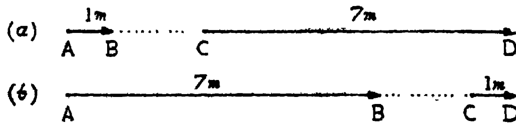
$$\text{ত্বরণ} = \frac{7\ \text{মি/সে} - 1\ \text{মি/সে}}{10\ \text{সে}} = \frac{6\ \text{মি/সে}}{10\ \text{সে}} = 0{\cdot}6\ \text{মি/সে}^2$$

বা প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে 0·6 মিটার। ত্বরণে সময়ের উল্লেখ দুবার কেন করিতে হয় তাহা উপরের উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারিবে—বেগের উল্লেখে একবার এবং বেগ পরিবর্তনের উল্লেখে আর একবার।

বেগের মান পরিবর্তন না ঘটিয়া কেবল দিক্ পরিবর্তন ঘটিলেও (যেমন বাঁকা লাইনে গাড়ি চলিলে) ত্বরণ হইয়াছে বলিতে হইবে। সাইকেল চালাইতে চালাইতে দ্রুতি না কমাইয়া যখন বাঁক নাও তখন কেবল দিক্ই বদলায়। ইহাতেও ত্বরণ ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। আমরা কেবল বেগের মান পরিবর্তনে ত্বরণের কথাই বলিব; দিক্ পরিবর্তনে ত্বরণের আলোচনা করিব না।

৭। **মন্দন (Retardation)**। সময়ের সহিত বেগ কমার হারকে 'মন্দন' বলে। ইহা ত্বরণের বিপরীত; ত্বরণে বেগ বাড়ে ও মন্দনে বেগ কমে। অনেক সময় ত্বরণ কথাটি দিয়াই বেগের বৃদ্ধি বা হ্রাস বুঝান হয়। বেগ কমিলে ত্বরণ নিগেটিভ রাশি হয়।

ত্বরণ প্রসঙ্গে বলা রেলগাড়ির উদাহরণটিই ধর। মনে কর গাড়ি আসিয়া স্টেশনে থামিবে। খানিক আগে হইতেই গাড়ি উহার বেগ কমাইতে থাকে, অর্থাৎ উহার 'মন্দন' ঘটে (বা উহা 'মন্দিত' হয়)। থামিবার শেষ সেকেণ্ডে গাড়ি যেন 1 মি চলিয়া থামিল। তাহার দশ সেকেণ্ড আগে উহা সেকেণ্ডে 7 মিটার চলিয়াছিল। অতএব দশ সেকেণ্ডে বেগ 7 মি/সে হইতে কমিয়া 1 মি/সে হইল। আগের মত হিসাব করিয়া দেখিতে পাই



II.2 চিত্র

মন্দন $=$ (7 মি/সে $-$ 1 মি/সে) $\div$ 10সে $=$ 0·6 মি/সে^{2}। বিকল্পে বলা চলে এক্ষেত্রে ত্বরণ ঋণ রাশি, কারণ ত্বরণের সংজ্ঞা অনুসারে বেগ বৃদ্ধি $=$ অন্তবেগ $-$ আদিবেগ $=$ 1 মি/সে $-$ 7 মি/সে $= -6$ মি/সে। ইহা দশ সেকেণ্ডে ঘটিয়া থাকায় বেগ বৃদ্ধির হার, অর্থাৎ ত্বরণ $= -6$ মি/সে $\div$ 10সে $= -0·6$ মি/সে^{2}।

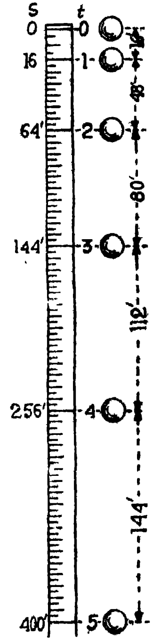
II.2. চিত্রে ত্বরিত ও মন্দিত গতির প্রকৃতি কিছুটা বুঝিতে পারিবে। (a)-চিত্রে ত্বরণ ও (b)-চিত্রে মন্দন দেখান। উভয় চিত্রে প্রথম সেকেণ্ডে অতিক্রান্ত পথ AB, এবং শেষ সেকেণ্ডে অতিক্রান্ত পথ CD। গতির মধ্যের অংশ দেখান হয় নাই; উহা যে আছে ফুটকিগুলিতে তাহা বুঝায়।

সাইকেল যখন থামাইতে চাও তখন ব্রেক কষিয়া মন্দন ঘটাও দৌড়ের উপর নিজেকে যখন থামাইতে চাও তখন পা মাটিতে আটকাইবার চেষ্টা করিয়া নিজের মন্দন ঘটাও। একটু ভাবিয়া দেখিলেই ত্বরণ ও মন্দনের অসংখ্য উদাহরণ পাইবে। স্থিতি হইতে গতিতে বা গতি হইতে স্থিতিতে যাইতে যথাক্রমে ত্বরণ এবং মন্দন ঘটে।

প্রশ্ন। স্থিতি ও গতিকে আপেক্ষিক বলা হয় কেন? বেগ ও দ্রুতিতে প্রভেদ কি? ত্বরণ ও মন্দন কাহাকে বলে একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

II-1.1. অবাধ পতনে ত্বরণ সুষম (Acceleration uniform in free fall) উপরে ত্বরণের যে উদাহরণগুলি আমরা দিয়াছি সে সকল গতিতে ত্বরণে বরাবর সমান থাকে না। রেলগাড়ি গোড়ায় ত্বরিত হইয়া শেষে কার্যত সুষম বেগে চলে; তখন উহার ত্বরণ শূন্য। থামিতে গিয়া বেগ যখন ক্রমশ কমিতে থাকে তখন মন্দন গোড়ায় যদিও বা সুষম হয়, থামার পর মন্দন শূন্যে পরিণত হয়।

সুষম ত্বরণে গতির একটি উদাহরণ সর্বদাই আমরা দেখিতে পাই। উহা হইল উপর হইতে ভারী বস্তুর পতন। ছাদের উপর হইতে স্থির একটি ঢিল মাটির দিকে ছাড়িয়া দিলে। পৃথিবীর আকর্ষণে উহা মাটিতে পড়িবে। বায়ু ইহার গতিতে কিছু বাধা দেয়। কিন্তু ঢিলের ভার বায়ুর বাধার তুলনায় অনেক বেশী হইলে ঢিল সুষম ত্বরণে মাটিতে পড়ে; অর্থাৎ পতনকালে সময়ের সঙ্গে উহার বেগ একই হারে বাড়িতে থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে বেগ প্রায় 9·8 মিটার (বা 32 ফুট) করিয়া বাড়ে, ইহা জানা আছে। এক্ষেত্রে সুষম ত্বরণ প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে প্রায় 9·8 মিটার (বা 32 ফুট)।



II.3 চিত্র

II.3. চিত্রে অবাধ পতনে গতির প্রকৃতি দেখান হইয়াছে। গতির বৈশিষ্ট্য হইল স্থিতি হইতে আরম্ভ করিয়া গতি যতক্ষণ ধরিয়া চলে, পতনে অতিক্রান্ত পথ হয় সেই সময়ের বর্গের আনুপাতিক। সুষম ত্বরণকে f অক্ষর দিয়া, গতিকালকে t দিয়া এবং t সময়ে অতিক্রান্ত পথকে s অক্ষর দিয়া বুঝাইলে $s=\frac{1}{2}ft^2$ হয়। অবাধ পতনে $f=$ 32 ফুট/সে^{2} ধরিলে, প্রথম সেকেণ্ডে পতন 16 ফুট, প্রথম দুই সেকেণ্ডে পতন 64 ফুট, প্রথম তিন সেকেণ্ডে 144 ফুট, ইত্যাদি (II-3 চিত্র দেখ)। দ্বিতীয় সেকেণ্ডে ঢিলটি পড়ে $64-16=48$ ফুট, তৃতীয় সেকেণ্ডে $144-64=80$ ফুট। ছবিতে ইহাও দেখান আছে।

এক টুকরা কাগজ বা একটা পাতা এভাবে পড়িবে না, কারণ উহার ভারের তুলনায় বায়ুর বাধা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। বায়ুর বাধা ভারের তুলনায় উপেক্ষণীয় (তুলনায় খুবই কম) হইলে তবেই পতনকে কার্যত অবাধ পতন (free fall) বলা চলে।

ঢিল খাড়াভাবে উপরে ছুড়িলে উহার বেগ সেকেণ্ডে পূর্বোক্ত হারে কমিতে থাকে। ইহা সুষম মন্দন।

অবাধ পতনে সকল বস্তুর ত্বরণ সমান। একখানা ইট এবং একসঙ্গে বাঁধিয়া দু খানা ইট একই উচ্চতা হইতে ছাড়িয়া দিলে উহারা একসঙ্গে মাটিতে পড়ে। ভর দ্বিগুণ হওয়ায় বেগ বা ত্বরণ কোনটিই দ্বিগুণিত হয় নাই, একই রহিয়াছে।

অবাধ পতন সংক্রান্ত বিষয়গুলি ইটালীয় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর (1564-1642 খ্রীঃ) আবিষ্কার।

প্রশ্ন। সুষম ত্বরণে গতির একটি সুপরিচিত উদাহরণ দাও। এইরূপ গতির বৈশিষ্ট্যগুলি বল। (সংকেত—(১) বেগ গতিকালের আনুপাতিক, (২) অতিক্রান্ত পথ গতিকালের বর্গের সমানুপাতিক, (৩) সকল ভারী বস্তু একই ত্বরণে পড়ে।)

II-2. নিউটনের গতিবিষয়ক সূত্র (Newton's law of motion)।

II-1 বিভাগে আমরা কেবল সরল রৈখিক গতির বর্ণনা সংক্রান্ত কথা বলিয়াছি। বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটন (1642-1727 খ্রীঃ) গতি সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি তিনটি সূত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সূত্র তিনটিই যন্ত্রবিজ্ঞান (Mechanics)-এর (বা স্থিতিবিদ্যা ও গতিবিদ্যার) ভিত্তি। এ তিনটি জানা না থাকিলে যন্ত্রবিজ্ঞান এবং উহার উপর নির্ভরশীল বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা কিভাবে আগাইত তাহা ধারণা করা যায় না। সূত্রগুলিতে আমাদের আলোচিত গতিবিষয়ক বিশেষ শব্দগুলি ছাড়াও দুইটি নূতন কল্পনের (concept) আশ্রয় নিতে হইয়াছে। আগের শব্দগুলিতে শুধু দূরত্ব আর কালের কল্পন আছে। সূত্রগুলিতে 'ভর' ও 'বল'-এর কল্পন উহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

নিউটনের ভাষায় ব্যক্ত সূত্র তিনটির অনুবাদ না করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় উহাদের নিচের মত করিয়া বলা যায় :

প্রথম সূত্র। বাহির হইতে কোন বল প্রয়োগ না করিলে স্থির বস্তু স্থিতিতেই থাকিবে এবং সচল বস্তু সুষম বেগে সরলরেখায় চলিতে থাকিবে।

দ্বিতীয় সূত্র। প্রযুক্ত বল কোন বস্তুতে যে ত্বরণ সৃষ্টি করে তাহা বলের সমানুপাতিক এবং বলের অভিমুখে।

এ সূত্রটিকে অন্যভাবেও লেখা হয়—'ভরবেগ (momentum) পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বলের অভিমুখে'। 'ভরবেগ' কথাটির সঙ্গে আমাদের

এখনও পরিচয় হয় নাই বলিয়া আমরা ত্বরণের সাহায্যে সূত্রটি লিখিয়াছি। দুই-এ কোন প্রভেদ নাই। II-2.2. উপবিভাগে এই সূত্র আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সে কথা বুঝিতে পারিব।

তৃতীয় সূত্র। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত। অন্য ভাষায়—প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে।

সূত্রগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষার ফল নয়। উহারা গতিসংক্রান্ত সকল অভিজ্ঞতার মূল অনুধাবনের ফল। প্রত্যক্ষভাবে সূত্রগুলি পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু এগুলি হইতে যে সকল সিদ্ধান্ত করা যায় তাহার কোনটিই ভুল প্রমাণিত হয় নাই। [বেগ আলোর গতির সঙ্গে তুলনীয় হইলে, বা কণাগুলি অণু, পরমাণু বা ইলেকট্রন হইলে সূত্রগুলি ঠিক ফল দেয় না—অতএব এগুলি ভুল ইহা বলা ঠিক নয়। সূত্রগুলি অত বেগ বা অত ক্ষুদ্রতার জন্য রচিত হয় নাই—হইয়াছে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার গতির ও ভরের জন্য। এক্ষেত্রে উহার ক্রটি নাই।]

ব্যাখ্যা না করিলে সূত্রগুলির অর্থ পরিষ্কার হইবে না। নিচের তিনটি উপবিভাগে সূত্র তিনটির ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

II-2.1. প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা। প্রথম সূত্রটিকে 'জাড্যের বা জড়ত্বের সূত্র'ও (Law of inertia) বলে। ইহাতেই বল ও ভরের কল্পন আনা হইয়াছে। সূত্রে বলা হইয়াছে কোন বস্তুই বাধ্য না হইলে তাহার স্থিতি বা গতির অবস্থা বদলায় না। ইহাতে বোঝা যায় **সকল বস্তুরই এমন একটি ধর্ম আছে যাহার জন্য সে নিজ হইতে স্থিতি বা গতির অবস্থা বদলায় না, অবস্থা পরিবর্তনে বাধা দেয়। এই ধর্মকে 'জাড্য' বা 'জড়ত্ব' (Inertia) বলে।** পরে দেখিব ইহা হইতে ভরের ধারণায় যাওয়া যায়, কারণ এই ধর্ম সকল পদার্থের ধর্ম। [জাড্য ধর্ম হইতে ভরের যে ধারণা আমরা আনি তাহাকে 'জড়ত্বীয় ভর' (Inertial mass) বলে। জড়ত্বীয় ও আগের মহাকর্ষীয় ভর একই কি আলাদা তাহা প্রথম দৃষ্টিতে মোটেই বোঝা যায় না। তবে বিজ্ঞানী জানিয়াছেন উহারা একই। দ্বিতীয় সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এ কথায় আসিব।]

প্রথম সূত্রে বলের সংজ্ঞাও পাওয়া যায়। এই সূত্র অনুসারে **'বল' তাহাই যাহা বস্তুর স্থিতীয় বা গতীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে পারে।** কিন্তু এ রকম সংজ্ঞা হইতে বলের মান কিভাবে পাইব তাহা বোঝা যায় না। উহা আসে দ্বিতীয় সূত্র হইতে।

জাড্যধর্মের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে। রেলগাড়ি, বাস, ট্রাম হঠাৎ চলিতে শুরু করিলে সকলে পিছনের দিকে একটা ধাক্কা খাই। দাঁড়াইয়া থাকিলে পিছনদিকে

পড়িয়া যাইতেও পারি। ইহা স্থিতি জাড্যের (Inertia of rest-এর) জন্য। স্থির আছি; স্থির থাকিতে চাই। গাড়ি সামনের দিকে চলায় গাড়ির সঙ্গে পা বা দেহের নিচের অংশ আগাইয়া যায়; কিন্তু উপরের দেহাংশ নিজের জায়গায় থাকিতে চায়। গাড়ি হঠাৎ থামিলে অনুরূপে সামনের দিকে ধাক্কা খাই। দেহ গাড়ির সঙ্গে চলিতেছিল। গাড়ি থামায় উহার সঙ্গে লাগা নিচের অংশ থামিয়া গেল, উপরের দেহাংশ আগের মতই চলিতে চাহিল। ইহা গতি জাড্য (Inertia of motion)।

বল ক্রিয়া না করিলে গতি জাড্যের জন্য গতি সরলরেখায় সুষম বেগে হইবে তাহার কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেওয়া যায় না। তবে ইহা অনুমান করা যায়। মসৃণ মেঝের উপর বল গড়াইয়া দিলে উহা খানিকদূর গিয়া থামিয়া যায়। মেঝের সঙ্গে ঘর্ষণ ইহার কারণ। ঘর্ষণ সব সময় গতিতে বাধা দেয়। ঘর্ষণ আমরা সম্পূর্ণ দূর করিতে পারি না; তবে যত কমাই তত দেখি একই বস্তু একই বেগে চলিলে ঘর্ষণ যত কম থাকে উহা তত বেশী দূর যায়। ঘর্ষণ একেবারে না থাকিলে বস্তুটিকে কেহ থামাইত না, এবং একই বেগে উহা চলিতে থাকিত—এ অনুমান সঙ্গত। বলের ক্রিয়া না থাকিলে সচল বস্তু সুষম বেগে সরলরেখায় চলিত ইহা পরীক্ষায় প্রমাণ করিতে পারি না। ঘর্ষণ বা অন্য বস্তুর আকর্ষণ থাকিয়াই যায়। প্রমাণ না থাকিলেও ঐ অনুমানের ভিত্তিতে গৃহীত কোন সিদ্ধান্তই ভুল প্রমাণিত হয় নাই।

প্রশ্ন। নিউটনের গতীয় সূত্রগুলি বল। বস্তুর জাড্য বলিতে কি বুঝায়? স্থিতি ও গতি-জাড্যের উদাহরণ দাও। জাড্য হইতে ভরের ধারণা কি করিয়া আনা যায়? (II-2.2. দেখ।)

সুষম বেগে চলন্ত রেলগাড়িতে কোন যাত্রী একটি বল উপরের দিকে ছুড়িয়া দিলেন। বল তাহার হাতেই ফিরিয়া আসিবে কি না কারণ দেখাইয়া বল। (উত্তরের আভাস—বল ও যাত্রীর বেগ সমান। বল উপরে উঠিয়া নিচে নামিতে যে সময় নিবে, সে সময়ে বল ও যাত্রী সমান দূর আগাইয়া যাইবে)।

II-2. 2. দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা। কোন বস্তুকে ঠেলিতে বা টানিতে মাংসপেশীতে আমরা যে টান অনুভব করি তাহাই আমাদের বলের অনুভূতি। কোন বস্তুকে কম বেগে ঠেলিয়া দিতে কম বল লাগে; একই সময়ে উহাকে বেশী বেগে ঠেলিয়া দিতে বেশী বল লাগে। তা ছাড়া ঠেলা যেদিকে দেওয়া হয় বস্তু সে দিকেই সরে। এ সকলই আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় সূত্রে নিউটন বলকে গতি পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। গতি পরিবর্তন অর্থই ত্বরণ। উপরের উদাহরণে প্রথম ক্ষেত্রে ত্বরণ কম, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বেশী।

তা ছাড়া, হালকা বলিয়া যে বস্তুগুলিকে মনে করি, তাহার কোনটিকে ঠেলিয়া দিতে যে বল লাগে, একই বেগে তাহার চেয়ে ভারী বলিয়া বোধের বস্তুকে ঠেলিয়া দিতে আরও বেশী বল লাগে। ইহা বস্তুত জাড্যের জন্য। হালকা বস্তু একই বলে

গতি পরিবর্তনে কম বাধা দেয় ; ভারী বস্তু বেশী বাধা দেয়। হালকা বস্তুর জাড্য কম, ভারী বস্তুর জাড্য বেশী। **কোন বস্তুতে উহার জাড্যের পরিমাণকে উহার 'জড়ত্বীয় ভর' বা সংক্ষেপে 'ভর' বলে।**

বস্তুর ভর বেশী হইলে উহাকে একই ত্বরণ দিতে বেশী বল লাগিবে। m ভরের বস্তুতে f ত্বরণ দিতে যে P বলের দরকার হইবে তাহা m ও f উভয়ের আনুপাতিক। গণিতের ভাষায় এরূপ সম্পর্ককে লেখা হয় $P=kmf$; ইহাতে k একটি স্থির সংখ্যা। বলের একক এ পর্যন্ত আমরা স্থির করি নাই। 1 একক ভরকে 1 একক ত্বরণ দিতে যে বলের দরকার হয় তাহাকে বলের একক ধরিলে $k=1$ হয়। মেট্রিক বা বৃটিশ পদ্ধতিতে ইহাই করা হয়। (বলের এককের জন্য II-2. 4. উপবিভাগ দেখ।)

$P=mf$ সূত্রটি গতির মূল সূত্র। ইহা হইতে ভর ও ভারের সম্পর্ক আমরা অবিলম্বে পাইতে পারি। m ভরের উপর পৃথিবীর আকর্ষক বলে ভর যে ত্বরণ পায় তাহাকে g বলা যাক। II-1.1. বিভাগে আমরা দেখিয়াছি সকল বস্তু মাটিতে একই ত্বরণে পড়ে। অতএব বস্তুর ভর m হইলে উহার ভার $W=mg$।

$P=mf$ সূত্র অনুসারে, **কোন বস্তুতে নির্দিষ্ট কোন বল প্রয়োগ করিয়া উহার ত্বরণ মাপিতে পারিলে বল÷ত্বরণ এই ভাগফলই হইবে বস্তুর ভর।** ত্বরণ মাপন কঠিন হইলেও জড়ত্বীয় ভর এইভাবে মাপা যায়। দেখা যায় ইহা মহাকর্ষীয় ভরের সমান। **জানা ভরের বস্তুতে স্থিরমান বলে সৃষ্ট ত্বরণ মাপিয়া বলের মান জানা যায়।**

ভরবেগ (Momentum)। কোন বস্তুর ভর ও উহার বেগের গুণফলকে বস্তুটির 'ভরবেগ' বলে। সুবিধার জন্য ধরা যাক m ভরের বস্তু সরলরেখায় চলিতেছে। গতির দিকে বল প্রয়োগের আগে বস্তুটির বেগ ধর v_1 ছিল। t সময় ধরিয়া ইহার গতির দিকে স্থিরমান বল P প্রয়োগ করায় বেগ v_2 হইল। ইহাতে বস্তুটির ভরবেগের পরিবর্তন হইল mv_2-mv_1 এবং ভরবেগ পরিবর্তনের হার হইল $m(v_2-v_1)/t$। ত্বরণের সংজ্ঞা অনুসারে $(v_2-v_1)/t=$ত্বরণ$=f$। ভরবেগের সাহায্যে দ্বিতীয় সূত্রের যে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বলে 'বল ভরবেগ পরিবর্তনের হারের আনুপাতিক'। অতএব এভাবে দেখিলেও $P=kmf$। আগের মত বলের একক স্থির করিলে $k=1$ হইবে।

প্রশ্ন। নিউটনের প্রথম সূত্র হইতে বলের সংজ্ঞা কিভাবে পাওয়া যায়? দ্বিতীয় সূত্র বল মাপনের উপায় কিভাবে নির্দেশ করে?

II-2. 3. তৃতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা। বল যে বস্তুটির উপর ক্রিয়া করে প্রথম দুই সূত্রে কেবল তাহারই উল্লেখ আছে ; যে বল প্রয়োগ করিল তাহার কোন উল্লেখ নাই। তৃতীয় সূত্রে তাহাকেও আনা হইয়াছে। বৃষ্টির বারিবিন্দু মাটিতে পড়িতেছে।

প্রথম দুই সূত্র বারিবিন্দু সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বারিবিন্দুতে বল প্রয়োগ করিতেছে পৃথিবী। তৃতীয় সূত্রে পৃথিবীকে আনা হইয়াছে। বারিবিন্দুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ হইল বারিবিন্দুতে প্রযুক্ত বল; ইহাকে 'ক্রিয়া' বলা যাক। তৃতীয় সূত্রে বলে বারিবিন্দুও পৃথিবীর উপর সমান ও বিপরীত বল প্রয়োগ করিবে; ইহাই প্রতিক্রিয়া। লক্ষ্য কর **ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন বস্তুর উপর কাজ করে।** একটি যতক্ষণ থাকে অন্যটিও ততক্ষণ থাকে। একের অবর্তমানে অন্যটি নাই। দেখা যায় **বল কখনও একক ক্রিয়া করে না; বলের ক্রিয়া জোড়ায় জোড়ায়।**

বলিতে পার বারিবিন্দুর টানে পৃথিবী বারিবিন্দুর দিকে ত্বরিত হইয়া সরে না কেন? $P=mf$ সূত্র হইতে দেখা যায় $f=P/m$। পৃথিবীর ভর বারিবিন্দুর তুলনায় এত বেশী (প্রায় 10^{27} গুণ) যে বারি বিন্দুর টানে পৃথিবীর ত্বরণ কল্পনাতীত কম (প্রায় 10^{-24} সেমি/সে^{2})।

টেবিলের উপর একখানা বই রাখা আছে। পৃথিবীর আকর্ষণে উহা মাটিতে পড়িতেছে না কেন? নিশ্চয়ই সমান ও বিপরীত কোন বল উহার উপর ক্রিয়া করিতেছে। বইয়ের ওজন টেবিলের উপর ক্রিয়া করে। বইয়ের উপর টেবিলের প্রতিক্রিয়া ইহার সমান ও বিপরীত। টেবিলের প্রতিক্রিয়া বইয়ের উপর প্রযুক্ত হইয়া পৃথিবীর টানকে প্রতিমিত (balance) করে। ইহাতে বই স্থিতিতে (বা সাম্যে) থাকে। মাটির প্রতিক্রিয়া টেবিলের ভারকে প্রতিমিত করে।

দুই দল দড়ি টানাটানি করিতেছ; কিন্তু কেহ কাহাকেও সরাইতে পারিতেছ না। 'ক' দল দড়ির মাধ্যমে 'খ' দলের উপর একটা বল প্রয়োগ করিতেছে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ 'খ' দলও 'ক' দলের উপর সমান ও বিপরীত বল একই দড়ির মাধ্যমে প্রয়োগ করিতেছে। দড়ি দ্বিমুখী বল বহন করে এবং উহা দুই প্রান্তের দুই বস্তুর উপর ক্রিয়া করে। দড়ির টান (Tension) বলিতে এই দুই বলের যে কোনটিকে বুঝায়। ইহারা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া।

ক্রিয়া থাকিলেই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকিবে। ইহা সব ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে প্রমাণ করা শক্ত। কিন্তু ইহার সত্যতায় আমরা সন্দেহ করি না।

প্রশ্ন। নিউটনের তৃতীয় সূত্র ব্যাখ্যা কর। প্রথম দুটি সূত্র হইতে ইহা কি কি মূল বিষয়ে পৃথক?

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত হইলে উহাদের ক্রিয়ায় সাম্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না কেন? খুঁটিতে দড়ি বাঁধিয়া তুমি দড়ি ধরিয়া টানিতেছ। ইহাতে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কি ভাবে কাজ করিতেছে দেখাও। দড়ির টান বলিতে কি বুঝায়?

(সংকেত—সাম্যের জন্য একই বস্তুর উপর সমান ও বিপরীত বল প্রযুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন বস্তুর উপর ক্রিয়া করে।)

II-2.4. বলের সংজ্ঞা ও ক্রিয়া। যাহা বস্তুর স্থিতি বা গতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারে তাহাকেই আমরা 'বল' বলিয়াছি। কেহ কেহ বলেন 'যাহা বস্তুর স্থিতি বা গতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারে বা করিতে প্রয়াস পায়, তাহাই বল।' 'প্রয়াস' কথাটি যোগ করার সার্থকতা দেখাইয়া একটি উদাহরণ দেওয়া হয়। ঘরের একটা দেওয়ালকে খুব জোরে ঠেলিলেও দেওয়ালের স্থিতির অবস্থা বদলায় না; অথচ অবশ্যই এখানে বল প্রয়োগ করা হইয়াছে। দেওয়াল মাটিতে শক্ত করিয়া গাঁথা না থাকিলে তাহার স্থিতির অবস্থা অবশ্যই বদলাইত। এখানে প্রযুক্ত বলকে অন্য বল প্রতিমিত করিয়াছে। প্রতিমান অন্য ঘটনা; ইহাকে বলের সংজ্ঞায় যুক্ত করার কোন দরকার নাই।

বলের মান ও দিক্ উভয়ই আছে। একটি মাত্র বল (বা একাধিক হইলে উহার 'অপ্রতিমিত' অংশ) কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করিলে বল বস্তুকে বলের অভিমুখে ত্বরণ দেয়। বল ক্রিয়া করিয়া চলিলে বস্তুর বেগ ক্রমশ বাড়ে। বল বন্ধ হইলে বস্তু বলের ক্রিয়াকালে যে বেগ পাইয়াছিল সেই বেগে চলিতে থাকে। বিপরীত বলের ক্রিয়া উহাকে থামায়।

বলের একক। মেট্রিক বা বৃটিশ পদ্ধতিতে বলের মান বস্তুর ভর ও উহাতে সঞ্জাত ত্বরণের গুণফলের সমান। সিজিএস্ পদ্ধতিতে বলের এককের নাম 'ডাইন' (Dyne)। একগ্রাম ভরকে প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক সেমি ত্বরণ দিতে যে বলের দরকার তাহাই এক ডাইন। এ বলের পরিমাণ অত্যন্ত কম—প্রায় একটি মশার ওজনের সমান। এম্‌কেএস্ পদ্ধতিতে বলের এককের নাম 'নিউটন' (Newton); ইহা এক কেজি ভরকে প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক মিটার করিয়া ত্বরণ দিতে পারে। 1 নিউটন $=1$ কেজি $\times 1$ মি/সে$^2=1000$ গ্রাম $\times 100$ সেমি/সে$^2=10^5$ ডাইন। 1 কেজি ভরের ওজন 9·8 নিউটন (1 কেজি $\times$ 9·8 মি/সে^{2})। এফ্ পি এস্ পদ্ধতিতে বলের একক পাউণ্ডাল (Poundal) এক পাউণ্ড ভরকে প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে একফুট করিয়া ত্বরণ দেয়। 1 পাউণ্ডাল $=1$ পাউণ্ড $\times 1$ ফু/সে$^2=453{\cdot}6$ গ্রাম $\times 30{\cdot}48$ সেমি/সে$^2=1{\cdot}382\times10^4$ ডাইন $=0{\cdot}1382$ নিউটন। এক পাউণ্ড ভরের ওজন 1 পাউণ্ড $\times$ 32ফু/সে$^2=32$ পাউণ্ডাল।

দুই সমান ও বিপরীত বল এক সঙ্গে একই সরলরেখায় একই বস্তুর উপর ক্রিয়া করিলে উহারা একে অন্যের ক্রিয়া বিনষ্ট করে। ফলে বস্তুটির স্থিতি বা গতির অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলি এক বল অন্য বলকে 'প্রতিমিত' (balance) করিয়াছে। এবং বস্তুটি 'সাম্যে' (in equilibrium) আছে। 'অপ্রতিমিত' বল বস্তুকে ত্বরণ দেয়, 'প্রতিমিত' বল বস্তুকে সাম্যে রাখে।

কিন্তু দুই প্রতিমিত বল বস্তুকে বিকৃত করিতে পারে। একটি রবারের বলকে দুই হাতে চাপিয়া ধর। উহা সাম্যে থাকিবে, কিন্তু আকারে বিকৃত হইবে। পেঁচান স্প্রিং-এর দুমাথা ধরিয়া দুহাতে টান দাও। স্প্রিং ত্বরিত গতিতে চলিবে না, লম্বা হইবে মাত্র।

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বস্তুর উপর একাধিক বল এক সঙ্গে ক্রিয়া করে। পৃথিবীর আকর্ষণ সকল বস্তুর উপর সব সময়ই আছে। টেবিলের উপর হইতে একখানা বই তুলিতে এই আকর্ষণের চেয়ে বেশী বল আকর্ষণের বিপরীত দিকে প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রথমে বইয়ের ত্বরণ ঘটিবে। পরে বল ঠিক মত কমাইয়া বই সুষম বেগে উপরে তোলা যায়। এ সময়ে প্রযুক্ত বল ত্বরণ না ঘটাইয়া কেবল ভারের ক্রিয়া প্রতিমিত করে।

মেঝেয় রাখা একখানা ইট আস্তে ঠেলিলে উহা সরিবে না। ইহা মেঝের সঙ্গে ইটের ঘর্ষণের জন্য হয়। ঘর্ষণ গতিতে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু ঠেলার জোর ক্রমশ বাড়াইলে উহা এক সময়ে ঘর্ষণের বাধা অতিক্রম করিয়া সরিবে। চলিতে শুরু করার গোড়ায় ইটের ত্বরণ ঘটে। পরে এমন হইতে পারে যে ঠেলা থাকা সত্ত্বেও ইট সমবেগে চলে। এ সময় প্রযুক্ত বল সম্পূর্ণভাবে ঘর্ষণের বাধা অতিক্রম করিতে ব্যয়িত হয়; ইটের ত্বরণ ঘটায় না।

প্রশ্ন। বলের সংজ্ঞা দাও। এম্‌কেএস্ ও সিজিএস্ পদ্ধতিতে বলের একক দুইটির নাম ও উহাদের সম্পর্ক বল।

প্রতিমিত ও অপ্রতিমিত বলের ক্রিয়ায় প্রভেদ কি প্রকার তাহা একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

II-3. কার্য (Work), ক্ষমতা (Power) ও শক্তি (Energy)। পদার্থ-বিদ্যায় কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি কথা কয়টি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কার্য (Work)। (কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া কোন বল বস্তুকে বলের ক্রিয়ার অভিমুখে সরাইলে বল বস্তুর উপর 'কার্য' করিয়াছে বলা হয়।) আলোচনার সুবিধা ও সরলতার জন্য 'বল' বলিতে আমরা নির্দিষ্ট দিকে ক্রিয়াশীল স্থিরমান বল বুঝিব। বলের ক্রিয়ায় বস্তুর স্থান পরিবর্তন সুষম বেগে বা সুষম ত্বরণে হইতে পারে।

সকল ক্ষেত্রেই কার্য অন্য কোন বলের 'বিরুদ্ধে' হইয়া থাকে। ঘর্ষণের বিরুদ্ধে বল কোন বস্তুকে সরাইলে বল 'ঘর্ষণের বিরুদ্ধে' 'বস্তুর উপর' কার্য করিয়াছে বলিতে হইবে। মেঝে হইতে কিছু তুলিলে পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে বস্তুটির উপর 'কার্য' করা হইয়াছে। [পৃথিবীর আকর্ষণকে 'অভিকর্ষ' (Gravity)-ও বলে। পরে একথাটি আমরা ব্যবহার করিব। অতএব অর্থ মনে রাখিও।] অভিকর্ষের ক্রিয়ায় কোন বস্তু মাটিতে পড়িলে অভিকর্ষ বস্তুটির উপর কার্য করে। এ ক্ষেত্রে কার্য বস্তুর

জাড্যের বিরুদ্ধে হয় জাড্য গতিতে বাধা দেয়। এরূপ পতনে 'বস্তুটি কার্য করিয়াছে' একথাও আমরা বলি।

কার্যের একক। কার্যের মান বলের মান ও বলের ক্রিয়ায় সরণের গুণফল। এককের সিজিএস্ পদ্ধতিতে কার্যের একক হইবে 1 ডাইন × 1 সেমি = 1 আর্গ (Erg)। এক ডাইন বল কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া উহাকে এক সেণ্টিমিটার সরাইলে বল এক আর্গ কার্য করিয়াছে বলা হয়। 2 ডাইন বল বস্তুকে 0·5 সেমি সরাইলেও এক আর্গ কার্য হয়। এম্‌কেএস্ পদ্ধতিতে কার্যের একক 1 নিউটন × 1 মিটার = 1 জুল (Joule)। এক জুল 10^7 আর্গের সমান, কারণ 1 নিউটন = 10^5 ডাইন ও 1 মি = 100 সেমি। এফ্‌পিএস্ পদ্ধতিতে কার্যের একক ফুট-পাউণ্ডাল (Foot-poundal) = 1 পাউণ্ডাল × 1 ফুট = 453·6 গ্রাম × 30·48 সেমি/সে^{2} × 30·48 সেমি = 4·214 × 10^5 আর্গ = 4·214 × 10^{-2} জুল।

ইহা ভিন্ন মেট্রিক ও বৃটিশ উভয় পদ্ধতিতে কার্যের আর একটি একক ব্যবহৃত হয়। তাহাকে 'অভিকর্ষীয় একক' (Gravitational unit) বলে। এক পাউণ্ড ভর অভিকর্ষের বিরুদ্ধে এক ফুট তুলিলে এক ফুট-পাউণ্ড (Foot-pound) কার্য হয়। এক পাউণ্ডের ভার 32 পাউণ্ডাল ধরিলে এই কার্য 32 ফুট-পাউণ্ডাল। একই ভাবে এক কিলোগ্রাম ভরকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে এক মিটার তুলিলে ইহাকে এক কিলো-গ্রাম-মিটার কার্য বলা যায়। এক গ্রাম-সেণ্টিমিটার কার্যেরও অনুরূপ অর্থ। কোন পদ্ধতির অভিকর্ষীয় একককে ঐ পদ্ধতির পূর্ববর্ণিত এককে পরিণত করিতে হইলে, ঐ পদ্ধতির অভিকর্ষীয় ত্বরণ g দিয়া গুণ করিতে হয়। ইহার অর্থ ভরকে ভারে পরিণত করিয়া লওয়া। বৃটিশ পদ্ধতিতে অভিকর্ষীয় এককের প্রচলন বেশী।

ক্ষমতা (Power)। কার্যের বিচারে শুধু বল ও সরণই আসে, বল কতক্ষণ ধরিয়া প্রযুক্ত আছে সে সময় গণনায় আসে না। 'ক্ষমতা' বলিতে সময়ের সহিত বলের কার্য করার হার বুঝায়।

কোন কার্য হইতে যে সময় লাগিয়াছে বা লাগিবে, কার্যকে সেই সময় দিয়া ভাগ করিলে কার্যের হার অর্থাৎ ক্ষমতার মান পাওয়া যায়। কার্য করিতে পারে এমন যন্ত্রের গুণ বিচারে উহা কতটা কার্য করিতে পারে তাহা বিবেচনার বিষয় নয়। উহা কি হারে কার্য করিতে পারে তাহাই বিবেচ্য। ধর শহরে জল সরবরাহের জন্য এক জায়গায় নদী হইতে 50 ফুট উপরে একটি ট্যাংকে 1000 গ্যালন জল ভরিতে হইবে। ছোট পাম্প বসাইয়া ইহা আস্তে আস্তে করা যায়; আবার জোরাল পাম্প বসাইয়া ইহা দ্রুতও করা যায়। ব্যবহারের সময় ট্যাংকের জল যদি সেকেণ্ডে 10 গ্যালন হারে খরচ হয়, তাহা হইলে ট্যাংক ভরা রাখিতে হইলে তোমাকে

এমন পাম্প বসাইতে হইবে যাহা সেকেণ্ডে 10 গ্যালন করিয়া জল 50 ফুট উপরে তুলিতে পারে। ইহার কার্যের হার বা ক্ষমতা হওয়া উচিত অন্তত সেকেণ্ডে 100 পাউণ্ড × 50 ফুট = 5000 ফুট-পাউণ্ড/সে।

ক্ষমতার একক প্রতি সেকেণ্ডে এক একক কার্য। কার্যের এককগুলির কথা আগে বলা হইয়াছে। উহাদের সময়ের একক সেকেণ্ড দিয়া ভাগ করিলে ক্ষমতার একক পাওয়া যাইবে। সিজিএস্ পদ্ধতিতে ক্ষমতার একক সেকেণ্ডে এক আর্গ বা 1 আর্গ/সে। এম্‌কেএস্ পদ্ধতিতে একক 1 জুল/সে ; ইহাকে 1 ওয়াট (watt) বলে। এফ্‌পিএস্ পদ্ধতিতে ক্ষমতার একক প্রতি সেকেণ্ডে 1 ফুট-পাউণ্ডাল। ইহার প্রচলন কম ; অভিকর্ষীয় একটি এককের প্রচলন খুব বেশী। সেকেণ্ডে 550 ফুট-পাউণ্ড কার্যের হারকে এক হর্স পাওয়ার (Horse power) বলে। ট্যাংকে জল ভরার উপরের ঐ উদাহরণটিতে তোমার পাম্পের ক্ষমতা প্রায় দশ হর্স পাওয়ার হওয়া দরকার। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ইহার প্রচলন খুব বেশী। মেট্রিক পদ্ধতিতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অনুরূপ একক এক কিলোওয়াট = 1000 ওয়াট। 1 হর্স পাওয়ার = 746 ওয়াট = 0·746 কিলোওয়াট। 1 কিলোওয়াট = 1·34 হর্স পাওয়ার।

আমরা কায়িক পরিশ্রম যখন করি তখন বিজ্ঞানের অর্থে কার্যই করি। আস্তে আস্তে কার্য করিলে, অর্থাৎ কম ক্ষমতা খাটাইলে ক্লান্তি কম হয়। একই কার্য অল্প সময়ে করিলে কার্য করার হার বাড়ে, অর্থাৎ বেশী ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। ইহাতে ক্লান্তি বোধ বাড়ে। ক্লান্তি মোট কার্যের সঙ্গে জড়িত নয় ; উহা কার্য করার হার বা ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত। 100 মিটার রেস্ ধর। 100 মিটার যাইবার কার্যটুকু সকলেই করিতে পার। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিতে হইলে কি অবস্থা হয় !

প্রশ্ন। কার্য ও ক্ষমতা কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বুঝাও। ইহাদের কোন্‌টির সঙ্গে আমাদের ক্লান্তি বোধ সম্পর্কিত ?

এককের সিজিএস্, এম্‌কেএস্ ও এফ্‌পিএস্ পদ্ধতিতে কার্য ও ক্ষমতার এককের নামগুলি বল। হর্স পাওয়ার কাহাকে বলে ?

শক্তি (Energy)। I-4.1, I-4.5 ও I-4.6 উপবিভাগে শক্তি সম্বন্ধে আমরা নানা কথা বলিয়াছি। যাহা পরিবর্তন ঘটাইতে পারে তাহাকেই শক্তি বলা হইয়াছে। এই সংজ্ঞায় শক্তির মান পাইবার কোন উপায় পাওয়া যায় না। অথচ মাপন পদার্থ-বিদ্যার ভিত্তি। যেখানে কার্য হয় সেখানে কার্য দিয়া পরিবর্তন মাপা যায়। অতএব এরকম ক্ষেত্রে বলা যায় 'কার্য করার সামর্থ্য হইল শক্তি'। যতটা কার্য হইল তাহাকেই শক্তির মান ধরা যায়।

যে বস্তু কার্য করিতে পারে তাহার শক্তি আছে। এক হিসাবে শক্তির এই সংজ্ঞা হইল যান্ত্রিক শক্তির (Mechanical energy-র) সংজ্ঞা, অর্থাৎ যে শক্তির ক্রিয়ায় বল প্রযুক্ত হইয়া বলের অভিমুখে সরণ ঘটায়। কোন বস্তুর যান্ত্রিক শক্তিই একমাত্র শক্তি নয়। সাধারণত তাহার অন্য প্রকার শক্তিও থাকে যদিও শক্তির এই অংশকে কার্যে পরিণত করার কোন উপায় আমাদের জানা না থাকিতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে কোন বস্তু কতটা কার্য করিতে পারিবে তাহা দিয়াই বস্তুটির যান্ত্রিক শক্তির মান নির্দেশ করা হয়। শক্তি কার্যের এককেই মাপা হয়।

II-3.1. গতিশক্তি (Kinetic energy)। যান্ত্রিক শক্তি দুই প্রকার—গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি। সচল বস্তু গতিতে থাকার জন্য উহার কার্য করিবার যে সামর্থ্য আসে তাহাকে উহার **গতিশক্তি (Kinetic energy)** বলে। একটি বল গড়াইয়া তাহার ধাক্কায় অন্য একটি বল সরাইতে পার। হাতুড়ি দিয়া পেরেকে ঘা মারিলে পেরেক কাঠের বাধা অতিক্রম করিয়া ভিতরে ঢুকিতে পারে। হাতুড়ি তাহার গতির জন্য কাঠে পেরেক ঢুকাইয়া কার্য করিতে পারিয়াছে। হাতুড়ি দিয়া বেশী জোরে ঘা মারিলে পেরেক বেশী ভিতরে ঢুকিবে, অর্থাৎ বেশী কার্য হইবে। দেখা যায় গতি শক্তি বেগের উপর নির্ভর করে। বেগ সমান হইলে ভারী হাতুড়িতে কার্য হইবে বেশী। গতিশক্তি ভরের উপরও নির্ভর করে।

স্টেশনে মালগাড়ি হইতে একখানা গাড়ি কাটিয়া নিয়া ইঞ্জিন তাহাকে অন্য লাইনে ঠেলিয়া ছাড়িয়া দিল। গাড়ি গড়াইয়া গড়াইয়া লাইনের ঘর্ষণের বাধায় খানিক দূর গিয়া থামিল। গাড়িকে গতির বিপরীতে ঠেলা দিয়া আরও অল্প দূরত্বের মধ্যে থামান যায়। কোন সচল বস্তুকে উহার গতির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করিয়া থামাইলে, বস্তুটি থামিবার আগ পর্যন্ত প্রযুক্ত বিপরীত বলের বিরুদ্ধে যে কার্য করিতে পারে তাহা দিয়াই বস্তুটির গতিশক্তি মাপা হয়। ইহা প্রযুক্ত বলের মানের উপর নির্ভর করে না। বস্তুর ভর m ও বেগ v হইলে, এইভাবে হিসাব করিয়া দেখা যায় উহার গতিশক্তির মান $K=\frac{1}{2}mv^2$, অর্থাৎ

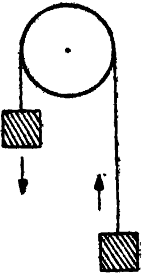
$$\text{গতিশক্তি} = \frac{1}{2} \times \text{বস্তুর ভর} \times \text{বস্তুর বেগের বর্গ।}$$

বল বস্তুর উপর ক্রিয়া করিলে বস্তু গতিশক্তি পায়। F বল m ভরের স্থির বস্তুর উপর প্রয়োগ করিলে উহার ত্বরণ হইবে $f=F/m$। বলের ক্রিয়াকাল t হইলে, এই t সময় বস্তুটির বেগ হইবে $v=ft$। বল এই সময়ে বস্তুটিকে $s=\frac{1}{2}ft^2$ দূরত্ব সরায়। ইহাতে বলের ক্রিয়াবিন্দু বলের অভিমুখে s দূরত্ব সরে বলিয়া বল কার্য করিল $F.\ s=F.\frac{1}{2}\ ft^2=\frac{1}{2}mf.\ ft^2=\frac{1}{2}m(ft)^2=\frac{1}{2}mv^2$। বস্তুর উপরে করা এই কার্যই বস্তুর গতিশক্তির মান।

II-3.2. স্থিতিশক্তি (Potential energy)। কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তন করিলে, বা অন্য বস্তু সাপেক্ষে উহার স্থান পরিবর্তন করিলে, যদি উহা কার্য করার সামর্থ্য পায় তাহা হইলে উহার 'স্থিতিশক্তি' আছে বলা হয়। স্থিতিশক্তি আছে তখনই বলা হয় যখন বস্তুটি স্থিতিতে আছে অথচ পরিপার্শ্ব সাপেক্ষে অথবা উহার নিজের দেহে এমন কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে যাহাতে বস্তুটি অন্য বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় বা নির্দিষ্ট অবস্থানে ফিরিয়া যাইতে বস্তুটি যে কার্য করিতে পারে তাহাই উহার স্থিতিশক্তির মান।

স্প্রিং-এর ক্রিয়া বস্তুর বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তনের উদাহরণ। ঘড়ির স্প্রিং সম্বন্ধে একথা আগে বলা হইয়াছে। দম দেওয়া অবস্থা হইতে দম ফুরান অবস্থা পর্যন্ত যাইতে স্প্রিং যে কার্য করিতে পারে তাহাই উহার স্থিতিশক্তির মান।

ভূপৃষ্ঠ সাপেক্ষে কোন বস্তুকে উপরে তুলিলে উহা কার্য করার সামর্থ্য পায়। নিচে পড়িতে উহা অন্য বস্তুকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে টানিয়া তুলিতে পারে (II-4 চিত্র)।


II-4 চিত্র

কুয়া হইতে জল তুলিতে কোথাও কোথাও স্থিতিশক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। বাঁশের এক প্রান্তে একটি ভার বাঁধা থাকে ; অন্য প্রান্তে দড়ি আর বালতি। হাড়িকাঠের মত অন্য দুটি বাঁশের মাথায় এই বাঁশের মাঝখান লাগান থাকে। দড়ি টানিয়া বালতি কুয়ায় নামাইতে ভার উপরে ওঠে ও স্থিতিশক্তি পায়। বালতিতে জল ভরিয়া তুলিবার সময় এই স্থিতিশক্তি বালতি তুলিতে সাহায্য করে। বড় বড় ইমারতের ভিত্তি শক্ত করার জন্য মাটিতে কাঠের মোটা খুঁটি শক্ত করিয়া পোঁতা হয়। ইহার জন্য খুব ভারী একটা লোহার পিণ্ড বার বার উপরে তুলিয়া খুঁটির মাথায় ফেলা হয়। লোহার পিণ্ডের স্থিতিশক্তি খুঁটিকে মাটির ভিতরে ঢুকায়।

m ভরের বস্তু মাটি হইতে h উচ্চতায় থাকিলে উহার ভার mg-কে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে h উচ্চতা তোলায় উহার উপর কার্য হইয়াছে mgh। এই কার্য বস্তুটিতে স্থিতিশক্তি রূপে থাকে। সুবিধামত ব্যবস্থার সাহায্যে উহাকে দিয়া ঠিক এই পরিমাণ কার্য করাইয়া নেওয়া যায়। অভিকর্ষের জন্য যে স্থিতিশক্তি হয় তাহাকে অভিকর্ষীয় স্থিতিশক্তি' (Gravitational potential energy) বলে।

নদীতে বাঁধ দিয়া প্রচুর জল আটকাইয়া রাখা যায়। মাইথন, তিলাইয়া, ভাকরা-নাঙ্গাল প্রভৃতি বাঁধের কথা তোমরা অনেকে শুনিয়াছ। বাঁধের প্রায় উপর পর্যন্ত

জল জমা থাকায় উহাতে প্রচুর অভিকর্ষীয় স্থিতিশক্তি থাকে। নিচের দিক হইতে নল দিয়া এই জলের সাহায্যে টারবাইন (turbine) ঘুরাইয়া জলের স্থিতিশক্তিকে বৈদ্যুত শক্তিতে পরিণত করিয়া আলো জ্বালাইবার বা মোটর ঘুরাইয়া কলকারখানায় পণ্য উৎপাদনের শক্তি পাওয়া যায়।

বেশী চাপে রাখা বায়ুও প্রসারিত হইয়া স্বাভাবিক চাপে আসিতে অন্য বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিয়া কার্য করিতে পারে। এয়ার গান (Air gun) অনেকেই দেখিয়াছ। উহাতে গুলি ছোটে বায়ুর চাপে। বায়ুর চাপে অনেক যন্ত্রও চালান হয়। বেশী চাপের বায়ুতে বায়ুকণাগুলি স্বাভাবিক অবস্থাব তুলনায় অনেক কাছে আসায় বায়ু স্থিতিশক্তি পাইয়াছে।

এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পার। স্থিতিশক্তির সকল ক্ষেত্রেই দেখিবে বস্তুটি নিজ হইতে সেই অবস্থায় যাইতে চায় যে অবস্থায় তাহার স্থিতিশক্তি সব চেয়ে কম। ইহা প্রকৃতির (Nature) একটি সত্য। ইহাকে 'অবম স্থিতিশক্তির তত্ত্ব' (Principle of minimum potential energy) বলে। প্রকৃতি সকল বস্তুর স্থিতিশক্তি কমাইতে চায়। এই প্রয়াসেই বল প্রযুক্ত হইয়া কার্য হয়।

প্রশ্ন। স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। একটি হইতে অন্যটিতে রূপান্তরের উদাহরণ দাও। স্থিতিশক্তি আমরা কি ভাবে কাজে লাগাইতে পারি তাহার একটি উদাহরণ দাও।

II-4. কয়েকটি সরল যন্ত্র। সেলাইয়ের কল, ইনজিন বা কারখানার যত জটিল যন্ত্রের কথাই ভাব না কেন, ইহাদের ঘোরার অংশের কথা বাদ দিলে বাকী অংশকে মোট ছয় প্রকার সরল যন্ত্রাংশে ভাগ করা যায়। ইহাদের মধ্যে তিনটি সম্বন্ধে তোমাদের এখানে কিছু বলিব। ইহাদের নাম (১) লিভার (Lever), (২) চক্র-ও-অক্ষদণ্ড (Wheel-and-axle) এবং (৩) নত-তল (Inclined plane). যন্ত্রাংশ মনে না করিয়া ইহাদের আমরা সরল যন্ত্র হিসাবেই দেখিব, এবং ইহাদের ক্রিয়া কি রকম বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যন্ত্রের ব্যবহারে যে যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহা প্রধানত :

(১) একস্থানে বল প্রয়োগ করিয়া অন্যস্থানে, এমন কি অন্য দিকে, বলের ক্রিয়া পাওয়া ;

(২) কম বল প্রয়োগে বেশী বলের ক্রিয়া পাওয়া ;

(৩) কম সরণে বেশী সরণ বা তাহার বিপরীত ক্রিয়া পাওয়া।

যন্ত্রগুলির ক্রিয়াবর্ণনায় কয়েকটি নূতন কথা ব্যবহার করা দরকার হইবে। যন্ত্রবিজ্ঞানের ভাষায় যন্ত্রে প্রযুক্ত বল F_1-কে বলে 'আয়াস' বা 'এফর্ট' (Effort). F_1 বলের ক্রিয়ার যন্ত্র যে F_2 বল অন্যত্র প্রয়োগ করিতে পারে তাহাকে বল 'বোঝা'

বা 'লোড' (Load)। লোডকে এফর্ট দিয়া ভাগ করিলে যে রাশি পাওয়া যায় তাহাকে বলে 'যান্ত্রিক সুবিধা'।

যান্ত্রিক সুবিধা (Mechanical advantage)=লোড (Load)÷এফর্ট (Effort)।

সরল যন্ত্রগুলির ক্রিয়া বিবেচনায় সব সময়ই ধরা হয় লোড ও এফর্ট সুষম হারে কার্য করিতেছে, অর্থাৎ উহাদের প্রয়োগ বিন্দু সুষম বেগে চলিতেছে। এফর্টের সরণ s_1 হইলে লোডের সরণ যদি s_2 হয়, তবে s_1/s_2 রাশিটিকে 'বেগানুপাত' (Velocity ratio) বলে।

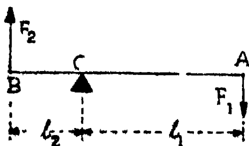
বেগানুপাত (Velocity ratio)=এফর্টের সরণ (s_1)÷লোডের সরণ (s_2)।

যন্ত্রে ঘর্ষণের ক্রিয়া উপেক্ষা করিলে এবং অন্য কোন ভাবে শক্তি অপচয় হইতে না দিলে, যন্ত্রে যে পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করা হইবে শক্তির নিত্যতার জন্য যন্ত্র তাহাই ফিরাইয়া দিবে। ইহার অর্থ শক্তি অপচয় বিহীন আদর্শ অবস্থায় যন্ত্রের উপরে যে পরিমাণ কার্য করা হইবে যন্ত্রও সেই পরিমাণ কার্য করিতে পারিবে। যন্ত্রের উপরে করা কার্যকে 'নিবেশ' বা 'ইনপুট' (Input) এবং যন্ত্র হইতে পাওয়া কার্যকে 'নির্গম' বা 'আউটপুট' (Output) বলে। আদর্শ ক্ষেত্রে উহারা সমান, $F_1s_1=F_2s_2$। অতএব $F_2/F_1=s_1/s_2$, বা যান্ত্রিক সুবিধা=বেগানুপাত। এরূপ যন্ত্রকে 'আদর্শ যন্ত্র' (Ideal mechine) বলে। আমরা ইহারই আলোচনা করিব। তবে জানিয়া রাখিতে পার যন্ত্রের ভিতরে ঘর্ষণে কিছু শক্তি ব্যয় হইবে, এবং আউটপুট ইনপুটের চেয়ে কম হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে

আউটপুট/ইনপুট রাশিটিকে যন্ত্রের 'দক্ষতা' (Efficiency) বলে।

বাস্তব যন্ত্রে দক্ষতা 1-এর চেয়ে কম হয়। দক্ষতা সাধারণত শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। ভাল বৈদ্যুত মোটরের দক্ষতা 95% বা বেশীও হইতে পারে।

II-4.1. লিভার (Lever)। নিজের দেহের কোন বিন্দু সাপেক্ষে খানিকটা ঘুরিতে পারে এমন একটি শক্ত, সরল বা বাঁকা দণ্ডকে লিভার মনে করা যায় (II-5 চিত্র)। বাঁকা লিভারের কথা আমরা আলোচনা করিব না। যে বিন্দু সাপেক্ষে লিভার ঘুরিতে পারে তাহাকে উহার 'আলম্ব' (Fulcrum) বলে (II-5 চিত্রের C বিন্দু)। চিত্রের লিভারের একপ্রান্তে F_1 বল প্রয়োগ করিলে উহার অন্য প্রান্ত উপরের দিকে উঠিবে এবং ঐ দিকে F_2 বল প্রয়োগ করিতে পারিবে। F_1

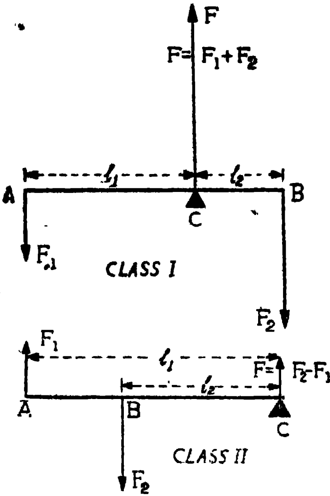


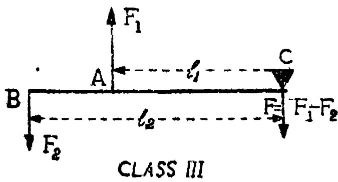
II-5 চিত্র

এফর্ট ও F_2 লোড। আলম্ব হইতে এফর্টের দূরত্ব l_1 ও লোডের দূরত্ব l_2 হইলে আদর্শ লিভারে $F_1l_1 = F_2l_2$ হয়।

এফর্ট ও লোডের ক্রিয়াবিন্দু (A ও B) সাপেক্ষে C-র অবস্থান কোথায় তাহা দেখিয়া লিভারগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

প্রথম শ্রেণীর লিভার। ইহাতে আলম্ব C এফর্টের ক্রিয়াবিন্দু A ও লোডের ক্রিয়াবিন্দু B-র মাঝখানে কোথাও থাকে (II-6 চিত্র)। যান্ত্রিক সুবিধা $F_2/F_1 = l_1/l_2$; ইহা 1 বা l-এর চেয়ে কম বা বেশী হইতে পারে। ভারী জিনিস উঁচা করিবার ডাণ্ডা, টিউব-ওয়েলের পাম্পের হাতল, তুলার দণ্ড, শিশুদের খেলার 'সি-স' (see-saw) কাঁচি প্রভৃতি ইহার উদাহরণ (কাঁচি ডবল লিভার ; II.9 চিত্র)।





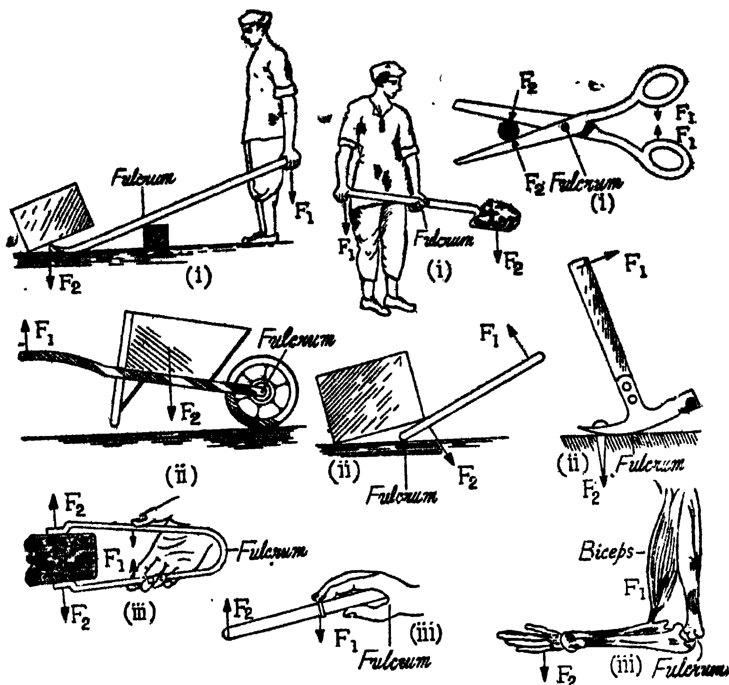
II.6, II.7, II.8 চিত্র

দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার। ইহাতে আলম্ব এক প্রান্তে ও এফর্ট অন্যপ্রান্তে (II.7 চিত্র)। লোড থাকে উহাদের মাঝখানে কোথাও। যান্ত্রিক সুবিধা 1 অপেক্ষা বেশী হয়। দাঁড়, মালটানা বা ময়লা ফেলার এক চাকার গাড়ি, সুপারি কাটা জাঁতি, পানীয়ের বোতল খুলিবার চাবি, ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। দাঁড়ের আলম্ব জলের মধ্যে দাঁড়ের মাথা।

তৃতীয় শ্রেণীর লিভার। ইহাতে আলম্ব এক প্রান্তে ও লোড অন্য প্রান্তে। এফর্ট ইহাদের মাঝখানে কোথাও (II.8 চিত্র)। যান্ত্রিক সুবিধা 1-এর চেয়ে কম, কিন্তু বেগানুপাত বেশী। উদাহরণ মাছ ধরা ছিপ, চিমটা (ডবল লিভার), ছুরি, মানুষের হাত (কনুই হইতে সামনের দিক), ইত্যাদি।

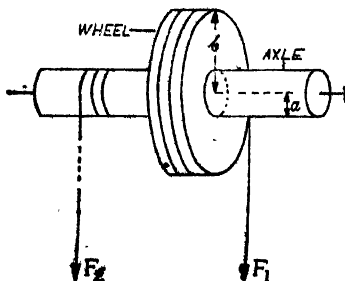
II.9 চিত্রে তিন রকম লিভারের কয়েকটি ছবি পাইবে। প্রথম শ্রেণীর লিভারে আলম্বকে অন্তত $F_1 + F_2$ বল বহন করিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে $F_2 - F_1$ ও তৃতীয় শ্রেণীতে $F_1 - F_2$।

প্রশ্ন। তিন রকম লিভারের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া প্রত্যেকটির ৩টি করিয়া উদাহরণ দাও। লিভার ব্যবহার করিয়া আমরা কি কি রকম সুবিধা পাইতে পারি ?



II-9 চিত্র

II-4.2. চক্র-ও-অক্ষদণ্ড (Wheel-and-axle)। চক্র ও অক্ষদণ্ড একসঙ্গে জোড়া a ও b ব্যাসার্ধের দুটি সমাক্ষ বেলন (II-10 চিত্র); গঠনে কতকটা লাটাইয়ের মত। বড় ব্যাসের বেলনটিকে বলে চক্র (Wheel) ও ছোট ব্যাসের বেলনটিকে বলে 'অক্ষদণ্ড' (Axle)। ঘুরাইলে উভয়ে এক সঙ্গে একই অক্ষে ঘোরে। অক্ষদণ্ডে একগাছা দড়ি পেঁচান। উহার একপ্রান্ত অক্ষদণ্ডে আঁটা; অন্য প্রান্ত লোডের (F_2) সঙ্গে লাগাইতে হয়। চক্রেও অনুরূপ একগাছা দড়ি বিপরীত পাকে জড়ান। তাহার মুক্তপ্রান্তে

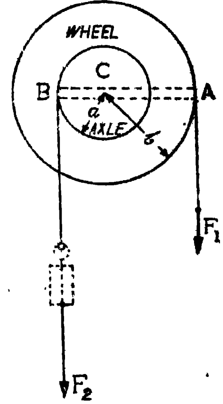


II.10 চিত্র

এফর্ট (F_1) প্রয়োগ করা হয়। এফর্ট প্রয়োগে চক্রের দড়ি খুলিতে থাকে ও অক্ষদণ্ডের দড়ি অক্ষদণ্ডে আরও পেঁচায় এবং লোডকে কাছে টানিয়া আনে। কুয়া হইতে জল তুলিবার এরকম ব্যবস্থা কেহ কেহ হয়ত দেখিয়াছে।

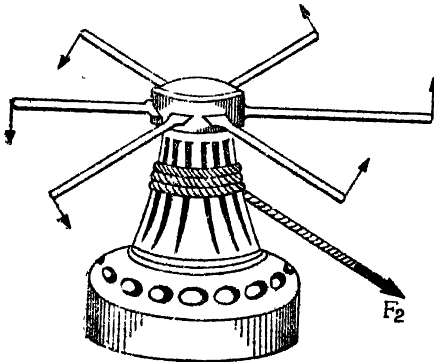
যন্ত্র সুষম বেগে ঘুরিতে থাকিলে $F_1b = F_2a$ হইবে। অতএব আদর্শ যান্ত্রিক সুবিধা $F_2/F_1 = b/a$। b a-র চেয়ে পাঁচগুণ বড় হইলে কোন বল প্রয়োগ করিয়া উহার পাঁচগুণ বলের কাজ পাওয়া যায়।

চক্র-ও-অক্ষদণ্ড কার্যত একটি অবিরত ক্রিয়াশীল (continuously acting) প্রথম শ্রেণীর লিভার। পাশ হইতে অক্ষ বরাবর যন্ত্রটির দিকে তাকাইলে উহাকে II-11 চিত্রের মত দেখাইবে। ছবিতে ভাঙা রেখার যে যন্ত্রাংশটুকু দেখা যাইতেছে, মাত্র সেইটুকু মনে রাখিয়া বাকী অংশ ভুলিয়া যাও। লক্ষ্য করিয়া দেখ এই ACB অংশ একটি প্রথম শ্রেণীর লিভার। উহার A প্রান্তে এফর্ট, B প্রান্তে লোড এবং C উহার আলম্ব। যন্ত্র যখন ঘুরিতে থাকে তখন একের পর এক অংশ আসিয়া এই স্থান অধিকার করে। এই কারণে ইহাকে অবিরত ক্রিয়াশীল প্রথম শ্রেণীর লিভার মনে করা যায়।

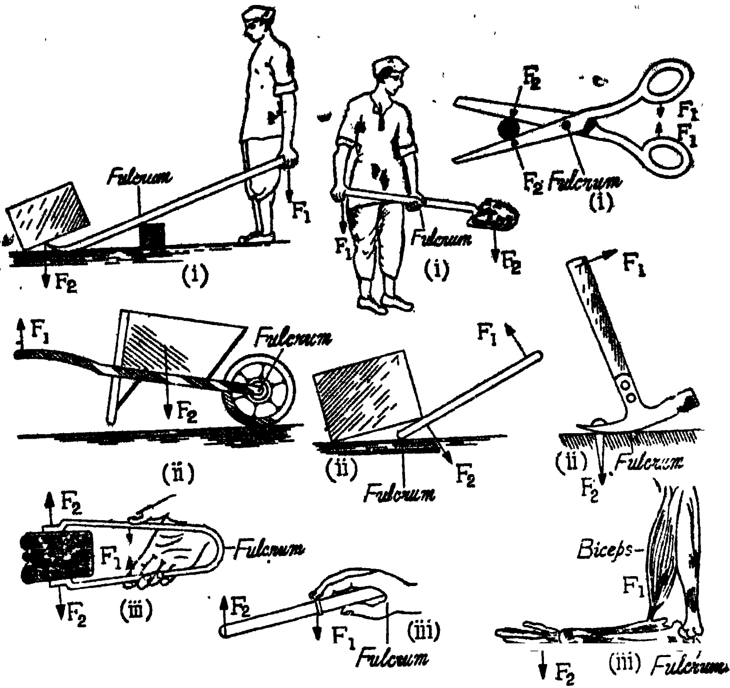


II. 11 চিত্র

মোটর গাড়ি বা স্টীমারে গতিমুখ ঘুরাইবার চাকার (Steering wheel-এর) ক্রিয়া চক্র-ও-অক্ষদণ্ডের ক্রিয়া। দরজায় আটকান তালা খুলিবার হাতলের (Knob-এর) ক্রিয়াও এই রকম। কুয়া হইতে দড়ি ও বালতি দিয়া জল তুলিতে চাকার কথা আগেই বলিয়াছি। স্টীমার ঘাটে বাঁধিতে বা উহার নোঙ্গর উঠাইতে ক্যাপস্টান (Capstan) (II-12 চিত্র) ব্যবহার হয়। ইহাতে চক্রের বদলে অক্ষদণ্ডের সঙ্গে লম্বা কয়েকটি দণ্ড লাগান থাকে। উহারই প্রান্তে এফর্ট প্রয়োগ করা হয়। ইহার সাহায্যে মাটিতেও ভারী জিনিস টানিয়া কাছে আনা যায়। যন্ত্রের অক্ষ হইতে এফর্ট প্রয়োগের স্থানের দূরত্ব, অর্থাৎ b-র মান ইহাতে অনেক বেশী হওয়ায় যান্ত্রিক সুবিধা খুব বাড়ে। তা ছাড়া যতটি দণ্ড আছে b/a অনুপাত ততগুণ বাড়ে ও খুব কম বল প্রয়োগে অনেক বেশী বল কাজে লাগান যায়।

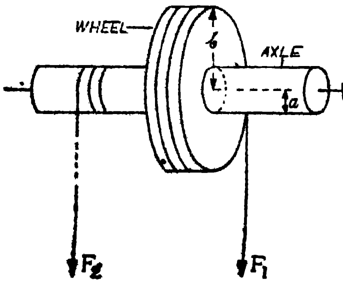


II.12 চিত্র



II-9 চিত্র

II-4.2. চক্র-ও-অক্ষদণ্ড (Wheel-and-axle)। চক্র ও অক্ষদণ্ড একসঙ্গে জোড়া a ও b ব্যাসার্ধের দুটি সমাক্ষ বেলন (II-10 চিত্র); গঠনে কতকটা লাটাইয়ের মত। বড় ব্যাসের বেলনটিকে বলে চক্র (Wheel) ও ছোট ব্যাসের বেলনটিকে বলে 'অক্ষদণ্ড' (Axle)। ঘুরাইলে উভয়ে এক সঙ্গে একই অক্ষে ঘোরে। অক্ষদণ্ডে একগাছা দড়ি পেঁচান। উহার একপ্রান্ত অক্ষদণ্ডে আঁটা; অন্য প্রান্ত লোডের (F_2) সঙ্গে লাগাইতে হয়। চক্রেও অনুরূপ একগাছা দড়ি বিপরীত পাকে জড়ান। তাহার মুক্তপ্রান্তে

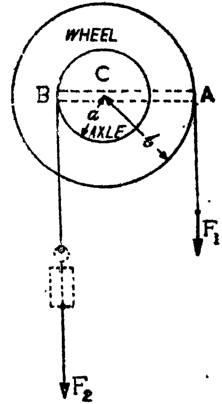


II.10 চিত্র

এফর্ট (F_1) প্রয়োগ করা হয়। এফর্ট প্রয়োগে চক্রের দড়ি খুলিতে থাকে ও অক্ষদণ্ডের দড়ি অক্ষদণ্ডে আরও পেঁচায় এবং লোডকে কাছে টানিয়া আনে। কুয়া হইতে জল তুলিবার এরকম ব্যবস্থা কেহ কেহ হয়ত দেখিয়াছে।

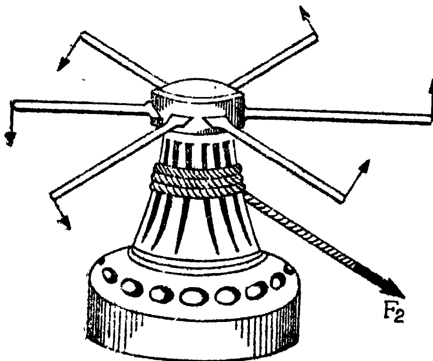
যন্ত্র সুষম বেগে ঘুরিতে থাকিলে $F_1 b = F_2 a$ হইবে। অতএব আদর্শ যান্ত্রিক সুবিধা $F_2/F_1 = b/a$। b a-র চেয়ে পাঁচগুণ বড় হইলে কোন বল প্রয়োগ করিয়া উহার পাঁচগুণ বলের কাজ পাওয়া যায়।

চক্র-ও-অক্ষদণ্ড কার্যত একটি অবিরত ক্রিয়াশীল (continuously acting) প্রথম শ্রেণীর লিভার। পাশ হইতে অক্ষ বরাবর যন্ত্রটির দিকে তাকাইলে উহাকে II-11 চিত্রের মত দেখাইবে। ছবিতে ভাঙা রেখার যে যন্ত্রাংশটুকু দেখা যাইতেছে, মাত্র সেইটুকু মনে রাখিয়া বাকী অংশ ভুলিয়া যাও। লক্ষ্য করিয়া দেখ এই ACB অংশ একটি প্রথম শ্রেণীর লিভার। উহার A প্রান্তে এফর্ট, B প্রান্তে লোড এবং C উহার আলম্ব। যন্ত্র যখন ঘুরিতে থাকে তখন একের পর এক অংশ আসিয়া এই স্থান অধিকার করে। এই কারণে ইহাকে অবিরত ক্রিয়াশীল প্রথম শ্রেণীর লিভার মনে করা যায়।



II. 11 চিত্র

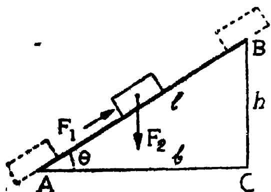
মোটর গাড়ি বা স্টীমারে গতিমুখ ঘুরাইবার চাকার (Steering wheel-এর) ক্রিয়া চক্র-ও-অক্ষদণ্ডের ক্রিয়া। দরজায় আটকান তালা খুলিবার হাতলের (Knob-এর) ক্রিয়াও এই রকম। কুয়া হইতে দড়ি ও বালতি দিয়া জল তুলিতে চাকার কথা আগেই বলিয়াছি। স্টীমার ঘাটে বাঁধিতে বা উহার নোঙ্গর উঠাইতে ক্যাপস্টান (Capstan) (II-12 চিত্র) ব্যবহার হয়। ইহাতে চক্রের বদলে অক্ষদণ্ডের সঙ্গে লম্বা কয়েকটি দণ্ড লাগান থাকে। উহারই প্রান্তে এফর্ট প্রয়োগ করা হয়। ইহার সাহায্যে মাটিতেও ভারী জিনিস টানিয়া কাছে আনা যায়। যন্ত্রের অক্ষ হইতে এফর্ট প্রয়োগের স্থানের দূরত্ব, অর্থাৎ b-র মান ইহাতে অনেক বেশী হওয়ায় যান্ত্রিক সুবিধা খুব বাড়ে। তা ছাড়া যতটি দণ্ড আছে b/a অনুপাত ততগুণ বাড়ে ও খুব কম বল প্রয়োগে অনেক বেশী বল কাজে লাগান যায়।



II.12 চিত্র

II-4.3. নত-তল (Inclined plane)। নত-তল যথাসম্ভব মসৃণ একটি আনত সমতল। উহা কাঠের, লোহার, সিমেন্টের বা যে কোন শক্ত জিনিস তৈয়ারী হইতে পারে। ইহার সাহায্যে ভারী জিনিস তলের নিচ হইতে তল বরাবর উপরে তোলা যায়। অনেকে গুদামের দরজার সামনে সিমেন্টে তৈয়ারী এ রকম স্থায়ী ব্যবস্থা দেখিয়া থাকিবে। মাল গাড়ি, লরি প্রভৃতিতে মাল তুলিতেও কাঠের নত-তলের ব্যবহার হয়।

নত-তলের ক্রিয়া II-13 চিত্রের সাহায্যে বোঝা যাইবে। তলের দৈর্ঘ্য AB=l, নিচ হইতে উপর পর্যন্ত উচ্চতা BC=h ও ভূমির দৈর্ঘ্য AC=b ধরা যাক। তলের সমান্তরালে F_1 এফর্ট প্রয়োগে F_2 লোড যেন A হইতে B-তে নিয়া যাওয়া গেল। F_2 হইল বস্তুটির ওজন। এখানে এফর্ট কার্য করিয়াছে F_1 l ও লোড অভি-কর্ষের বিরুদ্ধে কার্য করিয়াছে F_2h।



II-13 চিত্র

আদর্শ যন্ত্রে $F_1 \ l = F_2 h$, এবং যান্ত্রিক সুবিধা $F_2/F_1 = l/h$ হইবে। l/h-কে তলের নতি (slope বা gradient)-ও বলে। তল বরাবর l পথ গেলে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে h উচ্চতায় ওঠা হয়।

মনে কর একটি ছেলে 20 কেজি ওজনের চেয়ে বেশী বল প্রয়োগ করিতে পারে না। তাহাকে যেন নত-তলের সাহায্যে 100 কেজি ওজনের এক চাপ বরফ 1 মিটার উঁচু লরিতে তুলিতে বলা হইল। এ ক্ষেত্রে তলের নতি অন্তত কত হওয়া দরকার? দেখ ত 5 মিটারে 1 মিটার নয় কি? নতি কম বা বেশী হইলে কি সুবিধা বা অসুবিধা হইত?

প্রশ্ন। (১) চক্র-ও-অক্ষদণ্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। উহাকে কি কারণে অবিরত ক্রিয়াশীল প্রথম শ্রেণীর লিভার মনে করা যায়?

(২) সরল যন্ত্রগুলির সাহায্যে আমরা কি কি সুবিধা পাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি? নত-তলের সাহায্যে কম বল প্রয়োগে ভারী বস্তু কি ভাবে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে তোলা যায় বুঝাইয়া বল।

II-5. তাপের কথা : তাপ ও উষ্ণতা (Heat and Temperature)। স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বস্তুকে ঠাণ্ডা বা গরম বলিয়া বোধ করি। এক পাত্র ঠাণ্ডা জল উনানে বসাইলে উহা ক্রমশ গরম হইয়া শেষে ফুটিতে আরম্ভ করে। যে বাহ্য কারণ শীতল বস্তুকে উষ্ণ করে তাহাকে আমরা 'তাপ' (Heat) বলি। কোন বস্তু আগের চেয়ে উষ্ণ হইলে আমরা মনে করি উহাতে তাপ প্রবেশ করিয়াছে।

যত শীতলই হউক, সকল বস্তুতেই তাপ আছে, একথা আমরা বলি। নদী, কুয়া, পুকুর বা কলের জল ফুটন্ত জলের চেয়ে ঠাণ্ডা। বরফ উহাদের যে কোনটির জলের চেয়ে ঠাণ্ডা। এক গেলাস জলে এক টুকরা বরফ ফেলিলে উহা গলে। ফলে জল কিছু ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু বরফের চেয়ে উষ্ণ থাকে। ইহার ব্যাখ্যায় আমরা বলি জল হইতে কিছু তাপ বরফে প্রবেশ করিয়া প্রথমে উহাকে গলায় ও পরে বরফ গলা সেই জলকে কিছু উষ্ণ করে। ইহাতে গেলাসের জল নিজেও কিছু ঠাণ্ডা হয়, কারণ সে কিছু তাপ ছাড়িয়াছে। উপরের উদাহরণে আমরা দেখিলাম গেলাসের জল ফুটন্ত জলের চেয়ে ঠাণ্ডা, কিন্তু তাহাতে তাপ অবশ্যই ছিল। সেই তাপেই বরফ গলিল এবং বরফ গলা জল একটু উষ্ণ হইল।

বরফেও তাপ আছে। তরল বায়ু (Liquid air) বরফের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা। কিন্তু এক পাত্র তরল বায়ুকে এক চাপ বরফের ভিতর বসাইয়া রাখিলে উনানে বসান জলের মত তরল বায়ু ফুটিতে থাকিবে। বরফ হইতে তাপ তরল বায়ুতে প্রবেশ করিয়া উহাকে ফুটায়। বরফও খানিকটা তাপ ছাড়ায় আরও শীতল হয়।

উষ্ণতা। সব বস্তুতে তাপ থাকিলেও মনে রাখিও আমাদের গরম বা ঠাণ্ডা বোধ ঐ বস্তুর মোট তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। এক পাত্র গরম জলে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢালিলে পাত্রের জলে মোট তাপের পরিমাণ আগের চেয়ে বাড়ে, কিন্তু জল আগের চেয়ে ঠাণ্ডা হয়। গরম কি ঠাণ্ডা—এই বোধটা যদি তাপের মোট পরিমাণের উপর নির্ভর করিত তাহা হইলে ঠাণ্ডা জল মিশাইবার পর মিশান জলকে ঠাণ্ডা মনে হইত না।

গরম-ঠাণ্ডা বোধ যদি মোট তাপের উপর নির্ভর না করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিবে। এই অন্য কিছু—যাহার উপর আমাদের গরম-ঠাণ্ডা বোধ নির্ভর করে তাহাকে আমরা 'উষ্ণতা' (Temperature) বলি। সমান গরম নয় এমন দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থাকিলে আমরা দেখি উহারা খানিক পরে সমান গরম হইয়া যায়। গরমটি একটু ঠাণ্ডা হয় ও ঠাণ্ডাটি একটু গরম হয়। ঠাণ্ডা ও গরম জল মিশাইলে ইহাই আমরা দেখিতে পাই। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উষ্ণতার প্রাথমিক একটা স্থূল সংজ্ঞা আমরা ঠিক করিতে পারি :

'দুইটি বস্তু পরস্পর সংস্পর্শে থাকিলে কোন্‌টি হইতে তাপ অন্যটিতে যাইবে তাহা বস্তুর যে ধর্মের বা অবস্থার উপর নির্ভর করে তাহাকে বস্তুর উষ্ণতা বলে'। উষ্ণতা বস্তুর তাপ সংক্রান্ত এক প্রকার অবস্থা—বেশী উষ্ণতার বস্তু হইতে কম উষ্ণতার বস্তুতে তাপ যায়। উষ্ণতা সমান হইলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে তাপ যায় না। কোন বস্তুকে ছুঁইলে যদি উহা গরম বোধ হয় তাহা হইলে উহা হইতে তাপ আমাদের দেহে

প্রবেশ করিতেছে ; ঠাণ্ডা বোধ হইলে আমাদের দেহ হইতে তাপ উহাতে যাইতেছে—ইহাই আমাদের গরম বা ঠাণ্ডা বোধের ব্যাখ্যা।

তাপ ও উষ্ণতার প্রভেদ। দুয়ের প্রভেদ লক্ষণীয় :

(১) তাপযোগে উষ্ণতা বাড়ে ; তাপ যোগকে কারণ (cause) এবং উষ্ণতা বৃদ্ধিকে ফল (effect) মনে করা যায়

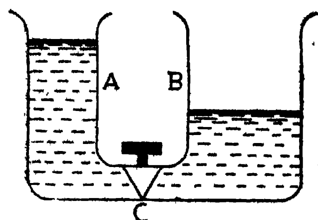
(২) বস্তুর উষ্ণতা ও উহাতে মোট তাপের পরিমাণে কোন সম্পর্ক নাই। এক বালতি জল হইতে এক গেলাস জল আলাদা করিয়া নিলে দেখা যায় উভয়ের উষ্ণতা একই। কিন্তু বালতির জলে মোট তাপের পরিমাণ গেলাসের জলের চেয়ে অবশ্যই অনেক বেশী।

(৩) একই পরিমাণ তাপ যোগে বিভিন্ন বস্তুর উষ্ণতা বিভিন্ন পরিমাণ বাড়িতে পারে। এক বাটি ফুটন্ত জল এক বালতি জলে ঢালিলে উষ্ণতা একটু বাড়ে। কিন্তু ঐ ফুটন্ত জল এক গেলাস জলে ঢালিলে উষ্ণতা বাড়ে আরও বেশী।

(৪) সংস্পর্শে অবস্থিত দুইটি বস্তুর কোন্‌টি হইতে তাপ অন্যটিতে যাইবে তাহা উহাদের উষ্ণতা দিয়া ঠিক হয়। কোনটির মোট তাপের পরিমাণ দিয়া নয়।

(৫) বেশী উষ্ণ বস্তু হইতে তাপ কম উষ্ণ বস্তুতে প্রবাহিত হয়—এ হিসাবে তাপ ও উষ্ণতার সম্পর্ক জলের পরিমাণ ও জলতলের (water level-এর) মত। পাত্রে ঢালিলে জলতল উপরে ওঠে, অর্থাৎ বাড়ে। তেমনই বস্তুতে তাপ যোগ করিলে উহার উষ্ণতা বাড়ে। উষ্ণতা যেন তাপসংক্রান্ত তল (level)।

জলতল অসমান উচ্চতায় এমন দুইটি পাত্র যোগ করিয়া একটি হইতে অন্যটিতে জল যাইতে দিলে (II-14 চিত্র) দেখা যাইবে নিচু জলতলের পাত্রে অনেক বেশী জল থাকিলেও, উঁচু জলতলের পাত্র হইতে জল নিচু জলতলের পাত্রে যাইবে এবং উভয় পাত্রে জলতল সমান হইলে জলপ্রবাহ বন্ধ হইবে। বিভিন্ন উষ্ণতার দুইটি বস্তুকে সংস্পর্শে রাখিলে ঠিক এই রকম ক্রিয়াই হয়। কম উষ্ণতার বস্তুটিতে অনেক বেশী তাপ থাকিলেও, বেশী উষ্ণতার বস্তু হইতে কম উষ্ণতার বস্তুটিতে তাপ প্রবাহিত হইবে। জলের প্রবাহের মত তাপের প্রবাহ আমরা দেখিতে পাই না। তবে কোন বস্তু উষ্ণ হইলে আমরা মনে করি উহাতে তাপ প্রবেশ করিয়াছে।



II-14 চিত্র

প্রশ্ন। তাপ ও উষ্ণতার প্রভেদ বুঝাইয়া বল।

II-5.1. তাপের পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে। কোন বস্তুতে মোট তাপ উহার (১) ভর, (২) উষ্ণতা ও (৩) উহার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। একই উষ্ণতায় একই পদার্থের বেশী ভরের বস্তুতে বেশী তাপ থাকে। আবার একই পদার্থের একই ভরের বস্তুতে যেটির উষ্ণতা বেশী তাহাতে তাপও বেশী। ভর ও উষ্ণতা একই, কিন্তু পদার্থ বিভিন্ন হইলে তাপও বিভিন্ন হয়।

আমরা বার বার কোন বস্তুতে মোট তাপের কথা বলিতেছি। কোন বস্তুর 'মোট তাপ' (Total heat) কথাটি খুব বিজ্ঞান-সম্মত কথা নয়। উহা মাপা যায় না, এবং কথাটি সম্বন্ধে অন্য আপত্তিও আছে। তাহার চেয়ে উষ্ণতার প্রভেদে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে যে পরিমাণ তাপ যায়—একে দেয়, অন্যে নেয়—তাহার সঠিক মান নির্ণয় করা সম্ভব, এবং এই বর্জিত ও গৃহীত তাপের আলোচনাই বেশী ফলপ্রসূ। আমরা ইহাই করিব।

ধরিলাম কোন পাত্রে দুইটি অসমান উষ্ণতার বস্তু রাখা আছে এবং পাত্রটি এমন যেন উহার সহিত বস্তু দুইটি তাপের কোন লেনদেন হইতে পারে না, বা পাত্রটির মধ্য দিয়া বাহির হইতে কোন তাপ ভিতরে আসিতে বা ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে পারে না। [এ রকম পাত্রকে 'রুদ্ধতাপ' (adiabatic) পাত্র বলে। তাপ সংক্রান্ত আলোচনায় তাপ পরিবর্তন এই রকম পাত্রে ঘটিতেছে ইহা আমাদের মনে করা দরকার হয় ; নহিলে জটিলতা বাড়ে। ব্রাকেটে দেওয়া এই কথা কয়টি মনে রাখিতেও পার, নাও পার।] তাপ এক প্রকার শক্তি ইহা আমরা আগেও বলিয়াছি, পরেও (II-5.2 ও II-5.3 উপবিভাগে) আবার বলিব। শক্তির নিত্যতার জন্য উষ্ণতর বস্তুটি যে তাপ বর্জন করিবে ও শীতলতর বস্তুটি যে তাপ গ্রহণ করিবে, তাহারা সমান হইবে।

উষ্ণতার পরিবর্তনে বর্জিত বা গৃহীত তাপ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) ভর, (২) উষ্ণতা পরিবর্তন ও (৩) বস্তুটি যে পদার্থে গঠিত তাহার প্রকৃতি। পদার্থের প্রকৃতির ক্রিয়া বুঝাইতে আমরা তাপ সংক্রান্ত নূতন একটি রাশির অবতারণা করিব ; ইহার নাম 'আপেক্ষিক তাপ' (Specific heat)। একক ভরের পদার্থকে এক ডিগ্রী উষ্ণ করিতে যে পরিমাণ তাপের দরকার হয় তাহাকে ঐ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বলে। s আপেক্ষিক তাপের কোন পদার্থের m ভরের বস্তুর উষ্ণতা পরিবর্তন t ডিগ্রী হইলে, উহা উষ্ণতা কমিলে mst পরিমাণ তাপ বর্জন করিবে। উষ্ণতর হইলে উহা mst পরিমাণ তাপ গ্রহণ করিবে। তাপ বা উষ্ণতার এককের কোন কথা তোমাদের বলা হয় নাই। তবু জানিয়া রাখ এক গ্রাম জলকে এক ডিগ্রী সেলসিয়াস উত্তপ্ত করিতে যে তাপ দরকার, সিজিএস্ পদ্ধতিতে তাহাই তাপের একক এবং ইহার নাম 'ক্যালরি' (calorie)। ভর m-কে গ্রামে, উষ্ণতা পরিবর্তন *t*-কে সেলসিয়াস

(বা সেন্টিগ্রেড) ডিগ্রীতে প্রকাশ করিলে বর্জিত বা গৃহীত তাপের পরিমাণ H=mst ক্যালরি হইবে।

জলের আপেক্ষিক তাপ সবচেয়ে বেশী ; ইহা 1 ক্যালরি/গ্রাম/°সি, বা প্রতি গ্রাম-ডিগ্রী-সেলসিয়াসে এক ক্যালরি। এক হাইড্রোজেন গ্যাস ছাড়া অন্য সব জিনিসের আপেক্ষিক তাপ জলের চেয়ে কম। তাপপরিবাহী পদার্থের, যেমন ধাতুর আপেক্ষিক তাপ খুব কম। কিন্তু তাপ কুপরিবাহী পদার্থের, যেমন কাঠ, বেত, অ্যাসবেসটস্ ইত্যাদির, আপেক্ষিক তাপ ধাতুর তুলনায় অনেক বেশী। অনেকটা এই কারণে ইহারা চট করিয়া গরম হয় না। তবে আপেক্ষিক তাপ ও তাপ পরিবাহিতায় সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই।

প্রশ্ন। উষ্ণতার প্রভেদে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে তাপ সঞ্চালন কি কি বিষয়ের উপর এবং কিভাবে নির্ভর করে ?

II-5.2. তাপের প্রকৃতি (Nature of heat)। I-4.1 উপবিভাগে শক্তি আলোচনায় আমরা তাপকে শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। তাপ কোন প্রকার পদার্থ নয়। তাপ পদার্থ হইলে একই বস্তুর উষ্ণ ও শীতল অবস্থায় ওজনের প্রভেদ হইত। একই বস্তু উষ্ণ ও শীতল অবস্থায় ওজন করিয়া খুব সূক্ষ্ম মাপনেও উহার ওজনের কোন প্রভেদ পাওয়া যায় না।

তাপ পদার্থ নয় ইহা প্রমাণ করা যত সোজা, তাপ এক প্রকার শক্তি তাহা প্রমাণ করা তত সোজা নয়। নানা রকম পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সাহায্যে তাপকে শক্তি বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। দুই হাত ঘষিতে থাকিলে হাত গরম হয়। এক টুকরা লোহাকে হাতুড়ি দিয়া ঘা মারিতে থাকিলে, বা এক খণ্ড তারকে বার বার বাঁকাইতে থাকিলে দেখা যায় উহা ক্রমে গরম হইতেছে। শাণ-পালিশের কলের ঘুরন্ত চাকায় ছুরি চাপিয়া ধরিলে উহা হইতে আগুনের ফুলকি ছুটিতে থাকে। চকমকি ঠুকিয়া আগুন ধরান মানব সভ্যতার প্রথম যুগের কথা এবং সভ্যতার অগ্রগতির খুব বড় এক ঘটনা। গতির সাহায্যে তাপ উৎপাদনের এরূপ অগণিত উদাহরণ দেখা যায়। জেমস্ ওয়াট্ আগুনে জলকে বাষ্প করিয়া বাষ্পের সাহায্যে ইনজিন চালাইয়াছিলেন। বাষ্পীয়, পেট্রল বা ডিজেল ইনজিন তোমাদের কাছে এখন খুব পরিচিত জিনিস। এগুলি তাপ হইতে গতি পাইবার এক একটি উদাহরণ।

এই সকল উদাহরণ হইতে দেখা যায় গতিশক্তি ও তাপে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং উহাদের একটি হইতে অন্যটি পাওয়া যায়। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় তাপ এক প্রকার শক্তি। ক্রমে আমরা তাপকে পদার্থের অণুর গতি ও স্থিতিশক্তির সহিত সম্পর্কিত করিতে পারিয়াছি। বস্তু কঠিন তরল বা বায়বীয়, যে অবস্থায়ই থাকুক না

কেন উষ্ণতা বাড়িলে উহার অণুর গতিশক্তি বাড়ে। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি, হঠাৎ চাপনে গ্যাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হঠাৎ চাপ কমানয় গ্যাস ঠাণ্ডা হওয়া, উদ্বায়ী তরলের বাষ্পনে তরল ঠাণ্ডা হওয়া—এগুলি অণুর গতিশক্তির সঙ্গে তাপের সম্পর্কের উদাহরণ।

তাপশক্তির সংজ্ঞা দিতে আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন 'উষ্ণতার প্রভেদ থাকিলে উষ্ণতর বস্তু হইতে শক্তি যে রূপ ধরিয়া শীতলতর বস্তুতে সঞ্চালিত হয়, তাহাই হইল তাপশক্তির রূপ'। শীতলতর বস্তুতে এইভাবে যে তাপশক্তি প্রবেশ করিল তাহাকে আর তাপ বলা হয় না। তাহা সাধারণত বস্তুর অণুগুলির গতি ও স্থিতি শক্তিতে পরিণত হয়। এই কথাগুলি বুঝাইবার জন্য সহজ একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। ধর মেঘ হইতে নদীতে বৃষ্টি পড়িতেছে। জলবিন্দুগুলিকে ততক্ষণই আমরা বৃষ্টি বলি যতক্ষণ উহারা পড়িতে থাকে। নদীতে পড়িয়া উহারা নদীর জলে মিশিয়া যায়। তখন আর আমরা উহাদের নদীর জল হইতে পৃথক করিতে পারি না এবং উহাদের বৃষ্টিও বলি না।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে "উষ্ণতার প্রভেদে চলন্ত শক্তিই হইল তাপশক্তি।" চলা, অর্থাৎ তাপ সঞ্চালন, শেষ হইলে উহা আর তাপ নয়; উহা অন্য কোন প্রকার শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। II-5 বিভাগে কোন বস্তুর 'মোট তাপ' কথাটি ঠিক বিজ্ঞান সম্মত নয়, এ কথা আমরা কেন বলিয়াছি এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলে।

পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ—এই তিনভাবে তাপ সঞ্চালন হয় তোমরা বোধ হয় জান। পরিবহণে উষ্ণবস্তু হইতে উহার কিছু আণবিক গতিশক্তি উষ্ণতর হইতে শীতলতর স্তরের অণুতে ক্রমশ সঞ্চালিত হয়। এক্ষেত্রে সঞ্চলনশীল আণবিক গতিশক্তিই হইল তাপ। পরিচলনে তরল বা গ্যাসের উষ্ণতর অংশ শীতলতর অংশে উঠিয়া যায়। সেখানে উষ্ণ হইতে শীতল অংশে পরিবহণ ক্রিয়ায়ই তাপ সঞ্চালিত হয়। বিকিরণে উষ্ণ বস্তু হইতে বিকিরিত বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ আলোর বেগে সব দিকে ছড়ায় ও শীতলতর বস্তুতে আপতিত অংশের কিছুটা উহাতে শোষিত হয়। বিকিরণে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গই তাপের রূপ। এখানে যাহা বলিলাম তাহা এখন ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও জানিতে কোন ক্ষতি নাই।

প্রশ্ন। তাপকে আমরা শক্তি বলিয়া মনে করি কেন? আধুনিক বিজ্ঞান তাপশক্তিকে কি প্রকার শক্তি মনে করে? ইহা বুঝাইতে একটি দৃষ্টান্ত দিতে পার?

II-5.3. কার্যের (Work-এর) সহিত তাপের সম্পর্ক। কার্যের সঙ্গে তাপের সম্পর্ক আছে একথা আগে অনেক মনীষীর মনে আসিয়া থাকিলেও, 1798 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশের যুদ্ধমন্ত্রী কাউণ্ট রামফোর্ড (Count

Rumford) প্রথম স্পষ্টভাবে ইহা দেখান। তিনি তখন লোহার বিঁধ (drill)-এর সাহায্যে পিতলের কামান ছেঁদা করার কাজ তদারক করিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পান বিঁধ চলা কালে কামান ক্রমশ গরম হয়। বিঁধে চাঁছা পিতলের সরু ফালিগুলি ফুটন্ত জলের চেয়েও বেশী গরম হয়। কামানের ছেঁদা করার অংশ এবং বিঁধ জলে ডুবাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া বিঁধ চালাইতে থাকিলে তিনি দেখেন জল ক্রমশ উষ্ণ হইতেছে ; আড়াই ঘণ্টা পরে সে জল ফুটিয়া ওঠে ; বিঁধ চালান হইতেছিল ঘোড়ার সাহায্যে।

তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগে 'জল গরম হইবার এত তাপ আসে কোথা হইতে' ? সে সময়ে প্রচলিত ধারণা ছিল তাপ এক প্রকার অদৃশ্য ও প্রায় ভারহীন কিছু ; ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল ক্যালরিক (Caloric)। বস্তুতে ক্যালরিক প্রবেশ করিলে উহা উষ্ণ হয়, এবং বাহির হইয়া গেলে উহা শীতল হয়।

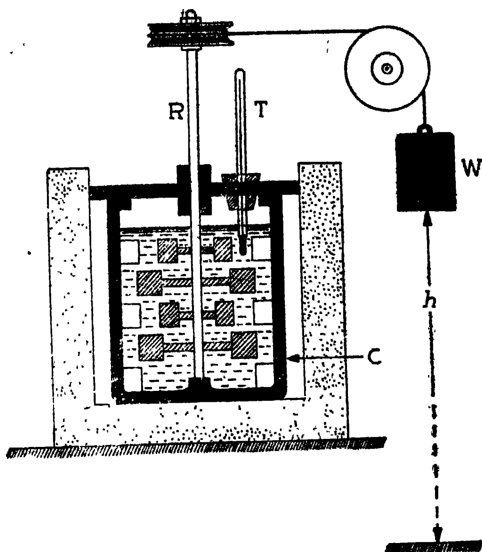
রামফোর্ডের মনে হইল কামানের পিতল হইল যদি ক্যালরিক বাহির হইয়া আসে তাহা হইলে সমান ভর কামানের পিতলে ও ছেঁদার ভিতরের পিতলের গুঁড়া বা চাঁছা পিতলের সরু ফালিতে ক্যালরিকের মান সমান হইবে না। পরীক্ষা করিয়া পিতলের এই দুই অংশের তাপধারণ ক্ষমতার (অর্থাৎ আপেক্ষিক তাপের) তিনি কোন প্রভেদ পান না। তাহা হইলে একমাত্র সম্ভাবনা হইল বিঁধ ঘোরায় তাপের উৎপত্তি। অতএব তাপ গতির সঙ্গে সম্পর্কিত, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। আধুনিক ভাষায় আমরা বলিতে পারি বিঁধ ঘোরায় কার্য হয়, এবং এই কার্যই তাপে পরিণত হয়।

পরের বৎসর ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক স্যার হামফ্রে ডেভি (Sir Humphrey Davy) বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা বায়ুশূন্য আধারের ভিতরে দুইখণ্ড বরফ ঘষিয়া গলাইয়া প্রমাণ করেন বরফের ঘর্ষণ হইতেই বরফ গলার লীন তাপ আসিয়াছে। এ ক্ষেত্রে তাপ আসিল ঘষার কার্য হইতে।

পরে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জেম্‌স্ প্রেস্‌কট্ জুল (James Prescott Joule, 1818-1889) কতটা কার্য করিলে কতটা তাপ পাওয়া যায় তাহা তখনকার দিনের যন্ত্রে যথা সম্ভব সূক্ষ্মভাবে মাপেন। তিনি দেখেন যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্যকে সম্পূর্ণভাবে তাপে পরিণত হইতে দিলে সব সময়ই নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়।

এখানে একটা কথা বলিয়া নেওয়া ভাল। জুলের আগে রামফোর্ড, ডেভি প্রমুখ মনীষীরা কার্য ও তাপের সম্পর্ক লইয়া যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন সেগুলি ছিল গুণগত (qualitative)। কার্য ও তাপে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে—ইহাই ছিল তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। সংখ্যাগত (quantitative) কোন মাপনে কার্যে ও তাপে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। সে চেষ্টা প্রথম করেন জুল।

দশ বৎসর ধরিয়া নানাপ্রকার মাপনের ফল তিনি 1843 সালে প্রকাশ করেন। তাঁহার পরীক্ষাগুলির মধ্যে যান্ত্রিক কার্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া বিদ্যুৎশক্তিকে তাপে পরিণত করা, ঘর্ষণে করা কার্যকে তাপে পরিণত করা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজ ছিল। স্থিতি শক্তিকে কার্যে পরিণত করিয়া তাহাতে উৎপন্ন তাপ মাপনের ব্যবস্থা জুল যে ভাবে করিয়াছিলেন তাহার আভাস II-15 চিত্রে দেখান হইল। W ভার h উচ্চতা



II.15 চিত্র

হইতে মাটিতে পড়িতে Wh পরিমাণ কার্য করে। তাহাতে R দণ্ডে আবদ্ধ পাতগুলি ঘোরে ও C পাত্রস্থ জলের সঙ্গে ঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন করে। পাত্রস্থ জলের ভর উষ্ণতা মাপিয়া উৎপন্ন তাপের পরিমাণ পাওয়া যায়। তাপ যাহাতে C পাত্র হইতে বাহির হইয়া যাইতে না পারে তাহার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হয়। যথেষ্ট তাপ পাইতে W-কে বার বার উপরে তুলিয়া ছাড়িতে হইয়াছিল। ইহাতে জলের উষ্ণতা আস্তে আস্তে বাড়ে। T থার্মমিটার উষ্ণতা মাপে।

জুলের পরেও বহু বৈজ্ঞানিক নানা উপায়ে ও অনেক সূক্ষ্মভাবে কার্য ও তাপের সংখ্যাগত সম্পর্ক মাপিয়াছেন। যে পরিমাণ কার্যে এক একক তাপ পাওয়া যায় তাহাকে 'তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক' (Mechanical equivalent of heat) বা জুলের নামানুসারে 'জুলের তুল্যাঙ্ক' (Joule's equivalent) বলে। ইহার মান প্রতি ক্যালরি তাপে 4·185 বা মোটামুটি 4·2 জুল। এই তুল্যাঙ্ককে J অক্ষর দিয়া

নির্দেশ করা হয়, এবং লেখা হয় তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বা জুলের তুল্যাঙ্ক $J = 4{\cdot}2$ জুল/ক্যালরি। এককের বিভিন্ন পদ্ধতিতে কার্যের ও তাপের একাধিক একক প্রচলিত আছে। সেইসব এককে J-কে প্রকাশ করিলে J-র সংখ্যাগত মান আলাদা হয়, কিন্তু সবক্ষেত্রে কার্য ও তাপের অনুপাত একই থাকে।

ইনজিনে তাপ যখন কার্যে পরিণত হয়, তখনও এক ক্যালরি তাপকে সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করিতে পারিলে উহা হইতে 4·2 জুল কার্য পাওয়া যাইবে।

কার্যকে সম্পূর্ণভাবে পরিণত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু প্রদত্ত খানিকটা তাপকে সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করা যায় না, মাত্র উহার খানিকটাকে পারা যায়। ইহা প্রকৃতির নিয়ম, আমাদের যান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি নয়। তাপকে কার্যে পরিণত করিতে একটি উষ্ণ ও একটি শীতল বস্তু দরকার। উষ্ণ বস্তু হইতে শীতল বস্তুতে যাইতে, উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলে তাপ অংশত কার্যে পরিণত হইতে পারে। বাষ্পীয়, পেট্রল বা ডিজেল ইনজিন এইরূপ ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। তাপের সঙ্গে কার্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে ইহা কি ভাবে বুঝাইতে পার? জুলের তুল্যাঙ্ক বলিতে কি বুঝায়?

II-6. আলোর কথা: দীপক (Sources of light)। এই বিভাগে আমরা আলো সম্বন্ধে কিছু বলিব। বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আমরা প্রধানত চক্ষুর মাধ্যমে পাই। আলো কি, উহা কি ভাবে এবং কত দ্রুত চলে, উহার কি কি ধর্ম আছে—এরকম অনেক প্রশ্ন মানুষের মনে বহুকাল হইতেই জাগিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেগুলির উত্তর সোজা সেগুলির কয়েকটি আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে।

দীপক (Source of light)। প্রথমেই ধর আলো আসে কোথা হইতে? যে সকল বস্তু হইতে আলো বাহির হয় তাহাদের আমরা 'দীপক' বা 'আলোর উৎস' বলি। সূর্য, তারা, প্রদীপ, জোনাকি—ইহারা সকলেই আলো দেয়, ইহাদের প্রত্যেকটিই দীপক। গাছপালা, বাড়িঘর, বইয়ের এই পাতা, দেওয়াল—এগুলি আলো দেয় না। কোন দীপক হইতে উহাদের উপর আলো পড়িলে উহাদের আমরা দেখিতে পাই।

কোন বস্তুকে দীপক বলা হইবে কি হইবে না তাহা উহার উষ্ণতা এবং উহার উপাদানের উপর নির্ভর করে। দীপকগুলিকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। যথেষ্ট উষ্ণ করিতে পারিলে সকল বস্তু হইতেই আলো বাহির হইতে পারে। বিজলীবাতির তার দিয়া যতক্ষণ বিদ্যুৎ-ধারা প্রবাহিত হইয়া উহাকে উষ্ণ না করে ততক্ষণ উহা দীপক নয়। লোহার সিক জলন্ত উনানে ঢুকাইলে কিছুক্ষণের মধ্যেই

উহা উত্তপ্ত হইয়া লালচে আলো দেয়। তাপে অন্তত প্রায় 8)0°C পর্যন্ত উষ্ণ হইলে যে কোন কঠিন বস্তু বা তরলধাতু আলো দেয়। তখন ইহাদের দীপক বলিতে পারি। কেবল উষ্ণতার জন্য যে সকল বস্তু হইতে আলো বাহির হয় তাহাদের 'ভাস্বর বস্তু' (Incandescent bodies) বলে। উষ্ণতা বাড়িলে আলোর রং বদলায়। রং প্রথমে লাল, পরে কমলা, হলদে ও আরও বেশী উষ্ণতায় উহা সাদা হয়। সূর্য ও তাহার আলো আসে অত্যন্ত উষ্ণ গ্যাস হইতে। প্রদীপের আলো আসে দীপশিখার ভিতরে জ্বলন্ত ভাস্বর অতি ছোট অঙ্গার কণা হইতে। প্রদীপের ধোঁয়া হইল যে অঙ্গার কণাগুলি জ্বলে নাই তাহারা। ভাস্বর দীপক দীপকের এক শ্রেণী।

সব দীপকই ভাস্বর নয়, অর্থাৎ উষ্ণতার জন্য আলো দেয়, তাহা নয়। শহরে রাত্রে রঙ বেরঙের নানারকম উজ্জ্বল বিজ্ঞাপন দেখা যায়। সিনেমার বাহিরে এগুলি প্রায় সকলেই দেখিয়াছে। সাধারণ ভাষায় এগুলিকে নিয়ন (Neon) আলো বলে। রেলস্টেশনে, রাস্তায়, দোকানে, অনেক বাড়িতে প্রায় দু ইঞ্চি মোটা লম্বা নলে বৈদ্যুত আলোও অনেকে দেখিয়া থাকিবে। ইহাদের টিউব-লাইট (Tube light) বা ফ্লুওরেসেণ্ট লাইট (Fluorescent light) বলে। গায় হাত দিলে নিয়ন আলো বা টিউব লাইটের উষ্ণতা যে কম তাহা বুঝিতে পারিবে। ইহাদের আলো উষ্ণতার জন্য নয়। ঐ সকল নলে অল্প চাপে নিয়ন বা অন্যান্য গ্যাস থাকে। ঐ গ্যাসের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-ধারা যাওয়ায় গ্যাস হইতে আলো বাহির হয়, গ্যাস বিশেষ উষ্ণ হয় না। বিদ্যুৎ-ধারার জোর বাড়াইলে আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়ে, কিন্তু রং বদলায় না। বিভিন্ন গ্যাসে বিভিন্ন রং হয়। ইহারা আর এক শ্রেণীর দীপক। ভাস্বরতায় ঔজ্জ্বল্য ও রং উষ্ণতার সঙ্গে সম্পর্কিত ; কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর দীপকে রং পদার্থের উপাদানের উপর, অর্থাৎ গ্যাসের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

জোনাকির আলো, সামুদ্রিক নানা প্রকার জীবের দেহ হইতে নির্গত আলো রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল বলিয়া আমরা মনে করি। এ সব ক্ষেত্রেও কম উষ্ণতায় আলো বাহির হয়। কোন কোন অজৈব রাসায়নিক ক্রিয়ায়ও এরকম হয়। বিশেষ প্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকায় এই আলো বাহির হয়। ইহারা আর এক শ্রেণীর দীপক এবং উপাদানের উপর নির্ভরশীল।

[সাম্প্রতিক কালে 'লেজার' (Laser) নামে বিশেষ প্রকৃতির একপ্রকার দীপক উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃতি আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে জানিয়া রাখিতে পার লেজার হইতে অতি তীব্র আলো পাওয়া যায়, এবং সে আলো কেবল একদিকেই যায়, ছড়াইয়া পড়ে না। ইহার নানারকম আশ্চর্যজনক প্রয়োগ হইতেছে।]

দীপক হইতে দীপ্তিহীন কোন বস্তুতে আলো পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে প্রবেশ করিলে, তবেই বস্তুটিকে আমরা দেখিতে পাই। চাঁদের আলো সূর্য হইতে পড়া প্রতিফলিত আলো; চাঁদ আমাদের অর্থে দীপক নয়। শক্তিরূপী আলোকে দেখা যায় না।

আলোকরশ্মি (Ray of light)। দুটি কল্পনের সাহায্য নিলে আলোর ধর্মগুলি আলোচনা করিতে সুবিধা হয়। ইহাদের একটি হইল 'বিন্দু দীপক' (Point source) ও অন্যটি 'আলোকরশ্মি' (Ray)। গতিবিদ্যায় বস্তু ও কণার যে রকম সম্পর্ক (II-1. বিভাগ দেখ) বাস্তব ও বিন্দু দীপকেও সেই সম্পর্ক; দীপকটি এত ছোট মনে করা হইতেছে যে উহা একটি বিন্দু দিয়া নির্দেশ করা যায়। তারাগুলি আমাদের কাছে বিন্দু দীপক; অথচ উহারা পৃথিবীর চেয়ে আকারে লক্ষ লক্ষ গুণ বড়। কোন বাস্তব দীপকের সামনে অনচ্ছ পর্দায় ছোট একটি ছেঁদা করিলে, সেই ছেঁদা দিয়া আলো বাহির হয়। এই ছেঁদাকে কার্যত বিন্দু দীপক মনে করা যায়।

আমাদের দ্বিতীয় কল্পন 'আলোকরশ্মি' (Ray)। বিন্দু দীপক হইতে আর একটি অনচ্ছ পর্দার ছোট একটি ছিদ্র দিয়া আলো আসিতে দাও। ইহা কতকটা দরজা বা জানালার সূক্ষ্ম কোন ছেঁদা দিয়া সূর্যের আলো ঘরে ঢোকার মত। ঘর অন্ধকার থাকিলে এবং ঘরের বায়ুতে যথেষ্ট ধূলিকণা থাকিলে ছেঁদা দিয়া আসা আলো কোন্ পথে যাইতেছে তাহা দেখা যায়। ঘরের বায়ুতে ধোঁয়া বা যথেষ্ট ধূলিকণা থাকিলে বাস্তব ক্ষেত্রে এই পথ সোজা, সরু, উজ্জ্বল তারের মত দেখাইবে। কল্পনায় ছেঁদাটি এত ছোট মনে কর যে আলোর তার কার্যত যেন একটি রেখায় পরিণত হইয়াছে। কল্পিত এই রেখাটিকেই আমরা আলোকরশ্মি বলি; উহা যেন আলোর গতিপথ নির্দেশ করে। গতিবিদ্যার কল্পিত কণা যেমন বাস্তবে পাওয়া যায় না, আলোকরশ্মিও তেমন বাস্তবে পাওয়া যায় না। তবে এই কল্পনের সাহায্যে আমরা আলোর অনেক ধর্মের খুব সহজ বর্ণনা দিতে পারি।

যে পদার্থের ভিতর দিয়া আলো যায়, তাহাকে আলোর 'মাধ্যম' (medium) বলে। রশ্মি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমরা বলি 'কোন মাধ্যমে যে পথ ধরিয়া আলো এক বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুতে যায় তাহাই আলোর রশ্মি'।

বাস্তব দীপক হইতে সবদিকেই আলো ছড়াইয়া পড়ে। কোন আলোচ্য ক্ষেত্রে দীপক হইতে বিশেষ কোন দিকে নির্গত রশ্মিগুচ্ছ আলোচনায় আমাদের সাহায্য করিতে পারে। এরূপ রশ্মিগুচ্ছকে আমরা আলোর 'কিরণ' (Beam of light) বলি।

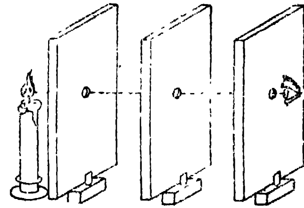
প্রশ্ন (1) দীপকগুলিকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করিতে পার? প্রত্যেক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া উদাহরণ দাও।

(2) আলোক রশ্মি কাহাকে বলে? ইহা কল্পনা না ইহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে? অনুরূপ কোন উদাহরণ অন্যত্র তোমার জানা আছে কি? বিন্দু দীপক বলিতে কি বুঝায়?

II-6.1. আলোর প্রসার ও বেগ (Propagation and velocity of light)। যে মাধ্যমের উপাদান সব জায়গায় একরকম তাহাকে **সমসত্ত্ব** (homogeneous) মাধ্যম বলে। বায়ু, জল, কাচ প্রভৃতি সমসত্ত্ব। **সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলরেখায় চলে।**

আলো আসলে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, একথা শুনিয়া রাখিতে কোন ক্ষতি নাই। তরঙ্গ একস্থান হইতে অন্যস্থানে কিভাবে যায় তাহা পুকুরে ঢিল ফেলিয়া তাহার ফলে গঠিত তরঙ্গের গতি দেখিয়া কিছুটা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু আলোর তরঙ্গধর্ম প্রাথমিক স্তরে আমাদের আলোচনার বাহিরে। কাজেই তরঙ্গ ধর্মের কথা না আনিয়া, সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলোর গতির কত সহজ বর্ণনা দিতে পারি আমরা তাহাই দেখিব।

ইহার জন্য সহজ একটি পরীক্ষা করা যায়। একরকম তিনখানা টিনের পাতলা পাতের মাঝখানে পিনের সাহায্যে একটি করিয়া ছোট ছেঁদা কর। একগাছা সরু তার ছেঁদা তিনটির মধ্য দিয়া চালাইয়া তারগাছা টান করিয়া দুদিকে বাঁধ। ইহাতে ছেঁদা তিনটি এক সরলরেখায় থাকিবে। তারপর টিনের পাত তিনখানা তাহাদের নিজ নিজ জায়গায় আঁট করিয়া রাখ, এবং তারগাছা কাটিয়া আস্তে সরাইয়া লও। দেখিও এ সময়ে টিনের পাত কোনটি যেন না সরে। এখন ছেঁদা তিনটি এক সরল রেখায় আছে। প্রথম ছেঁদার বাহিরে মোমবাতি রাখিয়া (II-16 চিত্র) শেষ ছেঁদার মধ্য দিয়া বাতির দিকে তাকাইলে আলো দেখিতে পাইবে। কিন্তু টিনের পাতের একখানাও পাশের দিকে একটু সরাইলে আলো আর দেখিতে পাইবে না। পাত পাশের দিকে সরাইলে ছেঁদা তিনটি এক সরলরেখায় থাকে না। ইহাতে বোঝা যায় আলো সরলরেখায় চলে। এখানে যে মাধ্যমে আলোর গতি দেখিলাম তাহা বায়ু; বায়ু সমসত্ত্ব মাধ্যম।


II-16 চিত্র

উপরের পরীক্ষা ছাড়া বিন্দু দীপকে স্পষ্ট ছায়া পড়া, পিন্-হোল্ (Pin-hole) ক্যামেরার ক্রিয়া প্রভৃতি ঘটনা হইতেও আমরা সিদ্ধান্ত করি সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো

সরলরেখায় চলে কারণ আলোর ঋজুগতি দিয়াই এই সকল ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায়। স্থূলভাবে দেখিলে এ সিদ্ধান্তে কোন দোষ নাই। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে যেটুকু ব্যতিক্রম হয় তাহা আমরা এখানে উপেক্ষা করিতে পারি। তাছাড়া, উহা আমাদের আলোচনার বাহিরে।

আর একটি উদাহরণ দেখ। দূরে ছোট একটি আলো দেখা যাইতেছে। সেই আলো আর তোমার চোখের মাঝখানে কোথাও খুব ছোট কোন অনচ্ছ বস্তুর বাধা সৃষ্টি করিলেই আলোটি আর দেখা যাইবে না। ইহাও আলোর সরলপথে চলার একটি স্থূল প্রমাণ।

আলো সমসত্ত্ব মাধ্যমে সরলরেখায় চলে ও উহার গতিপথ রশ্মি আঁকিয়া দেখান হয়। রশ্মি নির্দেশক রেখায় দরকার হইলে একটি তীর চিহ্ন দিয়া গতির দিক্ বুঝান হয়।

আলোর বেগ। আলো কি বেগে দীপক হইতে ছড়ায় তাহা কল্পনা করাও শক্ত। আমরা জানিয়াছি শূন্যস্থানে, কার্যত বায়ুতেও, আলোর বেগ সেকেণ্ডে 3×10^8 মিটার $=3\times10^{10}$ সেমি/সে $=$ প্রায় 186,000 মাইল/সে। আলো যদি পৃথিবীর গা ঘেঁষিয়া চলিতে পারিত তাহা হইলে এক সেকেণ্ডে উহা পৃথিবীর চারদিকে সাত পাকের বেশী ঘুরিত (পৃথিবীর পরিধি 4×10^7 মিটার)। সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে সময় লাগে প্রায় আট মিনিট; চাঁদ হইতে আসিতে লাগে এক সেকেণ্ডের একটু বেশী। পৃথিবী হইতে চাঁদের দূরত্ব প্রায় 5×10^7 মিটার বাড়ে কমে; গড় দূরত্ব প্রায় $3{\cdot}84\times10^8$ মিটার ধরিতে পার। বিজ্ঞানী বর্তমানে আলোর বেগ অতি সূক্ষ্মভাবে মাপিয়াছেন। মাপনে ত্রুটি বড় জোর 3×10^6 ভাগে 1 ভাগ। পৃথিবী হইতে চাঁদে পাঠান 'লেজার' আলো চাঁদের পিঠে প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে যে সময় নেয়, তাহা মাপিয়া তিনি চাঁদের দূরত্ব এত সূক্ষ্মভাবে বলিতে পারেন যে সে মানে কয়েক মিটারের বেশী ত্রুটি থাকে না।

আলো এক বৎসরে যতদূর যাইতে পারে তাহাকে এক 'আলোকবর্ষ' (Light-year) বলে। এক আলোকবর্ষ $=$ প্রায় $9{\cdot}4\times10^{15}$ মিটার। এ দূরত্ব কল্পনা করিতে পার? আমাদের নিকটতম নক্ষত্র প্রায় চার আলোকবর্ষ দূরে। সৌরমণ্ডল ও এই নক্ষত্রের মধ্যে মহাশূন্য। আলো মহাশূন্যে চলিতে পারে, উহার জন্য বায়ু বা অন্য কোন বাস্তব মাধ্যম দরকার হয় না। বাস্তব মাধ্যমে আলোর বেগ কম। সে কথা পরে বলিব।

রাত্রে আকাশে যে ছায়াপথ দেখা যায় উহা লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের সমষ্টি। আমাদের সূর্য ও যত নক্ষত্র আমাদের চোখে পড়ে, ছায়াপথের নক্ষত্র সমেত উহারা সকলে একই নীহারিকা (galaxy)র অন্তর্গত। এই নীহারিকা আকারে অনেকটা পেটমোটা গোল চাকার মত। চাকার ব্যাস কত জান? প্রায় 100,000 (এক লক্ষ) আলোক বৎসর। মহাবিশ্বে এই রকম লক্ষ লক্ষ নীহারিকা আছে। গড়ে দুই নীহারিকার দূরত্ব প্রায় এক মিলিয়ন (10^6) আলোকবর্ষ। মহাবিশ্ব কত বড় ধারণা করিতে পার? এ সকল তথ্য আমরা দূর নীহারিকা হইতে আগত আলো বিশ্লেষণ করিয়া জানিতে পারিয়াছি। যে কোন নক্ষত্র বা নীহারিকা সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য সবই সেখান হইতে আগত আলোর মধ্য দিয়াই পাওয়া যায়।

প্রশ্ন। সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলরেখায় চলে ইহার সমর্থনে কি প্রমাণ দিতে পার?
শূন্যস্থানে আলোর বেগ কত? আলোকবর্ষ বলিতে কি বুঝায়?

II-6.2. আলোর প্রতিফলন (Reflection of Light)। আলোর কিরণ কোন কঠিন বা তরল সমতল পৃষ্ঠে আপতিত হইলে উহার এক অংশ তল হইতে ফিরিয়া আসে। এই ফিরিয়া আসাকে 'প্রতিফলন' (Reflection) বলে। আয়না, জলতল, কাচের পাত হইতে প্রতিফলনের সঙ্গে তোমরা পরিচিত। পালিশ করা ধাতুপাত হইতে জোরাল প্রতিফলন হয়। কাচ বা জল হইতে প্রতিফলন কম। আয়নার পিছনে রূপার প্রলেপ দেওয়া থাকে; আয়নার জোরাল প্রতিফলন ঐ প্রলেপের জন্য।

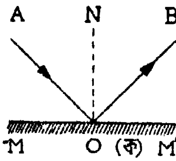
প্রতিফলন সংক্রান্ত ব্যাপার বর্ণনা করিতে কয়েকটি কথার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। II-17 (ক) চিত্রের সাহায্যে এগুলি আমরা বুঝিব। চিত্রে AO রশ্মি MOM′ সমতলের O বিন্দুতে আপতিত হইয়া ধর যেন OB পথে ফিরিয়া গেল। AO রশ্মিকে 'আপতিত রশ্মি' (Incident ray), O বিন্দুকে 'আপতন বিন্দু' (Point of incidence) এবং OB রশ্মিকে 'প্রতিফলিত রশ্মি' (Reflected ray) বলে। O বিন্দুতে ON রেখা MOM′ তলের অভিলম্বে টানা হইয়া থাকিলে ON-কে বলে 'আপতন বিন্দুতে টানা লম্ব' (Normal at the point of incidence)। AON কোণকে 'আপতন কোণ' (Angle of incidence) ও BON কোণকে 'প্রতিফলন কোণ' (Angle of reflection) বলে।

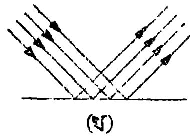
প্রতিফলনে আলোক রশ্মি দুইটি নির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে; ইহাদের 'প্রতিফলনের সূত্র' (Laws of reflection) বলে। সূত্র দুইটি হইল—

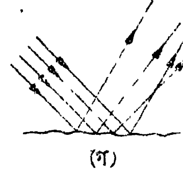
(১) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও আপতন বিন্দুতে টানা অভিলম্ব, এই তিনটি একই সমতলে থাকে। [এই তলকে 'আপতন তল' (Plane of incidence) বলে। II-17 (ক) চিত্রে কাগজের তলই হইল আপতন তল।]

(২) প্রতিফলন কোণ আপতন কোণের সমান। ($\angle AON = \angle BON$)

MOM′ তল যদি আয়নার মত ভাল সমতল হয়, তাহা হইলে আপতিত কিরণের রশ্মিগুলি আপতনের আগে সমান্তরাল থাকিলে প্রতিফলনের পরেও সমান্তরাল থাকিবে (II-17খ চিত্র)। MOM′ তল তেমন মসৃণ না হইলে, ধর ঘরের দেওয়াল বা বইয়ের

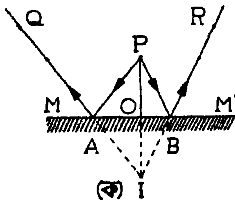


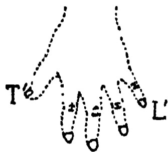


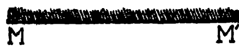


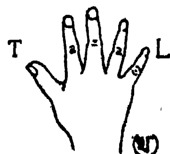
II-17 চিত্র

কাগজের মত হইলে, বিভিন্ন রশ্মিগুলি তাহাদের নিজ নিজ আপতন বিন্দুতে প্রতিফলনের সূত্র মানিয়া বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িবে (II-17গ চিত্র)। প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিফলনকে 'সুষম' (Regular) ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহাকে 'বিক্ষিপ্ত' (Diffuse) প্রতিফলন বলে। সুষম প্রতিফলনের জন্য দরকার মত পালিশ করিয়া সমতলকে মসৃণ করিতে হয়।









II-18 (ক) ও (খ) চিত্র

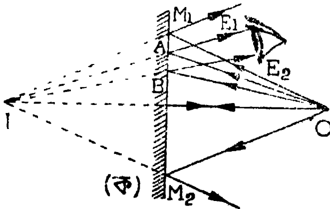
সাধারণ বস্তুর পিঠ কখনই যথেষ্ট মসৃণ হয় না বলিয়া উহাদের গা হইতে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয় এবং সেই কারণেই উহাদের আমরা দেখিতে পাই। সিনেমার পর্দা হইতে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয় বলিয়াই সিনেমা হলের যে কোন জায়গা হইতে ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। আয়নায় যাহা দেখ তাহা সুষম প্রতিফলনে গঠিত বিম্ব। সিনেমার পর্দার বদলে আয়না রাখিলে হলের খুব কম লোকই পূর্ণ ছবি দেখিতে পাইতেন।

প্রতিফলনে বিম্ব কিভাবে গঠিত হয় তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। II-18 (ক) চিত্রে P যেন একটি বিন্দু দীপক। MOM′ সমতল দর্পণে আপতিত PAQ ও PBR রশ্মি দুটি দেখ। প্রতিফলিত রশ্মি দুটি পিছন দিকে বাড়াইয়া দিলে উহারা I বিন্দুতে ছেদ করে। এই I বিন্দুই P বিন্দুর বিম্ব (Image)। প্রতিফলিত সব রশ্মিই I হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইবে। PI যোগ করিলে উহা MOM′-কে যদি O বিন্দুতে ছেদ করে তবে, আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান বলিয়া, জ্যামিতির সাহায্যে

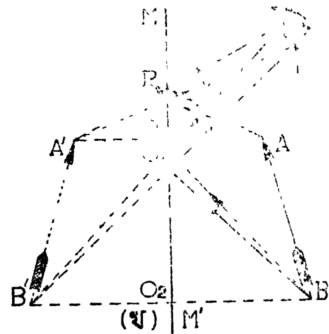
সহজেই দেখান যায় PI MOM' তলের লম্ব এবং PO=PI। শেষের সম্পর্কটি হইতে বলা যায় দর্পণ হইতে লক্ষ্য বস্তু ও বিম্বের দূরত্ব সমান। **লক্ষ্যবস্তু সমতল দর্পণের যতটা সম্মুখে থাকে, উহার বিম্ব দর্পণের ঠিক ততটা পিছনে গঠিত হয়।** প্রতিফলন সংক্রান্ত ব্যাপারে এই ফলটি গুরুত্বপূর্ণ।

আয়নার সামনে দাঁড়াইলে ডান-বাঁ উলটাইয়া গিয়াছে মনে হয়, অর্থাৎ তোমার ডান দিককে বিম্বের বাঁদিক বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ আয়না হইতে লক্ষ্যবস্তু ও বিম্বের দূরত্বের সমতা। II-18 (খ) চিত্রে MM' আয়না ও TL ডান হাতের পাঁচ আঙুল। বিম্ব সমান দূরত্বে গঠিত হয় বলিয়া TL-এর বিম্ব T'L' কেমন দেখাইবে তাহা ছবি হইতেই বুঝিতে পারিবে। T'L'কে বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল বলিয়া মনে হইবে। সমতল দর্পণে ডান বাঁ উলটাইয়া যাওয়াকে 'পার্শ্ব-পরিবর্তন' (Lateral inversion) বলে। ছাপার হরফগুলি আয়নায় কেমন দেখায়? উহা পার্শ্ব-পরিবর্তনের ফল। কালির লেখা ব্লটিং কাগজে শুষিয়া ব্লটিং কাগজের ছাপটা আয়নায় ধরিয়া দেখ কি লেখা ছিল তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে। ইহার কারণও একই।

লক্ষ্য কোন বিন্দু হইতে প্রতিফলিত সরু, অপসারী (divergent) কিরণের সাহায্যে ঐ বিন্দুকে আমরা দেখিতে পাই। কিরণের রশ্মিগুলি বিম্ব হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয় (II-19ক চিত্র) এবং উহাঁদের যেগুলি ($E_1 E_2$) আমাদের চোখে প্রবেশ করে তাহাদের সাহায্যেই আমরা ঐ বিন্দু দেখি। লক্ষ্য বস্তুটি বড় হইলে উহার বিভিন্ন



II-19 (ক) চিত্র



II-19 (খ) চিত্র

অংশ কিভাবে দেখিতে পাই তাহা II-19 (খ) চিত্র হইতে বুঝিতে পারিবে। লক্ষ্য কর, বস্তুর বিভিন্ন অংশ হইতে আলো চোখে আসিতে আয়নার বিভিন্ন স্থান (PQ) হইতে উহা প্রতিফলিত হয়। এই কারণে ছোট আয়নায় নিজের সম্পূর্ণ চেহারা কখনও

দেখিতে পাইবে না। সম্পূর্ণ দেখিতে হইলে আয়না লম্বায় অন্তত তোমার অর্ধেক হইতে হইবে।

আয়নার প্রতিফলনে তুমি যদি কাহারও চোখ দেখিতে পাও তাহা হইলে, সে যেখানেই থাকুক না কেন, সেও তোমার চোখ দেখিতে পাইবে। ইহা কি ভাবে হইতে পারে ছবি আঁকিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর। চোখের বদলে দুইটি বিন্দু ধরিয়া ছবি আঁক ; আপতন ও প্রতিফলন কোণ সমান হইবে মনে রাখিও।

প্রতিফলনে আপতিত রশ্মির দিক্ পরিবর্তিত হয় সহজেই বুঝিতে পার। রশ্মি লম্বভাবে আপতিত হইলে সেই পথেই ফিরিয়া আসিবে। এক্ষেত্রে আপতন ও প্রতিফলন কোণ কত? তিনখানা সমতল আয়না পরস্পর সমকোণে (ঘরের মেঝে ও দুই পাশাপাশি দেওয়ালের মত করিয়া) রাখিলে, উহাদের যে কোন আয়নায় যে কোন দিক্ হইতে রশ্মি আপতিত হইয়া পর পর তিন আয়নায়ই যদি প্রতিফলিত হয় তবে রশ্মি যে পথে আসিয়াছে তাহার সমান্তরালেই ফিরিয়া যাইবে। বিশেষ কাজে এ রকম আয়নার ব্যবহার আছে। রাস্তায় কোথাও বাঁক থাকিলে বা পাহাড়ে রাস্তার পাশে কোথাও খাদ থাকিলে যদি রাস্তার পাশে এ রকম আয়না রাখা যায় তাহা হইলে রাত্রে মোটর চালাইতে ঐ সব জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা কমে। কারণ গাড়ির আলো আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া চালকের চোখে আসিয়া পড়ে বলিয়া তিনি সতর্ক হইতে পারেন। চাঁদে এই রকম কতকগুলি আয়না একসঙ্গে খানিকটা জায়গা জুড়িয়া রাখা হইয়াছে। পৃথিবী হইতে লেজার (Laser) রশ্মি উহাতে পড়িলে রশ্মি বিশেষ না ছড়াইয়া আবার পৃথিবীতেই ফিরিয়া আসিবে। আলোর যাতায়াতের সময় মাপিয়া চাঁদের দূরত্ব সূক্ষ্মভাবে জানা যায় তাহা একটু আগেই বলিয়াছি।

প্রশ্ন। আলোর প্রতিফলনের সূত্র দুটি বল, ও উহাতে ব্যবহৃত বিশেষ কথাগুলির অর্থ বুঝাও।

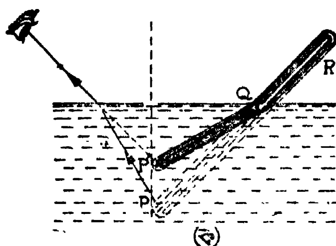
ছবি আঁকিয়া প্রতিফলনে গঠিত বিন্দুদীপকের বিম্বের অবস্থান দেখাও। উহা কোথায় গঠিত হয়? আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ডান হাত তুলিলে বিম্ব বাঁ হাত তুলিয়াছে মনে হয় কেন?

প্রতিফলনে কোন বিস্তৃত বস্তুর দুইটি বিভিন্ন বিন্দুকে যে যে আলোক কিরণে দেখিতে পাইবে, ছবি আঁকিয়া সেই কিরণের গতিপথ নির্দেশ কর।

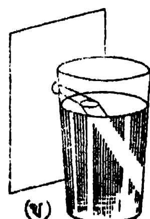
আয়নায় লম্বভাবে আপতিত রশ্মি প্রতিফলনের পর কোন্ পথে যাইবে?

II-6.3. **আলোর প্রতিসরণ** (Refraction of light) এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করিলে আলোর গতির দিক্ পরিবর্তন হয়। ইহাকে আলোর প্রতিসরণ (Refraction) বলে। প্রতিসরণের খুব সোজা পরীক্ষা নিজেই করিয়া দেখিতে পার। এক বালতি জলে একটু কাত করিয়া একটা সোজা কাঠি ঢুকাইয়া

দিয়া পাশ হইতে কাঠির দিকে তাকাও। জল যেন স্থির থাকে। দেখিবে জলের বাহিরে ও জলের ভিতরে কাঠির অংশ এক সরলরেখায় নাই ; জলে ঢুকিয়া কাঠি যেন হঠাৎ বাঁকিয়া গিয়াছে (II-20 ক চিত্র)। ইহা জল হইতে বায়ুতে প্রতিসরণের জন্য এরকম দেখায়।



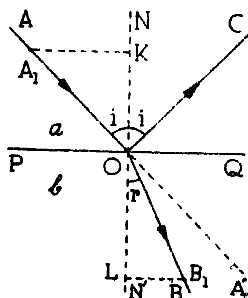
II-20 (ক) চিত্র



II-20 (খ) চিত্র

কাচের এক গেলাস জলে অল্প একটু দুধ মিশাইয়া জল সামান্য ঘোলাটে করিয়া নাও। একখানা মোটা কাগজে সরু একটি ছেঁদা করিয়া সূর্যের আলো সেই ছেঁদার ভিতর দিয়া ঘোলা জলের উপর পড়িতে দাও। চারদিকের বিক্ষিপ্ত আলো হইতে গেলাসকে একটু আড়ালে রাখিতে পারিলে জলের ভিতরে সূর্য রশ্মির পথ দেখিতে পাইবে (II-20 খ চিত্র)। কাগজেব ছেঁদা এই পথের সঙ্গে এক সরলরেখায় থাকে না। ছেঁদা উপর নিচ করিয়া দেখিতে পার ঘোলা জলে রশ্মির পথ কেমন বদলায়।

II-21 চিত্রের সাহায্যে আমরা প্রতিসরণ বর্ণনা করিতে পারি। চিত্রে a ও b দুই মাধ্যম। a মাধ্যমে চলিয়া AO রশ্মি দুই মাধ্যমের বিভেদ তল PQ-র O বিন্দুতে আপতিত হইয়াছে। ইহা আপতিত রশ্মি। NON′ রেখা O বিন্দুতে টানা PQ-র লম্ব। মনে কর b মাধ্যমে রশ্মির পথ হইল OB। b মাধ্যম না থাকিলে রশ্মি OA′ পথে যাইত। AON কোণ আপতন কোণ ; ইহাকে আমরা i অক্ষর দিয়া নির্দেশ করিব। BON′ কোণ প্রতিসরণ কোণ ; ইহাকে আমরা r অক্ষর দিয়া নির্দেশ করিব। OA রশ্মির উপর A_1 যে কোন একটি বিন্দু এবং A_1K ON-এর উপর লম্ব। অনুরূপে B_1 বিন্দু OB রশ্মির উপরস্থ যে কোন বিন্দু এবং B_1L ON′-এর উপর লম্ব। A_1K/OA_1 অনুপাতকে আপতন কোণের 'সাইন' (sine) বলে ; লেখা হয় $\sin i$। B_1L/OB_1 অনুপাতকে প্রতিসরণ কোণ r-এর 'সাইন' বলে ;



II 21 চিত্র

লেখা হয় sin r। $OA_1=OB_1$ করিয়া আঁকিলে sin i/sin $r=A_1K/B_1L$ হইবে।

প্রতিসরণ দুটি নিয়ম মানিয়া চলে ; উহাদের 'প্রতিসরণের সূত্র' বলে। সূত্র দুটি এই :

(১) আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি ও আপতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদতলের উপর টানা লম্ব একই সমতলে থাকে। (এই তলকে 'আপতনতল' বলে।)

(২) নির্দিষ্ট দুই মাধ্যমে, নির্দিষ্ট রঙের আলোয় sin i/sin r অনুপাত স্থির থাকে। [এই সূত্রকে 'স্নেলের সূত্র' (Snell's law) বলে।]

sin i/sin r অনুপাতকে প্রথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের 'প্রতিসরাঙ্ক' (Refractive index) বলে। এই অনুপাতকে আমরা n অক্ষর দিয়া বুঝাইব। নির্দিষ্ট দুই মাধ্যমে n-এর মান আপতন কোণের মানের উপর নির্ভর করে না ; করে কেবল আলোর রঙের উপর। বিভিন্ন রঙে n-এর পরিবর্তন সামান্যই। কাজেই স্থূল আলোচনায় এই পরিবর্তন উপেক্ষা করিয়া বলিতে পারি বায়ু সাপেক্ষে জলের প্রতিসরাঙ্ক 1·33 এবং কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1·5। জল সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1·5/1·33=প্রায় 9/8। মাধ্যম পরিবর্তনে প্রতিসরাঙ্ক আলাদা হয়। জল হইতে বায়ুতে আলো প্রতিসৃত হইলে প্রতিসরাঙ্ক হইবে 1/1·33=0·75।

যখন প্রথম মাধ্যমের উল্লেখ থাকে না, তখন বুঝিবে উহা বায়ু বা বায়ুশূন্য স্থান সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক। বায়ুশূন্য স্থান সাপেক্ষে বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক 1-এর চেয়ে অতি সামান্য বেশী। ইহা উপেক্ষা করিলে সাধারণ ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি ঘটে না। পরে জানিবে প্রতিসরাঙ্ক $n=\dfrac{\text{প্রথম মাধ্যমে আলোর বেগ}}{\text{দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোর বেগ}}$

কাচে $n=1\cdot5$ হইলে বায়ুশূন্য স্থানে আলোর বেগ 3×10^8 মি/সে বলিয়া কাচে আলোর বেগ 2×10^8মি/সে। জলে আলোর বেগ হিসাব কর।

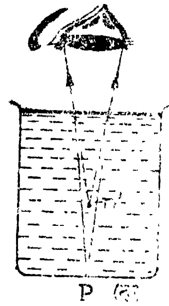
দুই মাধ্যমের যেটির প্রতিসরাঙ্ক বড় তাহাকে 'ঘনতর' আলোক মাধ্যম (optically denser medium) ও অন্যটিকে 'লঘুতর' আলোক মাধ্যম (optically lighter medium বলে। বায়ু সাপেক্ষে জল ঘনতর আলোক মাধ্যম ; জল সাপেক্ষে কাচ ঘনতর আলোক মাধ্যম। এই ঘনত্বের সঙ্গে ভর সম্বন্ধীয় ঘনত্বের (একক আয়তন ভরের) কোন সম্পর্ক নাই। প্যারাফিন তেল জলের চেয়ে হালকা ; কিন্তু উহার $n=1\cdot47$ হওয়ায় উহা জলের চেয়ে ঘনতর আলোক মাধ্যম।

II.21 চিত্র হইতে আমরা আরও দুএকটি বিষয় দেখিতে পারি। দুই মাধ্যমের বিভেদতলে আপতিত আলোর এক অংশ প্রথম মাধ্যমে আপতন কোণের সমান কোণে প্রতিফলিত হয়; বাকী অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে। আপতন কোণ বাড়িলে প্রতিফলিত অংশ বাড়ে। আপতন কোণ প্রায় 90°-র কাছাকাছি হইলে জোরাল প্রতিফলন হয়। পরিষ্কার একখানা কাচের পাতে প্রায় পাতের তলে চোখ রাখিয়া তাকাইলে দেখিবে প্রায় আয়নায় প্রতিফলনের মতই উজ্জ্বল বিম্ব দেখা যাইতেছে।

দ্বিতীয়ত, n 1 অপেক্ষা বড় হইলে প্রতিসৃত রশ্মি আপতিত রশ্মির চেয়ে আপতন বিন্দুস্থ লম্বের বেশী কাছে আসিবে। II.21 চিত্রে $OA_1 = OB_1$ হইলে $n = A_1K/B_1L$ হইবে; ইহা হইতে কোন্ রশ্মি লম্বের কাছে কোন্‌টি দূরে বোঝা যায়। n 1-এর চেয়ে ছোট হইলে ইহার বিপরীত ক্রিয়া হয়। n স্থির রাশি হওয়ায় $n = A_1K/B_1L$ হইতে আরও বোঝা যায় যে i বড় হইলে r-এর মানও বাড়িবে। $i = 0^\circ$ হইলে r-এর মান ও 0° হয়। তা ছাড়া, রশ্মির বিচ্যুতি কোণ (angle of deviation) $i - r = \delta$ (গ্রীক অক্ষর, উচ্চারণ 'ডেলটা') i বাড়িলে বাড়ে। II.21 চিত্রে $\delta = i - r = \angle A'OB$।

প্রতিসরণের সাহায্যে প্রাকৃতিক কয়েকটি ঘটনার ব্যাখ্যা।

(১) জলভরা পাত্রের বা চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়াইয়া খাড়াভাবে জলের নিচের দিকে তাকাও (II-22 ক চিত্র)। তলার P বিন্দু হইতে যে সরু আলোক কিরণ উপরে জলের পিঠে আপতিত হইয়া বায়ুতে প্রতিসরণের পর তোমার চোখে ঢুকিবে তাহা P-র খানিকটা উপরের P' বিন্দু হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইবে। ইহার কারণ ঘনমাধ্যম জল হইতে লঘুমাধ্যম বায়ুতে প্রতিসরণে রশ্মি আপতন বিন্দুস্থ লম্ব হইতে দূরের দিকে সরে, অর্থাৎ আপতন কোণ হইতে প্রতিসরণ কোণ বড় হয়। চোখে প্রবিষ্ট রশ্মিগুলিকে পিছন দিকে বাড়াইয়া দিলে উহা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করে তাহাই লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান বলিয়া মনে হয়। এই কারণে জলের গভীরতা আসলের চেয়ে কম দেখায়। হিসাবে পাওয়া যায় জলের ক্ষেত্রে আপাত গভীরতা আসল গভীরতার তিন চতুর্থাংশ।

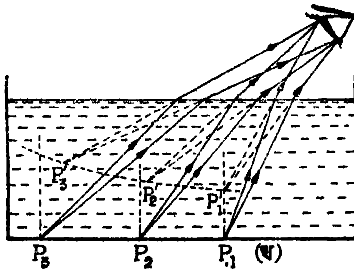


II-22 (ক) চিত্র

ভিতরে বা নিচে ছবি-ওয়ালা কাচের কাগজ-চাপা দেখিয়া থাকিবে। উহার ছবি আসলে দৃষ্টিপথে কাচের পিঠ হইতে যত দূরত্বে আছে, ছবিতে দেখায় তাহার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ দূরত্বে। জল যে কারণে কম গভীর বলিয়া মনে হয়, এখানেও কারণ

তাহাই। ছবি যেখানে আছে বলিয়া মনে হয় আসলে উহা আছে তাহার দেড়গুণ দূরত্বে।

(২) উপরে আলোচিত জলের চৌবাচ্চার দূরের দিকে তাকাইলে চৌবাচ্চার তলা দূরের দিকে ক্রমশ উঁচু বলিয়া মনে হইবে। ইহার কারণ II.22 (খ) চিত্রের সাহায্যে বোঝা যায়। P_1, P_2 ও P_3 বিন্দুগুলি হইতে যে আলোক রশ্মি প্রতিসৃত



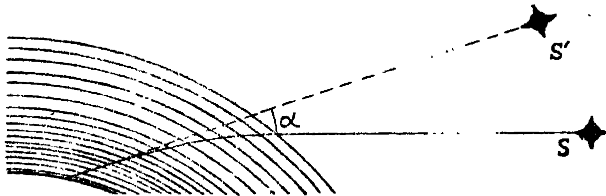
(P_1', P_2' ও P_3' যথাক্রমে P_1, P_2 ও P_3-র আপাত অবস্থান।)

II-22 (খ) চিত্র

হইয়া চোখে আসে, তাহারা যেখান হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয় তাহাই বিন্দু-গুলির আপাত অবস্থান। বেশী দূরের বিন্দু হইতে আসা রশ্মির আপতন কোণ বড় হওয়ায় উহারা বেশী বাঁকে বলিয়া উহাদের ছেদবিন্দু বেশী উপরে ওঠে; এই কারণে চৌবাচ্চার তলা ক্রমশ উঁচু ও একটু অবতল (Concave) বলিয়া মনে হয়।

উপরোক্ত (১) ও (২)-এ বর্ণিত কারণে, সমান গভীর জলে দাঁড়াইয়া থাকিলে পায়ের কাছের জল সব চেয়ে গভীর এবং দূরের জল অগভীর মনে হইবে। সম্পূর্ণ ঘটনাটি আপতন কোণ i-এর সঙ্গে বিচ্যুতি কোণ δ বাড়িবার ফল।

(৩) **বায়ুমণ্ডলে প্রতিসরণ** (Atmospheric refraction)। বায়ুমণ্ডলের নিচের দিকের বায়ুস্তর বেশী ঘন, এবং উপরের দিকে ক্রমশ লঘু। লঘুতর বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক ঘনতর বায়ুর তুলনায় কম। কোন তারা হইতে যে আলো আমাদের



II-23 চিত্র

চোখে আসে তাহা বায়ুমণ্ডলে লঘুতর স্তর হইতে ঘনতর স্তরে প্রতিসৃত হইতে হইতে আসে (II-23 চিত্র)। ইহাতে রশ্মি ক্রমশ আপতন বিন্দুর লম্বের কাছে আসে এবং

একটু বাঁকা পথে চলিয়া আমাদের চোখে পৌছায়। এজন্য তারাটির আপাত অবস্থান S′ আসল অবস্থান S-এর একটু উপরে থাকে, অর্থাৎ তারাটিকে যেখানে দেখা যায় আসলে তারাটি আছে তার চেয়ে একটু নিচে।

জ্যোতিষ্কের এরূপ কৌণিক সরণ (চিত্রের α কোণ) দিক্‌চক্রের (horizon-এর) কাছে সব চেয়ে বেশী। অস্তগামী সূর্য যখন দিক্‌চক্রকে স্পর্শ করিয়াছে দেখি, তখন সূর্য আসলে দিক্‌চক্রের একটু নিচে চলিয়া গিয়াছে। উদীয়মান সূর্যের নিচের দিক্ যখন দিক্‌চক্র রেখায় তখন সূর্য আসলে দিক্‌চক্রের একটু নিচেই আছে। এই কারণে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আপাত সময় আসল সময়ের চেয়ে একটু বেশী হয়। তাছাড়া দিক্‌চক্রের কাছে সূর্যের উপরের প্রান্তের কৌণিক সরণ নিচের প্রান্তের কৌণিক সরণের চেয়ে একটু কম হয় বলিয়া উদয়ে ও অস্তে সূর্যকে একটু চেপটা দেখায় ; পূর্ণিমার চাঁদকেও।

(৪) উষ্ণ বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক শীতল বায়ুর চেয়ে কম। টিনের চালের উপরের বায়ু দুপুরের রৌদ্রে উষ্ণ হইয়া উপরে ওঠে। এই বায়ুর ভিতর দিয়া আসিতে রশ্মির প্রতিসরণ হয়। উষ্ণ বায়ু প্রবাহের আকার ও গতিপথ সম্পূর্ণ স্থির থাকে না। ফলে যে সকল বস্তু হইতে আলোর রশ্মি উহার মধ্য দিয়া আসে তাহাদের একটু কাঁপিতে দেখা যায়। পিচ ঢালা রাস্তা, কংক্রীটের ছাদ প্রভৃতির উপরের বায়ুতেও প্রতিসরণের এরকম ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন। প্রতিসরণ কাহাকে বলে? প্রতিসরণের সময় প্রতিফলনও হয় কি? প্রতিসরণের সূত্র দুটি বল, ও উহাতে ব্যবহৃত বিশেষ কথাগুলির অর্থ বুঝাইয়া বল।

প্রতিসরাঙ্ক কাহাকে বলে? 'কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1·5'—এই উক্তিটি কি কি অর্থ বহন করে?

ঘনতর ও লঘুতর আলোক মাধ্যম বলিতে কি বুঝায়? প্রতিসরণে দুই মাধ্যমের কোন্‌টিতে রশ্মি আপতন বিন্দুস্থ লম্বের বেশী কাছে থাকে?

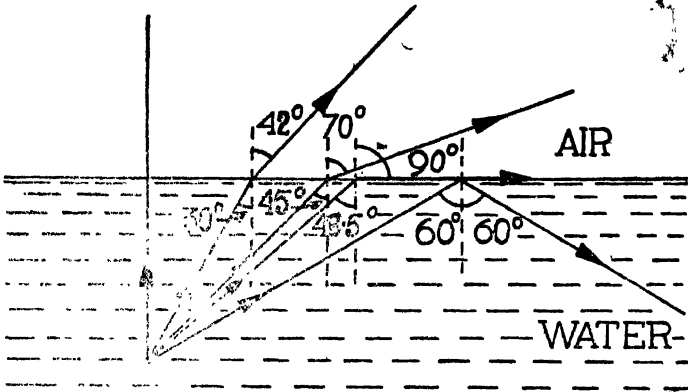
সমতল চৌবাচ্চায় জল থাকিলে দূরের দিকে চৌবাচ্চা ক্রমশ উঁচু ও একটু বাঁকা বলিয়া মনে হয় কেন? সমান গভীর জলে দাঁড়াইলে পায়ের কাছেই জল সব চেয়ে গভীর মনে হয় কেন?

উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্যকে একটু চেপটা দেখায় কেন? সূর্য যখন দিক্‌চক্রে তখন উহা আসলে দিক্‌চক্রের নিচে—একথার তাৎপর্য কি?

প্রতিসরণের সাহায্যে তোমার ইচ্ছামত কোন প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দাও।

II-6. 4. পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Total internal reflection)। মনে কর কোন ঘনতর আলোক মাধ্যমে (যেমন জলে) একটি বিন্দুদীপক আছে এবং উহা হইতে আলোকরশ্মি বাহির হইয়া উপরস্থ লঘুতর আলোক মাধ্যম বায়ুতে প্রতিসৃত হইতেছে (II.24 চিত্র)। বায়ুতে প্রতিসরণ কোণ জলে আপতন

কোণের চেয়ে বড়। আপতন কোণ যত বাড়িতে থাকে $\sin i/\sin r$ = স্থির রাশি বলিয়া r-ও বাড়িতে থাকে। r-এর মান 90°-র চেয়ে বড় হইতে পারে না। ঘন মাধ্যমে যে আপতন কোণে লঘু মাধ্যমে $r = 90^\circ$ হয় তাহাকে 'সংকট কোণ' (Critical angle) বলে। এই কোণ আমরা θ_c (θ গ্রীক অক্ষর, উচ্চারণ 'থিটা') দিয়া বুঝাইব।



11-24 চিত্র

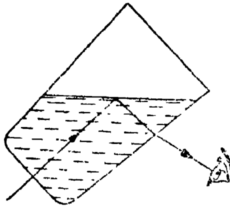
[চিত্রে জল হইতে বায়ুতে প্রতিসরণ দেখান হইয়াছে। বায়ু সাপেক্ষে জলের প্রতিসরাঙ্ক 1·33 জলে 30° আপতন কোণে বায়ুতে প্রতিসরণ কোণ 42°, 45° আপতনে প্রতিসরণ 70°-তে, 48·5° আপতনে প্রতিসরণ 90°-তে। তাহার চেয়ে বড় কোণে, যেমন 60° তে আপতন হইলে সে রশ্মি পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া জলের ভিতরেই ফিরিয়া আসিবে।]

সংকট কোণে ঘনতর মাধ্যমে আপতন হইলে প্রতিসরণ কোণ 90° হইবে বলিয়া প্রতিসৃত রশ্মি দুই মাধ্যমের বিভেদ তল ঘেঁসিয়া বাহির হইবে। আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়েও বড় হইলে কি হইবে? তখন আর প্রতিসরণ সম্ভব হয় না, কারণ r 90°-র চেয়ে বড় হইতে পারে না। এরূপ আপতিত রশ্মি বিভেদতলে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়া ঘন মাধ্যমেই ফিরিয়া আসে; ইহার কোন অংশ লঘুমাধ্যমে প্রবেশ করে না। এই ঘটনাকে **পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন** বা সংক্ষেপে 'পূর্ণ প্রতিফলন' (Total reflection) বলে।

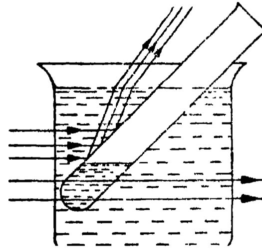
লঘুমাধ্যম সাপেক্ষে ঘন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক n হইলে $\sin 90^\circ/\sin \theta_c = n$ বা $\sin \theta_c = 1/n$ হইবে। দেখা যায় সংকটকোণ θ_c-র মান n-এর উপর নির্ভর করে। n নির্ভর করে মাধ্যম দুটির প্রকৃতি ও আপতিত আলোর রঙের উপর। সংকটকোণও এগুলির উপর নির্ভর করে। রঙের ক্রিয়া এখন আমরা উপেক্ষা করিব বলিয়াছি। অতএব θ_c মাধ্যমের প্রকৃতি দিয়া নির্ধারিত হইবে। জল হইতে বায়ুতে প্রতিসরণে

সংকট কোণ প্রায় 48·5°। কাচ হইতে বায়ুতে θ_c = প্রায় 42° কাচ হইতে জলে প্রতিসরণে θ_c প্রায় 63°।

কয়েকটি উদাহরণ। (১) একটি ধাতব বলের গায়ে কেরোসিন শিখা হইতে মোটা করিয়া ভুসা জমিতে দাও। বলটি জলে ডুবাইয়া উজ্জ্বল, বিক্ষিপ্ত আলোয় রাখিলে বলের গা রূপার মত ঝকঝক করিতে দেখা যাইবে। বলের গায়ে জমা ভুসার ফাঁকে ফাঁকে বায়ুকণাও বদ্ধ হইয়াছে। জল হইতে এই বায়ুকণাগুলিতে পূর্ণ প্রতিফলন ঘটায় বল ঝকমক করে।



II 25 চিত্র



II-26 চিত্র

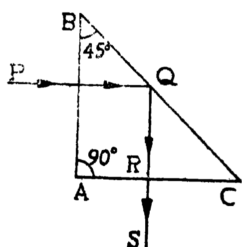
(২) তলা সমতল এমন একটি কাচের গেলাসে খানিকটা জল নিয়া গেলাসটি চোখের কিছু উপরে তুলিয়া আস্তে আস্তে কাত করিলে (II. 25 চিত্র) এক সময়ে জলতল উজ্জ্বল দেখাইবে। তলা দিয়া আসা আলো জলতলে পূর্ণ প্রতিফলিত হওয়ায় জলতল উজ্জ্বল দেখায়। গেলাসের তলায় অবস্থিত বস্তু জলতলে প্রতিফলিত হয়। গেলাসে একখানা চামচ ডুবান থাকিলে পূর্ণ প্রতিফলনের সময় চামচের যে অংশ জলের বাহিরে থাকে তাহা দেখা যায় না।

(৩) ঘরের ভিতরে একটি কাচের পাত্রে জল ভরিয়া এক মুখ বন্ধ ফাঁপা একটি কাচের নল তেরছা করিয়া জলে ডুবাও (II.26 চিত্র)। বাহির হইতে আয়নার সাহায্যে সূর্যের আলো পাত্রে ফেল। এখন উপর হইতে নলের ডুবান অংশের দিকে তাকাইলে নলের গায়ে লম্বালম্বি একটা অংশ রূপালি রেখার মত ঝকঝক করিতেছে দেখিতে পাইবে। নল যথেষ্ট তেরছা থাকিলে জলের ভিতর নলের গায়ে সূর্যের আলোর আপতন কোণ সংকট কোণ 48·5°-র চেয়ে বড় হইবে, এবং সে আলো নলের ভিতরের বায়ুতে প্রতিসৃত না হইয়া পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া উপরের দিক্ দিয়া বাহির হইবে। এই কারণে নলের গায়ে লম্বা রূপালি রেখা দেখা যাইবে। নলে জল ভরিলে জল হইতে নলের বায়ুতে প্রতিসরণের কোন প্রশ্ন থাকিবে না, এবং সূর্যের আলো পাত্র ও নল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে। রূপালি রেখা পাইতে নলটি একটু নাড়াচাড়া

করিয়া ঠিক অবস্থায় আনিতে হইবে এবং রেখাটি খুঁজিতে তোমার চোখও একটু এদিক ওদিক সরাইতে হইতে পারে।

(৪) তেশিরা কাচ বা প্রিজ্‌ম্ (Prism) কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবে। ইহা তে-কোনা একখণ্ড কাচ এবং ইহার তিনটি শির বা ধার তিনটি সমতলের ছেদরখা। সাধারণ প্রিজ্‌মে সমতলগুলি পরস্পরের সঙ্গে 60° কোণে থাকে। উপর হইতে প্রিজ্‌মের দিকে তাকাইলে উহার উপরটা সমবাহু ত্রিভুজের মত দেখায়। ইহাকে 60°-প্রিজ্‌ম্ বলে।

কিন্তু একরকম প্রিজ্‌ম্ বানান হয় যাহার সমতলগুলির মধ্যে এক কোণ সমকোণ ও অন্য কোণ দুইটি 45°। উপর দিক হইতে তাকাইলে ইহাকে দেখিতে সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মত দেখায় (II.·27 চিত্র)। সমবাহু বিশিষ্ট যে কোন তলের অভিলম্বে যে আলোক রশ্মি পড়ে তাহা সোজা প্রিজ্‌মে ঢুকিয়া অতিভুজ-তলে 45° কোণে আপতিত হয়। এই রশ্মি অতিভুজ তল দিয়া বাহিরে যাইতে পারে না, কারণ আপতন কোণ (45°) কাচ হইতে বায়ুতে প্রতিসরণের সংকট কোণের (প্রায় 42°) চেয়ে বড। এজন্য রশ্মি সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া অন্য বাহুর তলে লম্বভাবে আপতিত হইয়া সোজা বাহির হইয়া যায়। অতিভুজ-তল আয়নার মত কাজ করে। সাধারণ আয়নায় যতটা প্রতিফলন হয় এই প্রিজ্‌মের অতিভুজ-তলে প্রতিফলন হয় তাহার চেয়ে বেশী। তাই প্রতিবিম্বও বেশী উজ্জ্বল হয়।

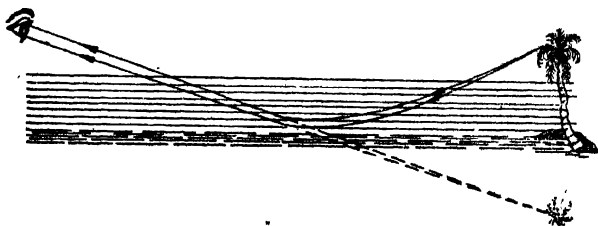


II-27 চিত্র

এই প্রিজ্‌ম্‌কে পূর্ণ প্রতিফলক প্রিজ্‌ম্ (Total reflection prism) বলে। নানা আলোক যন্ত্রে ইহা ব্যবহৃত হয়।

পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সাহায্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা। (1) বায়ুসাপেক্ষে হীরার (diamond) প্রতিসরাঙ্ক 2·4। এজন্য হীরা হইতে বায়ুতে প্রতিসরণের সংকট কোণ হয় প্রায় 24·5°। হীরার পল (face)-গুলি এমনভাবে কাটা হয় যে বিভিন্ন পল দিয়া প্রবিষ্ট আলো অত ছোট সংকট কোণের জন্য হীরার ভিতরেই বার বার পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া শেষ পর্যন্ত মাত্র দু একটি পল দিয়া বাহির হয়। ইহাতে ঐ পলগুলি হইতে আলো ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে মনে হয় এবং হীরাকে খুব উজ্জ্বল দেখায়। বাহিরের আলো অল্প হইলেও এই ঘটনা ঘটে। নানা দিক দিয়া প্রবিষ্ট আলো পূর্ণ প্রতিফলনে ভিতরেই থাকে, এবং বাহির হইবার সময় অল্প জায়গা দিয়া বাহির হওয়ায় ঔজ্জ্বল্য বেশী মনে হয়।

(2) মরীচিকা (Mirage)। মরীচিকা একরকম দৃষ্টি-বিভ্রম। ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু উষ্ণ ও উহার উপরে বায়ুর উষ্ণতা উচ্চতার সঙ্গে দ্রুত হারে কমিতে থাকিলে মরীচিকা সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা হয়। মরুভূমিতে দিনের বেলা বালুরাশি সূর্যকিরণে উত্তপ্ত হয়। হাওয়া না থাকিলে ইহাতে বায়ুর বিভিন্নস্তর উপরের দিকের চেয়ে নিচের দিকে উষ্ণ থাকে বেশী। বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে কমে। এ অবস্থায় প্রতিসরাঙ্ক উপরের স্তরে বেশী ও তাহার নিচের স্তরে কম। ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য ধরা যাক সমান উষ্ণ স্তরগুলি অনুভূমিক (II. 28 চিত্র)। মেঘ বা গাছের মাথার মত দূরস্থ কোন বস্তু হইতে যে রশ্মি নিচের দিকে যায় তাহারা ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করে। ইহাতে রশ্মির প্রতিসরণ কোণ একটু একটু করিয়া



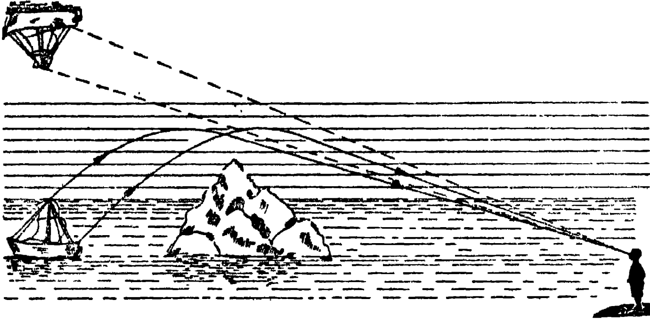
II-28 চিত্র

বাড়িতে থাকে এবং রশ্মি ক্রমশ অনুভূমিক হইতে থাকে। তাহার পর কোন এক স্তরে রশ্মির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়া উহা আবার উপরের দিকে বাঁকিতে থাকে। এই রশ্মি কোন দর্শকের চোখে পড়িলে তিনি রশ্মি সোজা পথে আসিতেছে মনে করিয়া মেঘ বা গাছের মাথা নিচের দিকে দেখিতে পাইবেন। তাঁহার মনে হইবে তিনি যাহা দেখিতেছেন তাহা জলতলে প্রতিফলিত বিম্ব। যেখানে জল নাই, সেখানে জল আছে তাঁহার এই বিভ্রম হইবে ; ইহাই মরীচিকা। খোলা জায়গায় জলতল বায়ুতে একটু কাঁপে ; ইহাতে জলে প্রতিফলিত বিম্বও কাঁপে। বালির সংস্পর্শে থাকা উষ্ণবায়ু একটু কাঁপিয়া কাঁপিয়া উপরে ওঠে বলিয়া ঐ বায়ুর ভিতর দিয়া আসা রশ্মিতে গঠিত বিম্বও একটু কাঁপে। ইহাতে দর্শকের বিভ্রম আরও বাস্তব বলিয়া মনে হয়।

পিচ-ঢালা চওড়া রাস্তায় বৃষ্টির পর হঠাৎ গরমে কখন কখন এরকম মরীচিকা দেখা যায়।

বরফের রাজ্যে আর একরকম মরীচিকা হইতে পারে। এক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের বায়ু খুব ঠাণ্ডা ও উপরের বায়ু ক্রমে বেশী উষ্ণ হইতে হইবে। নিচের বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক বেশী, উপরে কম। খুব ঠাণ্ডা সমুদ্রে জাহাজ হইতে যে রশ্মি উপরের দিকে যায় তাহা ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করে। আগের মত এই রশ্মিও বাঁকে.

(II-29 চিত্র), কিন্তু বিপরীত দিকে, এবং কোথাও ইহার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিতে পারে। এরূপ রশ্মি কোন দর্শকের চোখে পড়িলে তিনি জাহাজের প্রতিবিম্ব আকাশে দেখিতে পাইবেন।



II-29 চিত্র

মরুভূমির মরীচিকাকে আমরা নিম্ন মরীচিকা (Inferior mirage) এবং পরে বর্ণিত মরীচিকাকে উর্ধ্ব মরীচিকা (Superior mirage) বলি।

প্রশ্ন। পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কাহাকে বলে? উহা ব্যাখ্যা কর। সংকট কোণ কি? সংকট কোণের সঙ্গে ঘনতর মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের কি সম্পর্ক? কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1·5 ধরিয়া কাচ হইতে বায়ুতে সংকট কোণের মান জ্যামিতিক উপায়ে বাহির কর।

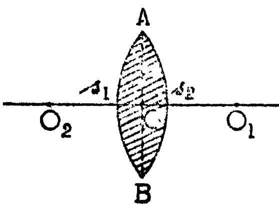
(সমাধানের আভাস—3 ইঞ্চি ব্যাসের একটি অর্ধবৃত্ত আঁক। এই ব্যাসকে অতিভুজ করিয়া এক বাহু দুই ইঞ্চি বিশিষ্ট একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁক।)

অতিভুজ ও তৃতীয় বাহুর মধ্যবর্তী কোণ নির্ণেয় সংকট কোণ। (কেন বলিতে পার?) চাঁদা দিয়া কোণ মাপ। কোণ প্রায় 42° হইবে।

পূর্ণ প্রতিফলনের একটি উদাহরণ দাও।

মরুভূমিতে মরীচিকা সৃষ্টি কি ভাবে হয়?

II-6.5. লেন্‌স্ (Lens)। ক্যামেরার লেন্‌সের সঙ্গে তোমাদের অনেকের পরিচয় আছে। লেন্‌স্ কি রকম বস্তু? একখণ্ড কাচের দুপাশকে যদি গোলক-তলের (spherical surface) আকার দাও তাহা হইলে উহাকেই লেন্‌স্ বলিব। II. 30 চিত্র দেখ। ছবির s_1 ও s_2 বক্ররেখা দুইটি বৃত্তচাপ। s_1 চাপের কেন্দ্র O_1 এবং s_2 চাপের কেন্দ্র O_2। O_1O_2 রেখাকে অক্ষ করিয়া ছবিটি যদি এক পাক ঘুরাইয়া দাও তাহা হইলে s_1, s_2 রেখা দুইটি খানিকটা জায়গা ঘেরিয়া রাখিবে। এই রকম বদ্ধ আয়তনের রূপই হইল লেন্‌সের রূপ। ছবির ছায়া করা অংশ যেন কাচ, অর্থাৎ বদ্ধ আয়তন কাচের।

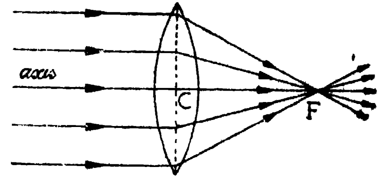


II-30 চিত্র

লেন্‌স্ নানারকমের হইতে পারে; চশমার লেন্‌সে ইহার পরিচয় পাও। কাচ ছাড়া অন্য স্বচ্ছ পদার্থ দিয়াও লেন্‌স্ গঠিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা কেবল পেট মোটা, পাশ সরু লেন্‌সের কথাই আলোচনা করিব; ইহাকে 'উত্তল' (convex) বা 'অভিসারী' (convergent) লেন্‌স্ বলে। II-30 চিত্রে এই রকম লেন্‌স্ই বুঝান হইয়াছে। চিত্র লেন্‌সের মধ্যচ্ছেদ (principal section)। লেন্‌স্ বুঝাইতে সাধারণত উহার মধ্যচ্ছেদই আঁকা হয়। $O_1 O_2$ রেখা লেন্‌সের অক্ষ (axis)। লেন্‌সের কিনারা বৃত্তাকার এবং AB উহার ব্যাস। ABকে লেন্‌সের 'উন্মেষ' (aperture) বলে। সুবিধার জন্য আমরা লেন্‌সের উভয় পিঠের ব্যাস সমান ধরিব। AB রেখা $O_1 O_2$ অক্ষকে C বিন্দুতে ছেদ করে। C বিন্দুকে আমরা লেন্‌সের 'আলোক কেন্দ্র' (optical centre) বলিব।

এখানে আমরা লেন্‌সের দুই রকম ক্রিয়া আলোচনা করিব—(ক) আলো ঘনীভূত করণ ও (খ) বিম্বগঠন।

(ক) আলো ঘনীভূত করণ (Focusing action of a lens)। মনে কর লেন্‌সের অক্ষের সমান্তরালে আলোর কিরণ আসিয়া লেন্‌সে পড়িল। কিরণের প্রত্যেক রশ্মি লেন্‌সের দুই বক্রতলে পর পর প্রতিসৃত হইয়া প্রতিসরণের নিয়ম অনুসারে অক্ষের দিকে বাঁকিবে এবং কিরণের সকল রশ্মি কার্যত অক্ষের একই বিন্দুতে সংহত হইবে (II-31 চিত্র)।



II-31 চিত্র

লেন্‌সে প্রতিসরণের পর অক্ষের যে বিন্দুতে অক্ষের সমান্তরাল কিরণের সব রশ্মিগুলি কার্যত সংহত হয়, তাহাকে লেন্‌সের **ফোকস** (Focus) বলে (II-31 চিত্রের F)। লেন্‌সের আলোক কেন্দ্র C হইতে ফোকসের দূরত্বকে লেন্‌সের **ফোকস্-দূরত্ব** (Focal length; চিত্রের CF) বলে। আলোর আপতন লেন্‌সের যে পিঠেই হউক না কেন, উহার ফোকস-দূরত্ব একই। অতএব লেন্‌সের দু পাশে লেন্‌স্ হইতে সমান দূরে দুটি ফোকস থাকে। ফোকস-দূরত্ব লেন্‌সের দুই পিঠের ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে। ব্যাসার্ধ কম হইলে ফোকস-দূরত্বও কম হয়। তাছাড়া ফোকস-দূরত্ব লেন্‌স্ পদার্থের প্রতিসরাঙ্কের উপরও নির্ভর করে। প্রতিসরাঙ্ক বড় হইলে ফোকস-দূরত্ব কম হয়।

এ ক্ষেত্রে দেখিতে পাইলাম উত্তল লেন্‌সের ক্রিয়া হইল আপতিত কিরণকে ঘনীভূত করা। ফোকসের চেয়ে আরও দূরে অবস্থিত যে কোন বিন্দু দীপক হইতে আপতিত

আলোকেও লেন্‌স্ এক বিন্দুতে সংহত করিতে পারে। আতসী কাচ উত্তল লেন্‌স্। সূর্যকিরণকে ঘনীভূত করিয়া কাচ আলোকে অল্প জায়গায় আবদ্ধ করায় সেখানে উষ্ণতা বাড়ে বলিয়াই আতসী কাচ দিয়া আগুন ধরান যায়। লেন্‌সের উন্মেষ বড় হইলে লেন্‌সে বেশী আলো ধরা পড়ে এবং ফোকসে ঔজ্জ্বল্য ও উষ্ণতা বাড়ে।

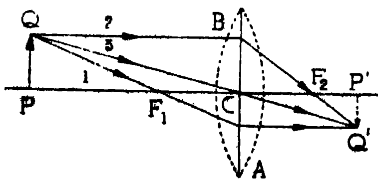
(খ) বিম্ব গঠন (Formation of image by a lens)। ক্যামেরার কাজ সকলেই জান ; উহা দৃশ্য বস্তুর বিম্ব গঠন করে। ইহা লেন্‌সেরই ক্রিয়া। এই ক্রিয়া বুঝিতে হইলে কোন লক্ষ্য বিন্দু (Object point) হইতে আপতিত বিশেষ তিনটি রশ্মির আচরণ জানিলেই চলে। এই তিনটি রশ্মির যে কোন দুইটির সাহায্যে লেন্‌সে গঠিত বিম্বের অবস্থান ও আকার জানা যায়। রশ্মি তিনটির ধর্ম নিচে বলা হইল।

(১) এক ফোকস (F_1) হইতে আগত বা আসিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে এমন কোন রশ্মি লেন্‌সে পড়িলে প্রতিসরণের পর উহা অক্ষের সমান্তরালে যায়।

(২) অক্ষের সমান্তরালে কোন রশ্মি আসিয়া লেন্‌সে পড়িলে উহা প্রতিসরণের পর অন্য (বিপরীত দিকের) ফোকস (F_2) দিয়া যায়।

(৩) লেন্‌সের আলোক কেন্দ্র দিয়া যে রশ্মি যায়, প্রতিসরণে তাহার গতিপথ বদলায় না।

লেন্‌সের যে কোন ক্রিয়া বুঝাইতে আমরা উহার মধ্যচ্ছেদ আঁকি, অক্ষ দেখাই ও দরকার মত রশ্মি টানি। তা ছাড়া, আঁকার সুবিধার জন্য উভয় তলে প্রতিসরণ না দেখাইয়া, দুই প্রতিসরণে রশ্মির মোট বিচ্যুতি (Deviation) লেন্‌সের মধ্যরেখায় দেখান হয়। মধ্য রেখা বলিতে II-30 বা II-32 চিত্রের AB রেখা, অর্থাৎ আলোক কেন্দ্রে অক্ষের অভিলম্ব রেখা বুঝিবে। লেন্‌সের আকার ও অবস্থান বুঝাইতে আমরা উহার দু পাশ ভাঙা রেখায় দেখাইব।

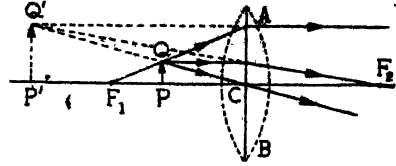


II-32 চিত্র

এই নিয়ম মানিয়া উপরে বলা (১), (২), (৩) রশ্মি তিনটির পথ II-32 চিত্রে দেখান হইয়াছে। চিত্রে F_1, F_2 দুটি ফোকস, C আলোক কেন্দ্র, AB মধ্যরেখা এবং 1, 2, 3 যথাক্রমে (১), (২) ও (৩)-এ বর্ণিত রশ্মি।

লক্ষ্যবস্তুর বিম্বের অবস্থান পাইতে উহার এক প্রান্ত আমরা লেন্‌সের অক্ষে ও অন্যপ্রান্ত অক্ষের অভিলম্বে আছে বলিয়া ধরিব (II-32 চিত্র)। লক্ষ্যের মাথা (Q) হইতে উপরে বর্ণিত যে কোন দুটি রশ্মি টানিলে উহারা প্রতিসরণের পর যেখানে (Q')

ছেদ করিবে তাহাই লক্ষ্যের মাথার বিম্ব। এরূপ বিম্বকে 'বাস্তব' বা 'সৎ' বিম্ব (Real image) বলে (II-32 চিত্র)। কখনও এমন হয় যে রশ্মি দুটি প্রতিসরণের পর ছেদ করে না। তখন প্রতিসৃত রশ্মি দুটিকে পিছনে বর্ধিত করিলে উহারা যে বিন্দুতে ছেদ করে, তাহাকেই লক্ষ্যবস্তুর মাথার বিম্ব বলিয়া মনে হইবে। এরূপ বিম্বকে 'অলীক' বা 'অসৎ' বিম্ব (virtual image) বলে (II-33 চিত্র)। লক্ষ্যবস্তু লেন্স্ ও উহার ফোকসের মধ্যে থাকিলে অলীক বিম্ব গঠিত হয় এবং লক্ষ্যবস্তু লেন্সের যে পাশে থাকে অলীক বিম্ব সেই পাশেই গঠিত হয়।



II-33 চিত্র

প্রশ্ন। (১) উত্তল লেন্স্ কাহাকে বলে? উহা কিভাবে আলো ঘনীভূত করে বুঝাইয়া বল। লেন্সের ফোকস ও ফোকস-দূরত্ব বলিতে কি বুঝায়?

(২) লেন্সের সাহায্যে লক্ষ্যবস্তুর বিম্ব কিভাবে গঠিত হয় ছবি আঁকিয়া দেখাও। বিম্বের অবস্থান পাইতে যে রশ্মি টানিলে তাহার ধর্ম কি বল।

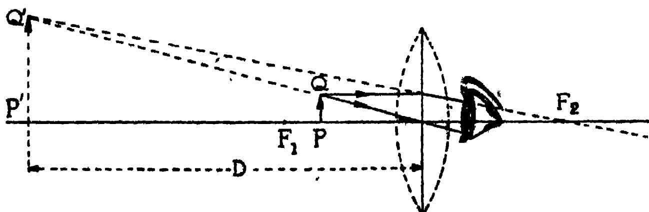
সৎ ও অসৎ বিম্ব কাহাদের বলে?

II-6.6. উত্তল লেন্স্‌কে বিবর্ধক কাচ রূপে ব্যবহার (Convex lens as a magnifying glass)। কোন বস্তু আমাদের চোখে যে কোণ উৎপন্ন করে তাহার মান অনুসারে বস্তুটিকে আমরা আকারে ছোট বা বড় বলিয়া মনে করি। কোণ বড় হইলে আকারও বড় মনে হয়। একই বস্তু দূরে থাকিলে ছোট দেখায়, কাছে আসিলে বড় দেখায়। দূরে থাকিলে চোখে উৎপন্ন কোণ ছোট; কাছে আসিলে কোণ বড়। যে বস্তু এমনিতেই ছোট তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে উহাকে আমরা চোখের কাছে আনি, কারণ কাছে আনিলে উৎপন্ন কোণ বড় হয়, এবং বস্তুটি বড় ও স্পষ্ট দেখায়।

চোখের বেশী কাছে আনিলে উৎপন্ন কোণ বড় হইলেও বস্তুটিকে স্পষ্ট দেখায় না। চোখ হইতে যে দূরত্বে থাকিলে ছোট জিনিস যথাসম্ভব স্পষ্ট দেখা যায় তাহাকে 'স্পষ্ট দর্শনের অবম দূরত্ব' (Least distance of distinct vision) বলে। সুস্থ ও স্বাভাবিক চোখের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব 25 সেন্টিমিটার ধরা হয়। এই অংশের আলোচনায় এই দূরত্বকে আমরা D অক্ষর দিয়া বুঝাইব। লক্ষ্য করিয়া দেখিও বই পড়ার সময় বই সাধারণত তোমার চোখ হইতে প্রায় এই রকম দূরত্বেই থাকে। বিভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে D কিছু বিভিন্ন হয়, এবং বেশী বয়সে ইহার মান বাড়ে। কিন্তু আমরা এই বিভিন্নতা হিসাবে না লইয়া D=25 সেমি ধরিব।

অনেক সময় খুব ছোট লেখা বা কোন বস্তুর ছোট অংশ (যেমন উদ্ভিদ্‌ বিদ্যায় ছোট ফুলের বিভিন্ন অংশ বা প্রাণীবিদ্যায় কোন পোকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) আমাদের

যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া দেখা দরকার হয়। স্পষ্ট দর্শনের অবম দূরত্বে আনিয়াও প্রয়োজনীয় কাজ না হইতে পারে। তখন হ্রস্ব ফোকস উত্তল লেন্সের সাহায্যে উহাকে আমরা আরও বড় করিয়া দেখিতে পারি। ইহার জন্য বস্তুটিকে লেন্স্ হইতে লেন্সের ফোকস-দূরত্বের চেয়ে আর একটু কাছে রাখিয়া লেন্সের মধ্য দিয়া অক্ষ



II-34 চিত্র

বরাবর উহা দেখিতে হয়। এই অবস্থায় বস্তুটির অলীক বিম্ব গঠিত হইবে। লেন্স্ একটু আগাইয়া পিছাইয়া আমরা এই অলীক বিম্ব লেন্স্ হইতে স্পষ্ট দর্শনের অবম দূরত্বে গঠন করিতে পারি (II-34 চিত্র)। ইহাতে বস্তুটি সবচেয়ে স্পষ্ট দেখায়। ছবি আঁকার উপায় আগেই বলা হইয়াছে। বিম্ব বস্তুটির চেয়ে আকারে বড় হয়। এবং D দূরত্বে থাকিলে বস্তুটি চোখে যে কোণ (α) উৎপন্ন করিত, বিম্ব তাহার চেয়ে বড় কোণ (β) উৎপন্ন করে। এই কারণে বস্তুটিকে বড় এবং স্পষ্ট দেখায়। লেন্সের ফোকস-দূরত্ব f হইলে, β-কোণের সহিত α-কোণের অনুপাত $=\beta/\alpha=1+D/f$ হয়। এইভাবে ব্যবহৃত লেন্সকে 'বিবর্ধক লেন্স্' (Magnifying glass বা Magnifying lens) বলে ; $1+D/f$ উহার 'বিবর্ধন' (Magnification)। দেখা যায় f যত ছোট হইবে বিবর্ধন তত বাড়িবে। কম ফোকস-দূরত্বের লেন্সে বেশী বিবর্ধন হয়। লেন্স্ বুঝিয়া বিবর্ধন $8-10$ হইতে পারে।

লক্ষ্যবস্তু লেন্সের ফোকসে রাখিয়াও বিবর্ধন পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বিম্ব আরও দূরে গঠিত হয়, কিন্তু চোখে উৎপন্ন দুই কোণের অনুপাত হয় D/f ; ইহাই বিবর্ধন।

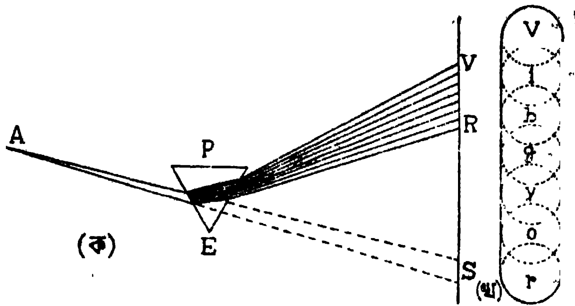
প্রশ্ন। উত্তল লেন্সের সাহায্যে ছোট জিনিস কিভাবে বড় করিয়া দেখা যায় ছবি আঁকিয়া দেখাও। অঙ্কন ব্যাখ্যা কর।

বিম্ব সৎ কি অসৎ ? এইভাবে ব্যবহৃত লেন্সের বিবর্ধন বলিতে কি বুঝায় ? বিবর্ধনের সঙ্গে লেন্সের ফোকস-দূরত্বের কিরূপ সম্পর্ক ?

স্পষ্ট দর্শনের অবম দূরত্ব কাহাকে বলে ? উহা কত ধরা হয় ?

II-6.7. আলোর বিচ্ছুরণ: বর্ণালি (Dispersion of light—Spectrum)। সূর্যের আলো বিভিন্ন রঙের সমষ্টি তাহা 1676 খ্রীষ্টাব্দে নিউটনই

প্রথম দেখান। এ সংক্রান্ত মূল বিষয়টি আমরা তাঁহার পরীক্ষার সাহায্যেই বর্ণনা করিব। জানালার অনচ্ছ পর্দার ছোট একটি ছেঁদা (II-35 (ক) চিত্রের A) দিয়া অন্ধকার ঘরে সরু সূর্যকিরণ আসিতে দিয়া তিনি তাহাকে একটা সাদা পর্দার উপর পড়িতে দেন। ইহাতে পর্দার উপর পিন্-হোল্ (Pin-hole) ক্যামেরার মত ক্রিয়ায় সূর্যের গোলমত একটি বিম্ব গঠিত হয় (II-35 (ক) চিত্রের S)। একটু ধোঁয়ার



II-35 চিত্র

সাহায্য নিলে AS কিরণের পথ স্পষ্ট এবং সাদা দেখায়। একখানা 60° কোণের তেশিরা কাচ (Prism) P-র এক শির E নিচের দিকে রাখিয়া উহা AS কিরণের পথে ধরিলে আলোক কিরণ প্রিজ্‌মের দুই পিঠে পর পর প্রতিসৃত হইয়া S-এ না গিয়া পর্দায় S-এর অবস্থানের কিছু উপরে রঙীন আলোর পটি RV গঠন করিবে। ইহা লম্বায় S-এর চেয়ে বেশ বড়, কিন্তু চওড়ায় প্রায় সমান। নিউটন মনে করেন সূর্যের আলো নানা রঙের সমষ্টি এবং রঙীন RV পটি এই সকল বিভিন্ন রঙে গঠিত সূর্যের বিম্ব। বিভিন্ন রঙের বিম্বগুলি সম্পূর্ণ আলাদা না হইয়া আংশিক মিশিয়া গিয়া RV পটির সৃষ্টি করিয়াছে। II-35 (খ) চিত্রে ইহা বড় করিয়া দেখান হইয়াছে।

পর্দার RV অংশের কোথাও আর একটি ছেঁদা করিলে সেই ছেঁদা দিয়া যে রঙীন কিরণ বাহির হইয়া যায়, দ্বিতীয় কোন প্রিজ্‌মে তাহাকে প্রতিসৃত করিলে ছেঁদা যেখানে ছিল সেখানকার রং ছাড়া আর কোন রং পাওয়া যায় না।

এখানে প্রতিসরণের সাহায্যে সাদা আলোকে বিভিন্ন রঙে বিশ্লিষ্ট করা গেল। এরূপ ঘটনাকে আলোর 'বিচ্ছুরণ' (Dispersion) বলে। বিচ্ছুরণে রঙীন আলোর যে পটি গঠিত হয় তাহাকে আপতিত আলোর **বর্ণালি (Spectrum)** বলে। সূর্যের আলোর বর্ণালিতে আমরা সাধারণত সাতটি রং আছে বলিয়া ধরি। উহারা হইল বেগনি (Violet) নীল (Indigo), আসমানি (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow), কমলা (Orange) ও লাল (Red)। ইহাদের মধ্যে বেগনি আলো

প্রতিসরণে যাঁকে সব চেয়ে বেশী, ও অন্যগুলি ক্রমান্বয়ে কম। বেগনির প্রতিসরাঙ্ক বেশী, অন্যগুলির ক্রমান্বয়ে কম। বেগনি থাকে প্রিজ্‌মের ভূমির দিকে ও লাল থাকে প্রিজ্‌মের শীর্ষের দিকে। II-35 চিত্রের VR-কে আমরা সূর্যের আলোর বিভিন্ন রঙে গঠিত A ছিদ্রের বিম্বও মনে করিতে পারি। সংক্ষেপে এই বর্ণালিকে 'বেনীআসহকলা' বা VIBGYOR বলে। সাতরঙের আদ্যক্ষর লইয়া কথা দুইটি গঠিত।

সকল দীপকেরই বর্ণালি আছে। বর্ণালির সাহায্যে দীপক সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য জানিতে পারা যায়। যে কোন ভাস্বর বস্তুর বর্ণালি মোটামুটি আগে বলা সূর্যের বর্ণালির মত। তবে বর্ণালির বেগনি দিকের আলো কতটা পাওয়া যাইবে তাহা দীপকের উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। উষ্ণতা বাড়িলে বেগনি দিকের আলো বেশী পাওয়া যায়।

মৌলিক পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থার বর্ণালি উহার বৈশিষ্ট্যসূচক। বিভিন্ন মৌলের বর্ণালিতে বিশেষ কয়েকটি রং পাওয়া যায়; উহাদের রেখা বর্ণালি (line spectrum) বলে এবং উহারা আসে মৌলের পরমাণু হইতে। সূর্য ও তারার বর্ণালিতে অবিচ্ছিন্ন বর্ণালির (continuous spectrum-এর) সঙ্গে এই রেখা বর্ণালিগুলিও পাওয়া যায়। ইহাতে সূর্য বা তারায় কি কি মৌল আছে তাহা জানা যায়। সূর্যে আমাদের চেনা মৌলের পঞ্চাশটির বেশীর অস্তিত্ব আমরা সূর্যের বর্ণালি পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছি। ইহা ছাড়া আরও অনেক তথ্য রেখা-বর্ণালির সাহায্যে জানা যায়।

বিচ্ছুরণ ও বর্ণালি সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা পাইলে। এবার উহাদের মোটামুটি একটা সংজ্ঞা আমরা দিতে পারি। প্রতিসরণে (বা অন্য কোন উপায়ে) কোন দীপকের আলোকে ঐ আলোর উপাদানভূত বিভিন্ন রঙে বিশ্লিষ্ট করিয়া বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত করাকে **বিচ্ছুরণ** (Dispersion) বলে। দীপকের বিভিন্ন রঙের বিচ্ছুরিত আলো দিয়া গঠিত বিম্বসমষ্টিকে ঐ দীপকের **বর্ণালি** (Spectrum) বলে। (প্রতিসরণ ছাড়া অন্য উপায়ে বিচ্ছুরণ আমাদের আলোচনার বাহিরে।)

প্রশ্ন। সূর্যের বর্ণালি দেখাইবার একটি উপায় বর্ণনা কর। বর্ণালি ও বিচ্ছুরণের সংজ্ঞা দাও। VIBGYOR বলিতে কি বুঝায়?

বর্ণালি হইতে দীপক সম্বন্ধে আমরা কি তথ্য জানিতে পারি তাহার দুএকটি উদাহরণ দাও। কোন্ রঙের প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে বেশী?

তৃতীয় অংশ
রসায়ন

III-1. পদার্থ পরিচয়।

এই বইয়ের প্রথম অংশে তোমরা পদার্থ ও শক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা পড়িয়াছ। পদার্থ বহু প্রকারের হইলেও রসায়ন পড়িয়া ক্রমশ জানিতে পারিবে পদার্থ যে রকমেরই হউক, উহা মাত্র অল্প সংখ্যক মৌলিক পদার্থে গঠিত।

পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নে আমরা পদার্থের গঠন, ধর্ম ও পরিবর্তনের কথা আলোচনা করি। দুই-এ কি প্রভেদ? যে পরিবর্তনে পদার্থের উপাদানের পরিবর্তন ঘটে সাধারণত তাহাকেই রসায়নের অন্তর্গত মনে করা হয়। এ রকম পরিবর্তনকে **রাসায়নিক পরিবর্তন** (chemical change) বলে। যে পরিবর্তনে পদার্থের উপাদানের কোন পরিবর্তন ঘটে না সাধারণত তাহাই পদার্থ-বিদ্যার আলোচ্য। পদার্থ-বিদ্যার আর এক নাম 'ভৌতিকী'। এজন্য এরূপ পরিবর্তনকে আমরা **ভৌত পরিবর্তন** (physical change) বলিব। ভৌত ধর্ম, রাসায়নিক ধর্ম কথাগুলি ঐ দুই প্রকার পরিবর্তন সংক্রান্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বিশুদ্ধ পদার্থ (Pure Substance)।

রসায়নে আমরা প্রধানত 'বিশুদ্ধ' পদার্থ লইয়া আলোচনা করি। অতএব বিশুদ্ধ পদার্থ কাহাকে বলে তাহা পরিষ্কার বোঝা দরকার। যে পদার্থে একটি মাত্র উপাদান আছে তাহাই বিশুদ্ধ পদার্থ। উপাদানটি মৌলিক যেমন, গন্ধক, লোহা, অক্সিজেন ইত্যাদি, বা যৌগিক যেমন, জল, কোহল, সোডিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি হইতে পারে।

সর্বাংশ দেখিতে একরকম হইলেই পদার্থ বিশুদ্ধ তাহা বলা যায় না। ভাল করিয়া মেশান চিনির দ্রবণের সর্বাংশ দেখিতে একইরকম। তাই বলিয়া উহা বিশুদ্ধ নয়। স্বাদ নিলেই টের পাইবে উহা শুধু জল নয়, উহাতে চিনিও আছে। নুনের দ্রবণ সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। সর্বাংশ একই রকম হইলে সে প্রকার পদার্থকে **সমসত্ত্ব** (Homogeneous) বলে। উহা বিশুদ্ধ হইতেও পারে, নাও পারে। একমাত্র মৌলিক বা যৌগিক পদার্থই বিশুদ্ধ ও সমসত্ত্ব। কিন্তু অন্য সমসত্ত্ব পদার্থ বিশুদ্ধ নয়। কেবল স্বাদ নিয়া বা অন্য কোন সহজ উপায়ে সব সময় সমসত্ত্ব অবিশুদ্ধ পদার্থে একের বেশী উপাদানের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। উদাহরণস্বরূপ গয়না বানাইবার সোনার কথা বলা যায়। উহা দেখিতে সর্বাংশে একরকম, কিন্তু উহাতে সোনা ও তামা একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে মেশান আছে। বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণও সমসত্ত্ব।

যে পদার্থের বিভিন্ন অংশ এক রকম নয়, তাহাকে আমরা **অসমসত্ত্ব** (Heterogeneous) বলি। অসমসত্ত্বতা কখন দেখিয়াই বোঝা যায়, কখন যায় না। উদাহরণস্বরূপ মাটির কথা ধর। একটু লক্ষ্য করিলে মাটিতে বালি, কাঁকর ইত্যাদি দেখিবে। বাজারের সাধারণ নুনেও নুন ছাড়া কিছু মাটিও থাকে; সেজন্য ইহারা অসমসত্ত্ব পদার্থ। আপাতদৃষ্টিতে দুধ সমসত্ত্ব দ্রবণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আসলে ইহাও অসমসত্ত্ব। একটু খেয়াল করিলেই দুধের উপরে ননী ভাসিতে দেখা যায়। চিনি, নুন ইত্যাদির দ্রবণ বানানোর সময় ভালভাবে না নাড়িলে দ্রবণের সমস্ত অংশে দ্রাবের পরিমাণ সমান থাকে না। এইরূপ দ্রবণ অসমসত্ত্ব। কিন্তু ভালভাবে নাড়িয়া দ্রবণ বানাইলে তাহা সমসত্ত্ব।

পদার্থের বিশুদ্ধতা যাচাই করার একমাত্র উপায় উহার রাসায়নিক পরীক্ষা। মিশ্রণ, দ্রবণ ইত্যাদি যে অবিশুদ্ধ তাহা ভৌত উপায়েই জানা যায়।

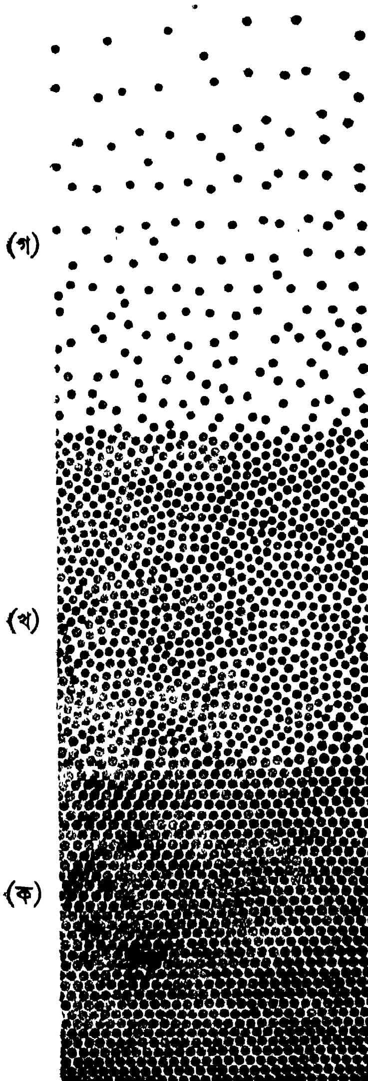
প্রশ্ন। বিশুদ্ধ পদার্থ কাহাকে বলে? সমসত্ত্ব পদার্থ বলিতে কি বুঝায়? সমসত্ত্ব পদার্থ মাত্রেই বিশুদ্ধ কি না বুঝাইয়া বল।

III-1.1. পদার্থের বিভিন্ন ভৌত অবস্থা (Physical states of matter)। পদার্থ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় (বায়বীয়) এই তিন অবস্থায় থাকিতে পারে। কোন পদার্থ ইহার কোন্ অবস্থায় থাকিবে তাহা উহার উষ্ণতা ও উপরস্থ চাপের উপর নির্ভর করে। এ কথা এ বইয়ে প্রথম অংশের I-5 বিভাগে ও উহার উপবিভাগগুলিতে বলা হইয়াছে। এই অংশ আবার দেখিয়া লও। পরের III-1.3. অংশেও এ সংক্রান্ত কিছু তথ্য পাইবে।

পদার্থ তিন অবস্থায় কেন থাকিতে পারে, I-5.4 অংশে লীন তাপ আলোচনা কালে তাহা বলা হইয়াছে। কারণ বুঝিয়া রাখিও। গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের কথা I-5.1 ও I-5.2 উপবিভাগে বলা হইয়াছে। উহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পদার্থ তিন অবস্থায় কেন থাকিতে পারে তাহা সংক্ষেপে আবার বলা যাইতে পারে।

বিশুদ্ধ পদার্থের উপাদানভূত অণুগুলি পদার্থের কঠিন অবস্থায় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ, সকল দিকেই একটি জ্যামিতিক সজ্জায় সাজান থাকে (III-1 ক চিত্র)। এই সজ্জা নানা রকমের হইতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয় প্রকার বলই ক্রিয়া করে। দুই বলের ক্রিয়ায় অণুগুলি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় পরস্পর হইতে নির্দিষ্ট একটা দূরত্বে থাকে। কিন্তু স্বস্থানে উহারা স্থির না থাকিয়া অতি দ্রুত, সেকেণ্ডে প্রায় 10^{13} বার, কাঁপিতে থাকে। কম্পনের জন্য

অণুগুলির গতিশক্তি থাকে। উষ্ণতা বাড়াইলে কম্পন দ্রুততর এবং আরও জোরাল হয়। উষ্ণতা ক্রমশ বাড়িলে একটা অবস্থা আসে যখন কম্পনের জোর বেশী হওয়ায় অণুগুলি স্বস্থানে থাকিতে পারে না এবং উহাদের জ্যামিতিক সজ্জা ভাঙিয়া যায়। ইহাই গলন এবং ইহাতে কঠিন অবস্থা হইতে পদার্থ তরলে পরিণত হয়।



III-1 ক, খ, গ চিত্র

তরল অবস্থায় অণুগুলির কোন জ্যামিতিক সজ্জা থাকে না (III-1খ চিত্র), কিন্তু উহাদের পারস্পরিক দূরত্ব গড়ে কঠিনে অণুগুলির দূরত্বের চেয়ে সামান্য বদলায়। বেশী পরিবর্তন যেটা হয় সেটা হইল অণুগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ কমিয়া যাওয়া। ফলে তরলে অণুগুলি স্থান ছাড়িয়া যথেচ্ছ চলিতে পারে, এবং তরলের নির্দিষ্ট কোন আকার থাকে না। যে পাত্রে তরল থাকে, তরল সেই পাত্রেরই আকার নেয়। কিন্তু উষ্ণতা আরও না বাড়াইলে আয়তন বদলায় না।

উষ্ণতা আরও বাড়াইলে আয়তন একটু বাড়ে এবং অণুগুলির গতিশক্তি বাড়িতে থাকে। সব অণুগুলির গতিশক্তি সমান হয় না, কাহারও কিছু বেশী, কাহারও কিছু কম। বেশী গতিশক্তির অণু অন্যান্য অণুর আকর্ষণে আটকা না থাকিয়া তরল হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে। ইহা বাষ্পন। পরে একটা বিশেষ উষ্ণতায় গতিশক্তি এত বেশী হয় যে পারস্পরিক আকর্ষণ আর অণুগুলিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তখন তরল অবস্থার সমাপ্তি ঘটে এবং পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয়। আকর্ষণ উপেক্ষণীয় হয় বলিয়া বাষ্পের অণুগুলি গতিশক্তির জন্য ছড়াইয়া পড়ে (III-1 গ চিত্র) এবং যতটা স্থান পায় তাহার সর্বত্র ছড়ায়।

প্রত্যেক গ্যাসই তাহার পক্ষে নির্দিষ্ট একটা উষ্ণতার নিচে থাকিলে কেবল চাপিয়াই তাহাকে তরল করা যায়। কার্বন ডাইঅক্সাইড় গ্যাসের উষ্ণতা 31·1°C-র কম হইলে চাপ বাড়াইয়া উহাকে তরল করা যায়। চাপিয়া অক্সিজেনকে তরল করিতে হইলে উহার উষ্ণতা –110°C-র কম হওয়া দরকার। জলের উপর চাপ বাড়াইয়া উহাকে 0°C-র নিচেও তরল রাখা যায়; জল বরফে পরিণত হয় না। পদার্থ কোন্ অবস্থায় থাকিবে তাহা প্রধানত উহার উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এ বিষয়ে চাপেরও যে ক্রিয়া আছে তাহা উপরের উদাহরণ তিনটি হইতে বোঝা যায়।

প্রশ্ন। বিশুদ্ধ পদার্থ তিন প্রকার অবস্থায় থাকিতে পারে কেন?

গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কাহাকে বলে? উহারা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? (28 ও 29 পৃষ্ঠা দেখ)

কোন পদার্থ কি অবস্থায় থাকিবে তাহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, জলের উদাহরণের সাহায্যে বুঝাও। (সংকেত—এক বায়ুমণ্ডল চাপে 0°C হইতে 100°C পর্যন্ত জল তরল; 0°C-র নিচে উহা কঠিন; 100° C-র উপরে উহা বায়বীয়। চাপ বাড়াইলে 0°C র নিচে বা 100°C-র উপরেও উহা তরল থাকে।)

III-1.2. পদার্থ চেনা বা শনাক্তকরণ (Identification of matter)। পদার্থ অগণিত রকমের হইলেও পদার্থমাত্রেই হয় কঠিন, না হয় তরল বা গ্যাসীয়। কে কঠিন, কে তরল বা কে গ্যাসীয় তাহা বুঝিতে সাধারণত অসুবিধা হয় না। কঠিনের কাঠিন্য, তরলের বহিয়া যাওয়ার ক্ষমতা, গ্যাসের ছড়াইয়া পড়ার ক্ষমতা বৈশিষ্ট্যসূচক। কিন্তু পদার্থ কঠিন হইলেই সব কঠিন পদার্থ এক নয়। তাহাদের মধ্যেও পার্থক্য আছে। সেই রকম সব তরল বা গ্যাসীয় পদার্থও এক নয়। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে উহাদের আলাদা বলিয়া চেনা যায়। পদার্থের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই **পদার্থের ধর্ম** বলা হয়। পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—

(ক) ভৌত ধর্ম (Physical properties)। পদার্থের যে ধর্ম পদার্থের ভৌত অবস্থার সহিত জড়িত বা উহার উপর নির্ভরশীল এবং বাহ্যিক প্রকারের তাহাই ভৌত ধর্ম, যেমন রং, গন্ধ, স্বাদ, দ্রাব্যতা, চৌম্বক ধর্ম, গলন, স্ফুটন ইত্যাদি।

(খ) রাসায়নিক ধর্ম (Chemical properties)। যে ধর্ম পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন নির্দেশ করে, তাহা রাসায়নিক ধর্ম। যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এক পদার্থ সম্পূর্ণ নূতন ধর্মবিশিষ্ট এক বা একাধিক পদার্থ উৎপন্ন করে তাহাই রাসায়নিক পরিবর্তন। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। দেখিতে অনেকটা এক রকম এরকম অনেক পদার্থকে তাহাদের ভৌত বা রাসানিক ধর্মের সাহায্যে শনাক্ত করা যায়।

(ক) ভৌত ধর্মের সাহায্যে পদার্থ শনাক্তকরণ—বিভিন্ন পদার্থ দেখিতে একরকম হইলেও উহাদের নানা রকম ভৌত ধর্মে প্রভেদ থাকে। কোন পদার্থ জলে

যা খরখরে, শক্ত বা নরম, স্পর্শ করিয়া বা চাপ দিয়া তাহা বোঝা যায়। কোন তরল পদার্থে অন্য কোন পদার্থ দ্রবীভূত আছে কি না তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা ছাড়া সাধারণত সহজে বোঝা যায় না। কিন্তু কখন কখন দ্রবণ স্পর্শ করিয়া বা উহার স্বাদ, গন্ধ ও রঙের সাহায্যে দ্রবীভূত পদার্থ (দ্রাব) সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়। ধর এক বালতি জলে কাপড় কাচা সোডা গুলিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ জলে হাত ডুবাও ; পিছল মনে হইবে।

চিনি ও নুনের স্বাদের পার্থক্য উহাদের এবং উহাদের দ্রবণ চিনিতে সাহায্য করে। জল ও কোহল (Alcohol) দুইই তরল এবং দেখিতে একরকম। কিন্তু কোহলের বিশেষ গন্ধ থাকায় উহাকে চিনিতে অসুবিধা হয় না।

নুন, চিনি ও ফটকিরির (Alum-এর) কেলাস (Crystal) বর্ণহীন, কিন্তু তুঁতের কেলাস নীল। এই পদার্থ কয়টি বিভিন্ন পাত্রে রাখিলে রঙের পার্থক্য থাকায় সহজেই তুঁতে চেনা যায়। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই কয়টি পদার্থের কেলাসের আকারের পার্থক্যও চোখে পড়িবে।

চুম্বক হয়ত সকলেই দেখিয়াছ। চুম্বক লোহা, নিকেল ও কোবাল্ট ধাতু আকর্ষণ করে, কিন্তু সোনা, রূপা, দস্তা ইত্যাদি অন্যান্য ধাতু বা অন্য কোন পদার্থ আকর্ষণ করে না। সুতরাং চুম্বকের সাহায্যে লোহা, কোবাল্ট ও নিকেল ধাতু শনাক্ত করা সহজ।

সমান আয়তনের লোহা ও রবারের টুকরা হাতে নিলে দেখিবে লোহার টুকরা রবারের টুকরার তুলনায় অনেক গুণ ভারী। রবারের টুকরা নরম ও টানিলে লম্বা হয়। বুঝিতে পারিতেছ, পদার্থের **আপেক্ষিক গুরুত্ব, কাঠিন্য, সম্প্রসারণ ক্ষমতার** সাহায্যে পদার্থ চেনা যায়।

সকল পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয় না। আবার সমপরিমাণ জলে সকল পদার্থ সমান পরিমাণে দ্রবীভূত হয় না। সুতরাং **দ্রাব্যতার** প্রভেদেও পদার্থ চেনা যায়। কাপড় কাচা সোডা, প্লাস্টার অফ প্যারিস (plaster of paris) ও ফেনলথেলিন (phenolphthalein) দেখিতে একরকম। কিন্তু সোডা ছাড়া অন্য দুইটি জলে দ্রবীভূত হয় না। কোহলে ফেনলথেলিন দ্রবীভূত হয়, কিন্তু অন্য দুইটি দ্রবীভূত হয় না। সুতরাং দ্রাব্যতার প্রভেদের সাহায্যে এই তিনটি পদার্থের কোন্‌টি কি তাহা শনাক্ত করা সহজ।

বিশুদ্ধ কেলাসিত (crystalline) পদার্থের সাধারণত নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক থাকে ; ন্যাপথেলিন (Naphthalene), আয়োডিন (Iodine) ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের (Sodium chloride-এর) গলনাঙ্ক যথাক্রমে 80·2°C, 113·6°C ও 804°C। প্রত্যেক বিশুদ্ধ তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্কও নির্দিষ্ট ; জল, মিথাইল অ্যালকোহল

(Methyl alcohol) ও ইথাইল অ্যালকোহলের (Ethyl alcohol-এর) স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে 100°C, 64·1°C ও 78·5°C। কোন পদার্থ বিশুদ্ধ না হইলে উহার গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের পরিবর্তন হয়। অবিশুদ্ধ সাধারণত পদার্থের গলনাঙ্ক কমে এবং স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের গলনাঙ্ক 2050°C, কিন্তু উহার সহিত ক্রায়োলাইট (cryolite) ও ফ্লুওরস্পার (fluorspar) মিশাইলে উহার গলনাঙ্ক কমিয়া 875—950°C হয়। 100 গ্রাম জলের সহিত 50 গ্রাম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশাইলে জলের স্ফুটনাঙ্ক বাড়িয়া 122°C হয়। এরকম অজস্র উদাহরণ আছে।

বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক মাপিয়া পদার্থ শনাক্ত করা যায় বা তাহাদের বিশুদ্ধতা নির্ধারণ করা যায়। এ প্রসঙ্গ I-5.2 বিভাগে আলোচনা করা হইয়াছে। পদার্থের কাঠিন্য, সম্প্রসারণ ক্ষমতা, দ্রাব্যতা ইত্যাদি মাপা যায়। কিন্তু পদার্থের স্বাদ ও গন্ধ মাপিবার উপায় এখন পর্যন্ত বাহির হয় নাই।

এ পর্যন্ত আলোচিত বিভিন্ন ভৌত ধর্ম ছাড়াও আরও বিভিন্ন প্রকার ভৌত ধর্ম আছে যাহা পদার্থ শনাক্ত করিতে সাহায্য করে।

(খ) রাসায়নিক ধর্মের সাহায্যে পদার্থ শনাক্তকরণ—বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পদার্থের উপর উষ্ণতা, জল, বায়ু, তড়িৎ, এসিড ইত্যাদির প্রভাব পদার্থের বৈশিষ্ট্যসূচক রাসায়নিক ধর্ম। ভৌত ধর্মের মত এসব ক্ষেত্রে ইহাদের সাহায্যেও পদার্থ শনাক্ত করা যায়।

লোহা আগুনে গরম করিলে উহার কোন স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু কয়লা জ্বালাইলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় ও নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়। মারকিউরিক অক্সাইড খুব গরম করিলে পারদ ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।

চুম্বক লোহা আকর্ষণ করে, কিন্তু লোহার মরিচা আকর্ষণ করে না। বায়ুর অক্সিজেন ও জলের প্রভাবে লোহা মরিচায় পরিণত হয়।

নুন জলে দ্রবীভূত করিলে জল একটু ঠাণ্ডা হয়। এই দ্রবণ গরম করিলে জল বাষ্পীভূত হয় ও নুন ফেরত পাওয়া যায়। হয়ত দেখিয়াছ, কলিচুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড (Calcium oxide) জলে দিলে উহা দ্রবীভূত হয় ও জল গরম হইয়া ফুটিতে থাকে। এই ক্রিয়ার ফলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড পরিবর্তিত হইয়া ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে। কলিচুনের এই দ্রবণ হইতে 100°C উষ্ণতায় জল বাষ্পীভূত করিয়া কলিচুন ফেরত পাওয়া যায় না।

চুনাপাথরে (Calcium carbonate) দস্তায় হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিলে উহারা দ্রবীভূত হইয়া যথাক্রমে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন

করে। কিন্তু গন্ধক বা চুনে হাইড্রোক্লোরিক এসিড ঢালিলে উহাদের কোন পরিবর্তন হয় না।

জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই দুইটি গ্যাস আবার মিশাইয়া দিলেই জল ফেরত পাওয়া যায় না।

উপরে উদাহরণগুলিতে দেখিলে ক্ষেত্রবিশেষে পদার্থের উপর উষ্ণতা, জল, এসিড ইত্যাদির ক্রিয়া বৈশিষ্ট্যসূচক। সুতরাং পদার্থ শনাক্ত করিতে এই সব ক্রিয়া খুবই সহায়ক হয়।

প্রশ্ন। ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বলিতে কি বুঝায়? বিভিন্ন পদার্থের ভৌত ধর্মে বিভিন্নতা আছে ইহার কয়েকটি উদাহরণ দাও। পদার্থ চিনিতে উহাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম কি ভাবে সাহায্য করে তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

III-1.3. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন (Physical and chemical changes)। পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম অনুযায়ী পদার্থের পরিবর্তন দুই প্রকারের—ভৌত ও রাসায়নিক।

(ক) ভৌত পরিবর্তন। যে পরিবর্তনে পদার্থের ভৌত ধর্মের পরিবর্তন হয়, কিন্তু উহার রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হয় না, তাহাকে ভৌত বা অবস্থাগত পরিবর্তন বলে। সাধারণত তাপ, তড়িৎ, চুম্বক, দ্রাবক ইত্যাদির প্রভাবে পদার্থের এইরূপ পরিবর্তন ঘটে। নিচে উদাহরণ দেওয়া হইল।

তাপ, তড়িৎ ইত্যাদির প্রভাবে ভৌত পরিবর্তন—

(i) **তাপ**—(a) পদার্থের উষ্ণতা কমাইয়া অথবা বাড়াইয়া পদার্থের অবস্থান্তর ঘটান যায়। নাতিশীতোষ্ণ অবস্থায় জল, পারদ ও অ্যাসেটিক এসিড তরল পদার্থ। কিন্তু অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় তিনটি পদার্থ ই জমিয়া কঠিন হয় এবং অতিরিক্ত গরমে তিনটিই উহাদের বাষ্পে পরিণত হয়। উষ্ণতার উপরই উহাদের ভৌত অবস্থা নির্ভর করে।

(b) তাপের প্রভাবে আগুনের শিখার কার্বনের কণা, গ্যাসবাতির ম্যান্‌ট্‌ল (mantle) এবং তড়িতের প্রভাবে ইলেকট্রিক বাল্বের টাংস্টেনের তার গরম হইয়া আলো বিকিরণ করে। ঠাণ্ডা অবস্থায় উহাদের আলো বিকিরণ ক্ষমতা নাই।

(ii) তড়িৎ—উপরে দেখান হইয়াছে টাংস্টেন তারের আলো বিকিরণ করার ক্ষমতা উহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত তড়িতের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ; তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হইলে আলো পাওয়া যায় না। রবার বা অনুরূপ বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ দিয়া আচ্ছাদিত তামার তার দিয়া লোহার টুকরা জড়াইয়া তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিলে লোহার টুকরা চুম্বকে পরিণত হয়। কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করিলে উহার চুম্বকত্ব লোপ পায়।

(iii) দ্রাবক (Solvent)—জল, স্পিরিট, কেরোসিন ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রাবক আমাদের পরিচিত। নুন জলে দ্রবীভূত হয়। নুনের দ্রবণ গরম করিলে জল বাষ্পীভূত হয় এবং নুন পড়িয়া থাকে। এইরূপে বিভিন্ন দ্রবণ হইতে দ্রাবক দূর করিয়া দ্রাব ফেরত পাওয়া যায়।

পদার্থের দ্রবণ তৈয়ারিতে অনেক সময়ই তাপের উদ্ভব বা শোষণ ঘটে। জলে নুন বা চিনির দ্রবণ তৈয়ারির সময় তাপের শোষণ হয়, কিন্তু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড জলে দ্রবীভূত হইবার সময় তাপের উদ্ভব হয়

(iv) চাপ—তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের উপরে চাপ কমাইয়া বা বাড়াইয়া উহাদের আয়তন বাড়ান বা কমান যায়। কঠিন পদার্থের উপর চাপের প্রভাব খুব কম। তরলে মোটামুটি তাহার দশগুণ। গ্যাসে চাপের প্রভাব খুব বেশী। দশম শ্রেণীতে গ্যাসের উপর চাপের প্রভাব বিস্তারিত জানিবে

(খ) রাসায়নিক পরিবর্তন। যে পরিবর্তনে পদার্থ পরিবর্তিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন রাসায়নিক ধর্মবিশিষ্ট ও নূতন ভৌত বৈশিষ্ট্যযুক্ত এক বা একাধিক নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে তাহাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। রাসায়নিক পরিবর্তনে নূতন পদার্থের সৃষ্টি হওয়ায় উহাকে 'রাসায়নিক বিক্রিয়া' (Chemical reaction) বলা হয়। কোন রাসায়নিক পরিবর্তনে গোড়ায় যে এক বা একাধিক পদার্থ অংশগ্রহণ করে তাহাদের 'বিক্রিয়ক' বা 'বিকারক' (Reactant) বলে। ঐ রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে যে এক বা একাধিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাদের বলে 'বিক্রিয়জ' (Product)। তাপ, আলো, বিদ্যুৎ ইত্যাদির প্রভাবে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিতে পারে। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

রাসায়নিক পরিবর্তনে পদার্থের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, তাপ, আলো ইত্যাদির প্রভাব—

(i) ঘনিষ্ঠ সংযোগ—একাধিক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইতে হইলে উহাদের সংযোগ অতি অবশ্যই ঘনিষ্ঠ হইতে হইবে। ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন্য অনেক সময়ই পদার্থের দ্রবণ তৈয়ারি করিয়া মিশাইতে হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) ও সিলভার নাইট্রেটের ($AgNO_3$) গুঁড়া ঘনিষ্ঠভাবে মিশাইয়া রাখিলেও উহাদের মধ্যে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে না। কিন্তু উভয়কে দ্রবিত করিয়া দ্রবণ দুটি মিশাইলে দেখা যায় রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়া সিলভার ক্লোরাইডের (AgCl) সাদা গুঁড়া থিতাইয়া পড়িয়াছে। মনে রাখিতে হইবে একাধিক পদার্থ মিশ্রিত করিলেই উহাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া নাও ঘটিতে পারে। বিক্রিয়কগুলির সংযোগ ঘনিষ্ঠ হওয়া সকল ক্ষেত্রেই দরকার।

(ii) **তাপ**—তাপ প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। মারকিউরিক অক্সাইড গরম করিলে পারদ (মারকারি) ও অক্সিজেন তৈয়ারি হয়। লোহার গুঁড়া ও গন্ধক মিশাইয়া রাখিলে উহাদের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু উহাদের মিশ্রণ গরম করিলে উহাদের বিক্রিয়ায় ফেরাস সালফাইড উৎপন্ন হয়। উষ্ণতা বাড়াইয়া অনেক রাসায়নিক পরিবর্তনই দ্রুততর করা যায়।

(iii) **তড়িৎ**—তড়িতের সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। সামান্য সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিলে জল হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। কিন্তু গ্যাস দুটি মিশাইয়া দিলে জল ফিরিয়া পাওয়া যায় না। এই গ্যাসীয় মিশ্রণের মধ্য দিয়া তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ চালনা করিলে জল পাওয়া যায় ও তাপের উদ্ভব হয়। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চালনা করিলে নাইট্রিক অক্সাইড তৈয়ারি হয় ও তাপের শোষণ ঘটে।

(iv) **আলো**—সূর্যকিরণের প্রভাবে গাছের ক্লোরোফিল কার্বোহাইড্রেট তৈয়ারি করে। আলোর অভাবে এই রাসায়নিক ক্রিয়া বন্ধ হয়। আলোর প্রভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়া সাদা রঙের সিলভার ক্লোরাইড, সিলভার নাইট্রেট ইত্যাদি সূক্ষ্ম কালো সিলভারের (রূপার) কণায় পরিণত হয়। ফটোগ্রাফির ফিল্মে সিলভারে তৈয়ারী রাসায়নিক দ্রব্য থাকে বলিয়া আলোর প্রভাবে উহা কালো হয়।

(v) **প্রভাবক (Catalyst)**—পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন আরম্ভ হইলে শেষ হইতে কিছুক্ষণ সময় লাগে। কোথাও এই সময় এক সেকেণ্ডের কম, আবার কোথাও কয়েক ঘণ্টা বা তার চেয়েও বেশী। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই অল্প পরিমাণ আর একটি পদার্থের উপস্থিতির ফলে রাসায়নিক পরিবর্তন দ্রুত ঘটে। এই বিক্রিয়ায় দ্বিতীয় পদার্থটির ওজনের কোন পরিবর্তন হয় না ও উহা পুরাটাই ফেরত পাওয়া যায়। বিপরীতভাবে, অনেক সময় কোন কোন পদার্থ খুব সামান্য পরিমাণে থাকিলেও কোন কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বাধা ঘটে। যে সমস্ত পদার্থ নিজে অবিকৃত থাকিয়া রাসায়নিক পরিবর্তনের বেগ বাড়াইতে বা কমাইতে সাহায্য করে তাহাদের **প্রভাবক** বলে। পটাসিয়াম ক্লোরেট গরম করিলে খুব সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যায়। কিন্তু পটাসিয়াম ক্লোরেটের সহিত সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশাইয়া গরম করিলে কম উষ্ণতায় বেশী পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যায়। এই বিক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড প্রভাবক। বাদাম তেল হইতে বনস্পতি তৈয়ারীতে নিকেল ধাতু, সালফার ট্রাইঅক্সাইড তৈয়ারীতে ভ্যানাডিয়াম পেণ্টক্সাইড ইত্যাদি প্রভাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাণীজগতে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন এনজাইম (Enzyme) প্রভাবক।

(vi) **চাপ**—কেবল চাপের প্রভাবে সাধারণত রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। কিন্তু গ্যাসীয় পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের বেগ বহুল পরিমাণে উহার (বা উহাদের) উপরস্থ চাপের পরিমাণের সহিত জড়িত। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অ্যামোনিয়া গ্যাসের উৎপাদনের পরিমাণ এই গ্যাসীয় মিশ্রণের উপর চাপের পরিমাণের সহিত বাড়ে বা কমে। অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদনে চাপ ছাড়াও প্রভাবক এবং তাপের প্রভাব খুব বেশী।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনা :

উপরে বর্ণিত পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ কয়টি লক্ষ্য করিলে নিচের সিদ্ধান্তগুলিতে আসা যায়।

(ক) ভৌত পরিবর্তনে—

(১) কোন নূতন পদার্থ সৃষ্ট হয় না।

(২) পদার্থের ভৌত ধর্মের পরিবর্তন হয়, কিন্তু রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটে না।

(৩) ক্ষেত্রবিশেষে তাপের শোষণ বা উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনায় ইহা খুব কম।

(৪) পদার্থের ওজন বাড়ে না বা কমে না।

(৫) সাধারণত পদার্থের আভ্যন্তরীণ গঠনের পরিবর্তন ঘটে না। তবে উষ্ণতার ও চাপের পরিবর্তনে পদার্থের আয়তন কমা ও বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার অণু অথবা পরমাণুর দূরত্ব কমে ও বাড়ে।

(খ) রাসায়নিক পরিবর্তনে—

(১) এক বা একাধিক নূতন পদার্থ সৃষ্টি হয়।

(২) প্রারম্ভিক পদার্থ (বিক্রিয়ক) ও নূতন পদার্থের (বিক্রিয়জের) ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে পার্থক্য থাকে।

(৩) তাপের শোষণ বা উদ্ভব হয়।

(৪) অংশগ্রহণকারী পদার্থের সামগ্রিকভাবে ওজন বাড়ে না অথবা কমে না।

(৫) পদার্থের বিভিন্ন পরমাণুর বিন্যাস (আভ্যন্তরীণ গঠন) পরিবর্তিত হয়।

তাপ উৎপাদক ও তাপ শোষক পরিবর্তন (Exothermic and Endothermic changes)।

পদার্থের পরিবর্তনে অনেক সময়ই তাপের শোষণ অথবা তাপের উদ্ভব হয়। পদার্থের যে পরিবর্তনে তাপ উৎপন্ন হয় তাহাকে 'তাপ উৎপাদক' (Exothermic) পরিবর্তন বলে। উদাহরণ—

(১) কার্বন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রচণ্ড তাপের উৎপত্তি হইয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি হয়।

(২) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় এবং সোডিয়াম সালফেট ও জল সৃষ্ট হয়।

(৩) জল তরল অবস্থা হইতে কঠিন বরফে পরিণত হওয়ার সময় উহার লীন তাপ বিকিরণ করে।

পদার্থের যে পরিবর্তনে পরিপার্শ্ব হইতে তাপ শোষিত হয় তাহাকে 'তাপশোষক পরিবর্তন' (Endothermic) বলে। উদাহরণ—

(১) নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হওয়ার সময় তাপ শোষিত হয়।

(২) চিনি জলে দ্রবীভূত করিলে তাপ শোষিত হয়।

প্রশ্ন। ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন তুলনা কর। প্রত্যেকের তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও।
তাপ উৎপাদক ও তাপ শোষক পরিবর্তন কাহাকে বলে? উভয়ের একটি করিয়া ভৌত ও রাসায়নিক উদাহরণ দাও।

III-1.4. মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ (Elements and Compounds) :
কোন্ পদার্থ মৌলিক, কোন্ পদার্থ যৌগিক তাহা আলোচনা করিবার আগে রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Chemical analysis) ও রাসায়নিক সংশ্লেষণ (Chemical synthesis) কথা দুইটির অর্থ বুঝিয়া নেওয়া সুবিধার।

বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের সাহায্যে কোন বস্তুর রাসায়নিক উপাদান জানার প্রক্রিয়াকে **রাসায়নিক আঙ্গিক বা গুণীয় বিশ্লেষণ** (Chemical qualitative analysis) বলে। যে বিশ্লেষণের ফলে বস্তুর বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ জানা যায়, তাহাকে **রাসায়নিক মাত্রিক বিশ্লেষণ** (Chemical quantitative analysis) বলে। দুই বা দুইয়ের বেশী বিভিন্ন উপাদান হইতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে স্বতন্ত্র ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মবিশিষ্ট একটি সমসত্ত্ব পদার্থের সৃষ্টিকরণকে **রাসায়নিক সংশ্লেষণ** (Chemical synthesis) বলে। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য বিপরীত।

হাইড্রোজেন গ্যাস অক্সিজেন গ্যাসে জ্বালাইলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উহাদের মিলন ঘটিয়া জল তৈয়ারি হয়। একই রূপে পারদ ধাতু ও অক্সিজেন গ্যাস নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বিক্রিয়া করিয়া সংযুক্ত হইয়া মারকিউরিক অক্সাইড উৎপন্ন করে। এ ক্রিয়া দুইটি সংশ্লেষণের উদাহরণ।

সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিলে জলের বিশ্লেষণের ফলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায়। অতিরিক্ত উষ্ণতায় মারকিউরিক অক্সাইড ভাঙিয়া গিয়া মারকারি (পারদ) ধাতু ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। এই ক্রিয়া দুইটি জল ও মারকিউরিক অক্সাইডের উপাদান জানিতে সাহায্য করে। ইহারা রাসায়নিক আঙ্কিক বিশ্লেষণের উদাহরণ।

জানা পরিমাণ মারকিউরিক অক্সাইড গরম করিয়া উৎপন্ন পারদ ও অক্সিজেনের পরিমাণ মাপিলে সমগ্র প্রক্রিয়াকে মারকিউরিক অক্সাইডের রাসায়নিক মাত্রিক বিশ্লেষণ বলা হইবে। সুতরাং রাসায়নিক আঙ্কিক ও মাত্রিক বিশ্লেষণ করিয়া যে কোন পদার্থের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদের পরিমাণ জানা যায়। বিশ্লেষণের ফল জানা থাকিলে সংশ্লেষণ সহজ হয়।

কোন যৌগে কি কি উপাদান আছে তাহা আঙ্কিক বিশ্লেষণে এবং কোন্‌টি কি পরিমাণে আছে তাহা মাত্রিক বিশ্লেষণে জানিয়া, প্রয়োজনীয় উপাদান সঠিক মাত্রায় নিয়া রাসায়নিক সংশ্লেষণে যৌগটি আমরা তৈয়ারি করিতে পারি। আমাদের অতি প্রয়োজনীয় অনেক যৌগ এভাবে তৈয়ারি করা হয়—যেমন অ্যামোনিয়া, সালফিউরিক এসিড, নাইলন, পলিথিন, বিভিন্ন রং, ঔষধ প্রভৃতি। ভিটামিন 'সি', রবার, নীল ও কুইনিন একসময় কেবল বিভিন্ন গাছ হইতেই পাওয়া যাইত। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সংশ্লেষণের পদ্ধতিতে ইহাদের প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে সংশ্লেষণেও এগুলিকে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা হয়। রাসায়নিক সংশ্লেষণ যে মানব সভ্যতাকে কত দিক দিয়া কতভাবে আগাইয়া দিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

মৌল ও যৌগ। মারকিউরিক অক্সাইডের বিশ্লেষণে জানা গিয়াছে যে ইহা নির্দিষ্ট পরিমাণ মারকারি ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগের ফলে সৃষ্ট। এইরূপে দেখা গিয়াছে নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে জল গঠিত। কিন্তু পারদ, হাইড্রোজন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় নাই। যে পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দ্বিতীয় কোন পদার্থ পাওয়া যায় না তাহাকে **মৌলিক পদার্থ বা মৌল** বলে। সুতরাং পারদ, হাইড্রোজন ও অক্সিজেন পদার্থ তিনটি মৌলিক।

রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে জানা গিয়াছে পৃথিবীর প্রাণীজগৎ ও জড়জগতের সব কিছুই প্রায় 90 (নব্বইটি) স্বতন্ত্র ধর্মবিশিষ্ট মৌল বা মৌলিক পদার্থে গঠিত।

[আধুনিককালে পরীক্ষাগারে নূতন আরো কয়েকটি মৌল সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে। এ পর্যন্ত মোট 103টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় 10-12টি মৌল এতই স্বল্পস্থায়ী, যে তাহারা থাকিয়াও নাই বলা চলে।]

ভূত্বকে (Earth's crust-এ) বিভিন্ন মৌলগুলির পরিমাণ সমান নয়। ভূত্বকে ইহাদের গড় পরিমাণ ওজন হিসাবে শতকরা মোটামুটি নিম্নরূপ :

অক্সিজেন	50%	সোডিয়াম	2½%
সিলিকন	26%	পটাসিয়াম	2½%
অ্যালুমিনিয়াম	7%	ম্যাগনেসিয়াম	2%
লোহা	4%	হাইড্রোজেন	1%
ক্যালসিয়াম	3%	বাদ বাকী মৌল	2%

উপরের মৌল কয়টি আমাদের খুবই পরিচিত। কিন্তু আমাদের পরিচিত অন্য অনেক মৌলই, যেমন সোনা, রূপা, কার্বন ইত্যাদি, উপরের কয়েকটি মৌলের তুলনায় অনেক কম পরিমাণে পাওয়া যায়। ভূত্বকে প্রত্যেকটি মৌল সুষমভাবে ছড়াইয়া নাই, বরং অনেক সময়ই উহাদের গাঢ় অবক্ষেপ (Deposit) রূপে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানায় রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লা খনির কথা তোমরা অনেকেই জান। দক্ষিণ বিহারের ঘাটশীলায় তামার খনির ও জামশেদপুরের কাছাকাছি এলাকার লোহার খনির কথাও হয়ত শুনিয়াছ।

সোনা, রূপা, কার্বন, সালফার প্রভৃতি কয়েকটি মৌলকে বিশুদ্ধ অবস্থায় ভূত্বকে কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি ও অন্যান্য মৌল সাধারণত যৌগিক পদার্থ রূপেই থাকে—যেমন লোহার আকর হিমেটাইট (Hematite), অ্যালুমিনিয়ামের আকর বক্সাইট (Bauxite), কার্বনের আকর কাঁচা কয়লা (Coal) ইত্যাদি। সেজন্য ভূত্বকে বিরল (Rare) হওয়া সত্ত্বেও অনেক মৌলই, যেমন বোরন (Boron 3×10^{-4}%), আয়োডিন (3×10^{-5}%), মারকারি (10^{-5}%) ; ইত্যাদি আমাদের সুপরিচিত।

III-1.5. ধাতু (Metals) ও অধাতু (Non-metals)। প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের ধর্ম নিজস্ব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইলেও কোন কোন মৌলের ধর্মের সহিত অপর কোন কোন মৌলের ধর্মের অল্পবিস্তর সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্য অনুযায়ী মৌলিক পদার্থ প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা **ধাতু (Metal) ও অধাতু (Non-metal)**। নিচে উহাদের কয়েকটির নাম দেওয়া গেল—

(*i*) ধাতু—সোনা, রূপা, তামা, লোহা, পারদ ইত্যাদি।

(*ii*) অধাতু—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, ক্লোরিন, সালফার (গন্ধক) ইত্যাদি।

কিন্তু কয়েকটি ধাতুতে অধাতুর কিছু ধর্ম দেখা যায়, আবার কয়েকটি অধাতুতে ধাতুর কিছু ধর্ম দেখা যায়। সুতরাং এই কয়টি মৌলকে, যেমন বোরন (Boron),

সিলিকন (Silicon), জারমেনিয়াম (Germanium), সিলেনিয়াম (Selenium), এন্টিমনি (Antimony) ইত্যাদিকে, আলাদাভাবে **ধাতুকল্প (Metalloid)** বলা হয়। ধাতু ও অধাতু বলিয়া শ্রেণীভেদ স্পষ্ট সীমাবিশিষ্ট ভেদ নয়। বলা যায় মৌল-গুলির এক প্রান্তে ধাতু, অন্য প্রান্তে অধাতু ও মাঝখানে ধাতু হইতে অধাতুতে ক্রমশ পরিবর্তন। মাঝেরগুলিই ধাতুকল্প।

মনে রাখিতে হইবে সমস্ত মৌলের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই ধাতু। এখন ধাতু, অধাতু ও ধাতুকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যাক।

(ক) ধাতুর বৈশিষ্ট্য। (i) ধাতু সাধারণত উজ্জ্বল, অনচ্ছ কঠিন পদার্থ। তবে পারদ, গ্যালিয়াম (Gallium) ও সিজিয়াম (Cesium) ধাতুর গলনাঙ্ক 30°C-এর কম বলিয়া আমাদের দেশে এগুলি অনেক সময়ই তরল অবস্থায় পাওয়া যায়।

(ii) সাধারণত অধাতুর তুলনায় ধাতুর গলনাঙ্ক বেশী এবং ধাতুর গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের ব্যবধানও বেশী। সেইজন্য ধাতু গলাইলে অনেকটা উষ্ণতা জুড়িয়া উহা তরল অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ইহাদের তরল অবস্থার ব্যাপ্তি (Liquid range) (= স্ফুটনাঙ্ক – গলনাঙ্ক) বেশী। (101 পৃষ্ঠার সারণী (Table) III-1.5 দেখ)

(iii) বেশীর ভাগ ধাতুর ঘাতসহতা (Malleability) ও প্রসার্যতা (Tensile strength) থাকায় ইহাদের পিটাইয়া পাত (Sheet) ও টানিয়া তারে পরিণত করা যায়।

(iv) সাধারণত ধাতুগুলির তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণ করার ক্ষমতা বেশী।

(v) ধাতু ও অধাতুর বিক্রিয়ায় ধাতু পজিটিভ-বিদ্যুৎধর্মী (Electro-positive)।

(vi) ধাতুর অক্সাইড সাধারণত ক্ষারকীয় (Basic)। কোন কোন ক্ষেত্রে উহা উভধর্মী (Amphoteric) অর্থাৎ ক্ষারকীয় বা এসিড জাতীয় উভয় প্রকারই হইতে পারে।

(খ) অধাতুর বৈশিষ্ট্য। (i) অধাতু সাধারণত অনুজ্জ্বল, স্বচ্ছ অথবা ঈষদচ্ছ গ্যাসীয় বা তরল পদার্থ। কিন্তু কার্বন ও ফসফরাসের মত কোন কোন অধাতু অনচ্ছ কঠিন অবস্থায়ও পাওয়া যায়।

(ii) অধাতুর গলনাঙ্ক সাধারণত কম এবং ইহাদের তরল অবস্থার ব্যাপ্তিও কম (সারণী III-1.5) দেখ)। কার্বন, বোরন ও সিলিকনের গলনাঙ্ক খুব বেশী।

(iii) কঠিন অবস্থায় অধাতু ভঙ্গুর এবং উহার ঘাতসহতা ও প্রসার্যতা খুব কম।

(iv) গ্রাফাইটরূপী কার্বন বাদে সাধারণত প্রত্যেক অধাতুরই তাপ ও তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা খুব কম।

(v) ধাতু ও অধাতুর বিক্রিয়ায় অধাতু সাধারণত নিগেটিভ বিদ্যুৎধর্মী (Electro-negative ; 118 পৃষ্ঠা দেখ)।

(vi) অধাতুর অক্সাইড সাধারণত এসিড জাতীয় পদার্থ।

(গ) ধাতুকল্পের বৈশিষ্ট্য। ধাতুকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণত ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি। ইহাদের কয়েকটির, যেমন এন্টিমনি ও বিসমাথের, ধাতুর সহিত বেশী সাদৃশ্য থাকায় উহাদিগকে কার্যত ধাতু বলিয়া গণ্য করা হয় ; অনুরূপে কয়েকটিকে, যেমন বোরন, সিলিকন, সিলেনিয়াম ও টেলুরিয়ামকে কার্যত অধাতু বলিয়া গণ্য করা হয়।

(i) ধাতুকল্পগুলি অনচ্ছ, ভঙ্গুর, কঠিন পদার্থ (এন্টিমনি এবং বিসমাথও)।

(ii) ধাতুকল্পের তাপ ও তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা মোটামুটি ধাতুর ও অধাতুর মাঝামাঝি। কিন্তু উষ্ণতা বাড়িলে ঐ ক্ষমতা বাড়ে। সিলেনিয়ামের তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা আলোর প্রভাবে বাড়ে বলিয়া সন্ধ্যা হইলে বা আলো কমিয়া গেলে রাস্তার আলো নিজ হইতে জ্বলিয়া উঠিবার বা অনুরূপ কাজে ইহার ব্যবহার আছে। সিলিকন ও জার্মেনিয়ামের সহিত বিশেষ অপবস্তু (Impurity) বিশেষ পরিমাণে মিশাইয়া ইহাদের তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা প্রচুর প্রভাবিত করা যায়। ইহাদের এই ধর্মের জন্য ট্রানজিসটার (Transistor) বানান সম্ভব হইয়াছে। বেতার জগতে ইহা যুগান্তর আনিয়াছে।

[সারণী III-1.5 : কয়েকটি ধাতু ও অধাতুর গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক ও তরল অবস্থার ব্যাপ্তি।]

মৌল	গলনাঙ্ক (°C)	স্ফুটনাঙ্ক (°C)	তরল অবস্থার ব্যাপ্তি (স্থূল) (°C)
ধাতু—			
মারকারি	– 38·9	356·6	396
সিজিয়াম	28·6	713	684
গ্যালিয়াম	29·8	2250	2220
সোডিয়াম	97·8	883	785
লেড (সীসা)	327·3	1750	1423
তামা	1083	2580	1597
লোহা	1539	2900	1361

অধাতু—

হাইড্রোজেন	−259	−253	6
অক্সিজেন	−219	−183	35
নাইট্রোজেন	−210	−196	14
ক্লোরিন	−101	−34	67
সালফার	119	445	326

III-1.6. যৌগিক পদার্থ (Compound)।

দুই বা ততোধিক মৌলের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন স্বতন্ত্র ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মবিশিষ্ট সমসত্ত্ব পদার্থকে **যৌগিক পদার্থ** বা **যৌগ** বলা হয়। যেমন,

(i) হাইড্রোজেন গ্যাস অক্সিজেন গ্যাসে জ্বালাইলে উহাদের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উহারা সংযোজিত হইয়া জল উৎপন্ন করে। জলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

(ii) একই রকমে মারকারি ও অক্সিজেন যুক্ত হইয়া মারকিউরিক অক্সাইড উৎপন্ন করে।

(iii) কার্বন অক্সিজেনে জ্বালাইলে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি হয়।

(iv) কার্বন ডাইঅক্সাইড জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়া স্বতন্ত্র ধর্মবিশিষ্ট কার্বনিক এসিড সৃষ্টি করে।

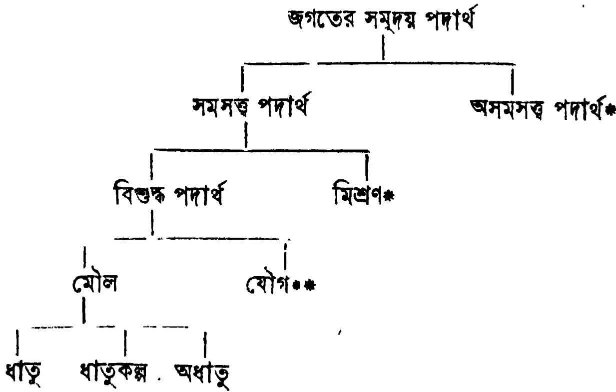
যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ করিলে দুই, তিন বা তাহারও বেশী মৌলিক পদার্থ পাওয়া যাইবে। মারকিউরিক অক্সাইড গরম করিলে মারকারি ও অক্সিজেন মৌল দুইটি পাওয়া যায়। কার্বনিক এসিড বিশ্লেষণ করিলে হাইড্রোজেন, কার্বন ও অক্সিজেন এই তিনটি মৌল পাওয়া যায়।

যে যৌগিক পদার্থ মাত্র দুইটি মৌলিক পদার্থ দিয়া গঠিত, তাহাকে 'দ্বিমূল' যৌগ (Binary compound) বলা হয়। তিনটি মৌল দিয়া যৌগ গঠিত হইলে তাহাকে 'ত্রিমূল' (Ternary) যৌগ বলা হয়। উপরে ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

একাধিক মৌল বা যৌগ পরস্পর রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত না হইয়া একত্রে থাকিলে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে মিশ্রণ বা সাধারণ মিশ্রণ (Mechanical mixture) বলে। মৌল অথবা যৌগের মিশ্রণে উপাদানগুলির নিজস্ব ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বিনষ্ট হয় না। সুতরাং যৌগের মত মিশ্রণ সমসত্ত্ব নয় এবং ইহার নিজস্ব স্বতন্ত্র ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম থাকে না। লোহা ও গন্ধকের মিশ্রণে উহাদের

নিজস্ব ধর্ম লোপ পায় না। এই মিশ্রণ হইতে চুম্বকের সাহায্যে লোহা এবং কার্বন ডাইসালফাইড দ্রাবকের সাহায্যে গন্ধক দ্রবীভূত করিয়া আলাদা করা যায়। কিন্তু লোহা ও গন্ধকের মিশ্রণ গরম করিলে স্বতন্ত্র ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মযুক্ত ফেরাস-সালফাইড (Ferrous sulphide) যৌগ সৃষ্ট হয়। ইহা হইতে চুম্বক দিয়া লোহা বা কার্বনডাইসালফাইড দিয়া গন্ধক আলাদা করিয়া নেওয়া যায় না।

পদার্থের শ্রেণীবিভাগঃ উপরের আলোচনা অনুসারে যাবতীয় পদার্থের শ্রেণীবিভাগ নিচে দেখান হইল।



প্রশ্ন। রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ কাহাকে বলে? প্রত্যেকের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।
মৌল ও যৌগে প্রভেদ উদাহরণ দিয়া বুঝাও।
ধাতু, অধাতু ও ধাতুকল্প কাহাদের বলে? ধাতু ও অধাতুর প্রভেদ তুলনা কর।
মিশ্রণ ও যৌগের প্রভেদ উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

III-2 দ্রবণ (Solution)। জড় জগতের সমস্ত পদার্থের কোনটি বিভিন্ন বিশুদ্ধ পদার্থের মিশ্রণ, আবার কোনটি বিশুদ্ধ মৌল বা যৌগ। পদার্থের মিশ্রণ দুই শ্রেণীর—সমসত্ত্ব ও অসমসত্ত্ব (III-1 বিভাগ দেখ)। সমসত্ত্ব মিশ্রণ নানা প্রকারের হইতে পারে, যেমন তরলের সহিত কঠিনের, তরলের সহিত তরলের, গ্যাসের সহিত গ্যাসের ইত্যাদি। সমসত্ত্ব মিশ্রণে এক বা একাধিক পদার্থ অন্য পদার্থের সহিত সর্বাংশে এমনভাবে মিশিয়া থাকে যে উহাদের সর্বাংশের রচনা (composition) একই হয়। এইরূপ মিশ্রণে উহার বিভিন্ন উপাদানের স্বতন্ত্র সত্তার লোপ হয় না, কিন্তু উহাদের ভৌত বৈশিষ্ট্যের, যেমন গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, ঘনত্ব, কঠিনত্ব ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটে।

* বিভিন্ন মৌল বা যৌগের মিশ্রণ

** বিভিন্ন মৌলের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত

ব্যাপক অর্থে যে কোন সমসত্ত্ব মিশ্রণকে **দ্রবণ** বলা হয়। দ্রবণের সংজ্ঞা অনুযায়ী তরলের সহিত কঠিনের, কঠিনের সহিত কঠিনের, গ্যাসের সহিত গ্যাসের ইত্যাদি বিভিন্ন সমসত্ত্ব মিশ্রণকে দ্রবণ বলা যায়। কঠিনের সহিত কঠিনের সমসত্ত্ব মিশ্রণ, যেমন তামা ও দস্তায় তৈরি পিত্তল, সোনা ও তামায় তৈরি গয়না গড়ানোর সোনা ইত্যাদিকে 'কঠিন দ্রবণ' (Solid solution) বলা হয়। সাধারণত 'দ্রবণ' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া শুধু তরলের সহিত কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের সমসত্ত্ব মিশ্রণকে বুঝায়। এই অর্থেই আমরা এখানে 'দ্রবণ' কথাটি ব্যবহার করিব। রসায়নে দ্রবণের ব্যবহার ব্যাপক।

দ্রবণ তিন শ্রেণীর :

(i) তরলে কঠিনের দ্রবণ—যেমন জলে চিনির দ্রবণ, কার্বন ডাইসালফাইডে গন্ধকের দ্রবণ ইত্যাদি।

(ii) তরলে তরলের দ্রবণ—যেমন জলে ইথাইল অ্যালকোহল (বা ইথানল) (Ethyl Alcohol or Ethanol)-এর দ্রবণ, ইথানলে ক্লোরোফর্মের দ্রবণ ইত্যাদি। (আধুনিক রসায়নের ভাষায় ইথাইল অ্যালকোহলকে ইথানল বলা হয়।)

(iii) তরলে গ্যাসীয় পদার্থের দ্রবণ—যেমন জলে অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া (Ammonia) ইত্যাদির দ্রবণ।

দ্রবণ, দ্রাব ও দ্রাবক। এক গ্লাস জলে এক চামচ চিনি দিয়া নাড়িলে উহা জলের সহিত মিশিয়া যায় ও উহার স্বচ্ছ জলীয় (Aqueous) দ্রবণ তৈয়ারি হয়। জলের সহিত চিনির সমসত্ত্বভাবে মিশিয়া যাওয়ার ঘটনাকে চিনির **দ্রাবণ** (Dissolution) বলে। দ্রাবণের বদলে 'দ্রবীকরণ', 'দ্রাবিতকরণ' বা 'দ্রবীভূতকরণ' প্রভৃতি কথাগুলিও ব্যবহার হয়। চিনির মত নুন, তুঁতে, ইথানল ইত্যাদি সমসত্ত্বভাবে জলের সহিত মিশিয়া দ্রবণ তৈয়ারি করে। বিভিন্ন পদার্থের দ্রবণে উহার যে উপাদানটি আয়তনে বেশী থাকে তাহাকে **দ্রাবক** (Solvent) ও অন্যটিকে **দ্রাব** (Solute) বলে। চিনি, নুন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদির জলীয় দ্রবণে উহারা দ্রাব ও জল দ্রাবক। ইথানল ও জল যে কোন পরিমাণে একটি অপরটিতে মিশাইলেও মিশ্রণ সমসত্ত্ব থাকে। সুতরাং ইথানল ও জলের মিশ্রণে যেটির আয়তন বেশী থাকে তাহাকে দ্রাবক ও অন্যটিকে দ্রাব বলা যায়।

প্রশ্ন। দ্রবণ, দ্রাবক, দ্রাব ও দ্রাবণ কাহাদের বলে, একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

দ্রবণ কত বিভিন্ন রকমের হইতে পারে নাম কর।

III-2.1. বিভিন্ন পদার্থের দ্রাবণ (Dissolution of different substances)।

সকল পদার্থ সব দ্রাবকে দ্রাবিত হয় না। কোন পদার্থ দ্রাবিত

হইবে কি না তাহা উহার নিজের প্রকৃতি ও দ্রাবকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কঠিন পদার্থের দ্রবণ তৈয়ারিতে উহার ডেলা না লইয়া উহার চূর্ণ অথবা ছোট খণ্ড নিলে দ্রাবণ তাড়াতাড়ি হয়। দ্রবণ তৈয়ারিতে জল, ইথানল, অ্যাসিটোন প্রভৃতি বিভিন্ন তরল পদার্থ দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সকল পদার্থই সব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় না। কোন পদার্থ এক দ্রাবকে দ্রবীভূত না হইলেও অন্য দ্রাবকে দ্রবীভূত হইতে পারে। নুন জলে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু ইথানলে দ্রবীভূত হয় না। গন্ধক জলে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু কার্বন ডাইসালফাইডে দ্রবীভূত হয়। ইথাইল ইথার (Ethyl ether) জলে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু ইথানলে দ্রবীভূত হয়। এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।

দ্রবণ তৈয়ারিতে দ্রাব ও দ্রাবকের মধ্যে কখনও কখনও রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে আবার কখনও ঘটে না। সোডিয়াম ক্লোরাইড, ইথানল অথবা অক্সিজেনের জলীয় দ্রবণ তৈয়ারিতে উহাদের সহিত জলের বিক্রিয়া হয় না। কিন্তু ক্যালসিয়াম অক্সাইড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদির জলীয় দ্রবণ তৈয়ারিতে উহাদের সহিত জলের বিক্রিয়া হয়।

কলয়ড "দ্রবণ" (Colloid "solution")। কখন দেখা যায় তরলে কঠিন পদার্থ ঠিক দ্রবীভূত না হইয়া দৃষ্টির অগোচর অতি ক্ষুদ্র কণার আকারে সারা তরলে ছড়াইয়া থাকে। আপাত দৃষ্টিতে এই মিশ্রণ সমসত্ত্ব। কিন্তু উহার মধ্য দিয়া আলোক কিরণ যাইতে দিলে আলোর পথ পাশ হইতে উজ্জ্বল বলিয়া দেখা যায়। যথার্থ দ্রবণে ইহা ঘটে না ; আলোর পথ দেখা যায় না। এই নূতন আপাত সমসত্ত্ব মিশ্রণ বা দ্রবণ আসলে অসমসত্ত্ব এবং সেই কারণেই উহা যথার্থ দ্রবণ নয়। তবু ইহাকে অনেক সময়ই 'কলয়ড দ্রবণ' বলা হয়। আমাদের পরিচিত বহু পদার্থই, যেমন দুধ, রক্ত, ডিমের সাদা অংশ বা অ্যালবুমিন (Albumin), ধোঁয়া, কুয়াশা ইত্যাদি এইরূপ অসমসত্ত্ব মিশ্রণ। ইহাদের সবকটিই কলয়ড দ্রবণ।

প্রশ্ন। সকল পদার্থ সব দ্রাবকে দ্রাবিত হয়? উদাহরণ দাও। কলয়ড দ্রবণ কি প্রকার পদার্থ?

III-2.2. দ্রবণের সাধারণ ধর্ম। দ্রাব ও দ্রাবকের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া না ঘটিলে সকল দ্রবণেরই কয়েকটি সাধারণ ধর্ম লক্ষ্য করা যায়, যেমন

(i) প্রত্যেক দ্রবণই স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মিশ্রণ।

(ii) দ্রাবক অথবা দ্রাবের যে বর্ণ থাকে দ্রবণেরও সেই বর্ণ হয়।

(iii) দ্রাব ও দ্রাবকের ওজনের যোগফল দ্রবণের ওজনের সমান।

(iv) নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ও চাপে কোন দ্রবণে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী দ্রাব দ্রবীভূত থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন জল ও ইথানলের দ্রবণে, একটি অপরটিতে যে কোন পরিমাণে দ্রবীভূত হয়

(v) দ্রাবণে দ্রাবকের ভৌত ধর্ম, যেমন স্ফুটনাঙ্ক, হিমাঙ্ক (Freezing point), বাষ্প চাপ (Vapour pressure) ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়। দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক ঐ দ্রবণের দ্রাবকের স্ফুটনাঙ্কের তুলনায় বেশী এবং উহার হিমাঙ্ক দ্রাবকের হিমাঙ্কের তুলনায় কম।

প্রশ্ন। জলীয় দ্রবণের সাধারণ ধর্মগুলি বল।

III-2.3. সংপৃক্ত, অসংপৃক্ত ও অতিপৃক্ত দ্রবণ (Saturated, unsaturated and supersatuated solution)। পদার্থের দ্রবণ তৈয়ারিতে নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় ও চাপে নির্দিষ্ট আয়তনের দ্রাবকে দ্রাবের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে দেখা যায় এক সময় আর বেশী দ্রাব দ্রবীভূত হয় না ; এইরূপ দ্রবণকে **সংপৃক্ত (Saturated)** দ্রবণ বলে। দ্রবণ সংপৃক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ দ্রবণকে **অসংপৃক্ত** (**Unsaturated**) দ্রবণ বলা হয়।

সাধারণত দ্রবণের উষ্ণতা বাড়াইলে কঠিন দ্রাব বেশী পরিমাণে দ্রবীভূত করা যায়। কিন্তু উষ্ণতা কমাইলে উহার বিপরীত ঘটে। সুতরাং সংপৃক্ত দ্রবণের উষ্ণতা বাড়াইলে উহার সংস্পর্শে দ্রাব না থাকিলে উহা অসংপৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয়। আবার অসংপৃক্ত দ্রবণের উষ্ণতা ক্রমাগত কমাইলে উহা কোন না কোন নিম্নতর উষ্ণতায় সংপৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয়। কঠিন দ্রাবের পরিমাণ দ্রবণের উপরস্থ চাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না বলিলেই হয়। সেজন্য কঠিন পদার্থের দ্রবণ তৈয়ারিতে চাপের উল্লেখ করা হয় না।

উদাহরণ। 25°C উষ্ণতায় 100g (এই g অক্ষরটি gram-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) জলে 30g-এর বেশী পটাসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু 50°C উষ্ণতায় একই পরিমাণ জলে 40 g পর্যন্ত পটাসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত হয়। সুতরাং 100 g জলে 25°C ও 50°C উষ্ণতায় যথাক্রমে 30 g ও 40 g পটাসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত থাকিলে উহারা সংপৃক্ত দ্রবণ। কিন্তু 25°C ও 50°C উষ্ণতায় 100 g জলে পটাসিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ যথাক্রমে 30 g ও 40 g-এর কম থাকিলে ঐ দ্রবণ দুইটিকে অসংপৃক্ত বলা হইবে। 50°C উষ্ণতায় সংপৃক্ত ঐ দ্রবণ 25°C উষ্ণতায় ঠাণ্ডা করিলে বাড়তি 10 g পটাসিয়াম ক্লোরাইড কেলাসের আকারে দ্রবণে থিতাইয়া পড়িবে।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখিবে একই উষ্ণতায় একই পরিমাণ দ্রাবক সংপৃক্ত করিতে বিভিন্ন দ্রাব বিভিন্ন পরিমাণে দরকার হয়। 15°C উষ্ণতায় 100 g জল সংপৃক্ত করিতে 35·5 g সোডিয়াম ক্লোরাইড দরকার হয়। কিন্তু ঐ একই উষ্ণতায় 100 g জল সিলভার ক্লোরাইডে সংপৃক্ত করিতে মাত্র 0·00015 g দরকার হয়।

অসংপৃক্ত দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণ খুব কম থাকিলে তাহাকে লঘু দ্রবণ (Dilute solution) এবং দ্রাবের পরিমাণ বেশী থাকিলে তাহাকে গাঢ় দ্রবণ (Concentrated solution) বলে।

কোন কেলাসের সংপৃক্ত দ্রবণ ঠাণ্ডা হইতে দিলে সাধারণত অতিরিক্ত দ্রাব কেলাসের আকারে পৃথক হয় ও দ্রবণ নিম্নতর উষ্ণতায় সংপৃক্তই থাকে।

অনেক সময়ে দেখা যায়, উচ্চতর উষ্ণতায় সংপৃক্ত দ্রবণ না নাড়িয়া ঠাণ্ডা করিলে নিম্নতর উষ্ণতায় সংপৃক্ততার অতিরিক্ত দ্রাব দ্রবণ হইতে আলাদা হয় না। এইরূপ দ্রবণকে **অতিপৃক্ত** (**Supersaturated**)দ্রবণ বলে। অতিপৃক্ত দ্রবণ নাড়িলে বা উহাতে দ্রাবের একটি কেলাস ফেলিলে উহার অতিপৃক্ততা নষ্ট হয় ও অতিরিক্ত দ্রাব কেলাসের আকারে আলাদা হয়। সোডিয়াম থায়োসালফেট (Sodium thiosulphate) অর্থাৎ ফটোগ্রাফির হাইপো (hypo)-র সংপৃক্ত দ্রবণ ঠাণ্ডা করিলে অতিপৃক্ত দ্রবণ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন। সংপক্ত, অসংপৃক্ত ও অতিপৃক্ত দ্রবণ কাহাদের বলে ? সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত দ্রবণের উপর উষ্ণতার ক্রিয়া বল।

III-2.4. দ্রবণীয়তা (বা দ্রাব্যতা) ও উহার উপর উষ্ণতার ও চাপের প্রভাব। (**Solubility and its relation with temperature and pressure**)। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় 100g দ্রাবক সংপৃক্ত করিতে যে পরিমাণ দ্রাব দরকার হয় তাহাই ঐ উষ্ণতায় ঐ দ্রাবকে দ্রাবের **দ্রবণীয়তা** বা দ্রাব্যতা (Solubility)।

পদার্থের দ্রবণীয়তা নিচের কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(i) দ্রাবের প্রকৃতি, (ii) দ্রাবকের প্রকৃতি, (iii) দ্রবণের উষ্ণতা ও (iv) দ্রবণের উপরস্থ চাপ।

দ্রাব ও দ্রাবকের প্রকৃতির উপর পদার্থের দ্রাবণ ও দ্রবণীয়তার নির্ভরতা সম্বন্ধে III-2.1 ও III-2.3 উপবিভাগে বলা হইয়াছে। সাধারণত দ্রবণের উষ্ণতা বাড়াইলে কঠিন ও তরল পদার্থের দ্রবণীয়তা বাড়ে, কিন্তু গ্যাসীয় পদার্থের এবং কোন কোন তরলের দ্রবণীয়তা কমে। দ্রবণের উষ্ণতা কমাইলে সাধারণত ইহার বিপরীত হয়। 25°C ও 50°C উষ্ণতায় 100g জল সংপৃক্ত করিতে যথাক্রমে 30g ও 40g পটাসিয়াম ক্লোরাইড দরকার হয়, অর্থাৎ 25°C ও 50°C উষ্ণতায় জলে পটাসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণীয়তা যথাক্রমে 30g ও 40g। কোন পদার্থের দ্রবণীয়তার উল্লেখে দ্রাবকের নাম ও উষ্ণতা বলিতে হয়। কিন্তু দ্রাবক হিসাবে জল ব্যবহৃত হইলে দ্রবণীয়তার উল্লেখে দ্রাবকের নাম সাধারণত বলা হয় না। দ্রবণীয়তা পদার্থের বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে কঠিন বা তরল দ্রাবের দ্রবণের উপর চাপের প্রভাব কম। কিন্তু দ্রাব গ্যাসীয় পদার্থ হইলে দ্রবণে চাপ বাড়াইলে গ্যাসীয় পদার্থ বেশী

পরিমাণে দ্রবীভূত হয় এবং চাপ কমাইলে উহার দ্রাবণ কমে। সোডা ওয়াটার (Soda water), লেমনেড ইত্যাদি দ্রবণে অতিরিক্ত চাপে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত থাকে বলিয়া বোতলের ছিপি খুলিলে ঐ উষ্ণতায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের দ্রবণীয়তার অতিরিক্ত গ্যাস বাহির হইয়া যায়।

প্রশ্ন। দ্রাব্যতা কাহাকে বলে ? উহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ? গ্যাসীয় দ্রবণের উপর চাপের ক্রিয়া কি রকম ?

III-3. রাসায়নিক চিহ্ন, সংকেত ও সমীকরণ (Chemical Symbols, Formulas and Equations)।

- গণিতে যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি কথার বদলে নানারকম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। আবার কোথাও বিভিন্ন সংকেত ও সমীকরণের সাহায্যে সংক্ষেপে বিভিন্ন বিষয় বুঝান হয়। শর্টহ্যাণ্ড (Shorthand) নামক দ্রুতলিখন পদ্ধতিতে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে কথা সংক্ষেপে ও তাড়াতাড়ি লেখা যায়। রসায়নেও একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন চিহ্ন, সংকেত ও সমীকরণ ব্যবহার করা হয়। 'চিহ্ন' কথাটি মৌলের নাম ও উহার পরমাণু এবং 'সংকেত' কথাটি মৌলের অণু, ও যৌগের অণু বা যৌগের নামের বদলে ব্যবহৃত হয়। পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন বুঝইতে, রাসায়নিক সমীকরণ ব্যবহার করা হয়। নিচের তিনটি উপবিভাগে ইহাদের সম্বন্ধে আলাদা করিয়া বলা হইয়াছে।

রাসায়নিক সংকেত ও সমীকরণ ঠিকমত বুঝিতে হইলে 'অণু' কথাটির সঠিক অর্থ জানা থাকা দরকার। যদিও 'অণু'কে দশম শ্রেণীর পাঠ্য করা হইয়াছে, তবুও বোঝার সুবিধার জন্য অণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের এখানে কয়েকটি কথা বলিয়া নেওয়া দরকার।

অণু। মৌলিক অথবা যৌগিক পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম কণা স্বাধীনভাবে (অর্থাৎ ঐ পদার্থেরই অন্য কণার সঙ্গে একত্র না থাকিয়াও আলাদা অবস্থায়) থাকিতে পারে, তাহাকে ঐ পদার্থের 'অণু' বলে ; এই কণায় ঐ মৌল বা যৌগের সকল রাসায়নিক ধর্মই থাকে। যৌগের অণুকে আরও ক্ষুদ্র করিতে গেলে উহার রাসায়নিক ধর্মগুলি আর থাকে না। সাধারণত অণুতে একের বেশী পরমাণু যুক্ত থাকে। কিন্তু সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি সমস্ত ধাতুর মৌলের স্বাধীন সত্তার ক্ষুদ্রতম কণা উহার পরমাণু, অর্থাৎ একাধিক পরমাণু যুক্ত হইয়া উহাদের কোন অণু সৃষ্টি করে না। হিলিয়াম (Helium), আরগন (Argon) প্রভৃতি মৌলও এই রকম। এগুলির ক্ষেত্রে অণুর উল্লেখ ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নয়। উহাদের স্বাধীন সত্তার ক্ষুদ্রতম কণা 'পরমাণু'ই অনেক সময় উহাদের 'অণু' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অনেক যৌগই অণু দিয়া গঠিত, যেমন জল, কার্বন মনক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলিয়া সব যৌগেও, যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম অক্সাইড ইত্যাদিতে উহাদের কোন অণু নাই, অর্থাৎ ঐ সকল যৌগের রাসায়নিক ধর্মবিশিষ্ট স্বাধীন সত্তার কোন ক্ষুদ্রতম কণা নাই। এগুলিকে 'আয়নিক' যৌগ বলে (III-4 বিভাগ দেখ)। সুতরাং ইহাদের বেলায়ও 'অণু'র উল্লেখ করা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

প্রশ্ন। অণু কাহাকে বলে? সকল মৌল ও যৌগের অণু থাকে কি? উদাহরণ দাও।

III-3.1. রাসায়ণিক চিহ্ন (Chemical Symbols)।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোথাও কোথাও একই মৌলের বা যৌগের চলিত ভাষায় বিভিন্ন নাম আছে। কিন্তু সমস্ত দেশের রসায়ন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মৌলের ও যৌগের একই নাম ব্যবহার করেন।

সুদূর অতীতে (খ্রীঃ পূঃ 3000—4000) যখন রাসায়নিক মৌল বা যৌগ সম্বন্ধে মানুষ কিছুটা ধারণা করিতে শিখিয়াছিল, তখন হইতেই মানুষ বিভিন্ন মৌল বা যৌগ বুঝাইতে বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করিত। সূর্য, চন্দ্র ও নানারকমের ছবি আঁকিয়া সোনা রূপা ইত্যাদি বিভিন্ন মৌল বুঝান হইত। এখন এ উদ্দেশ্যে সুইডিশ বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াসের (Berzelius, 1811 খ্রীঃ) আবিষ্কৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী কোন মৌলের বিশদ ল্যাটিন, গ্রীক বা অন্য নামের বদলে সংক্ষেপে সেই মৌল বুঝাইতে সাধারণত সেই মৌলের নামের প্রথম একটি বা দুইটি অক্ষর অক্ষর অথবা প্রথম অক্ষরের সঙ্গে অন্য একটি অক্ষর লেখা হয়। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

চলিত বাংলা নাম	ইংরেজী নাম	ল্যাটিন বা গ্রীক নাম	রাসায়নিক চিহ্ন
সোনা	Gold	Aurum	Au
রূপা	Silver	Argentum	Ag
আরগন	Argon	Argos	A
তামা	Copper	Cuprum	Cu
ক্লোরিন	Chlorine	Chloros	Cl
কার্বন	Carbon	—	C
লোহা	Iron	Ferrum	Fe
ফ্লুওরিন	Fluorine	Fluere	F
গন্ধক	Sulphur	—	S

মৌলের চিহ্নের তাৎপর্য (Significance of symbols)।

কোন মৌলের নামের বদলে চিহ্ন লিখিলে (১) সাধারণত সেই মৌলের একটি পরমাণু বুঝায়। তাছাড়া (২) রাসায়নিক হিসাবের কাজে কোন মৌলের চিহ্ন সেই মৌলের বা পরমাণু-ভারের (Atomic weight) প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। (Atomic weight দশম শ্রেণীর পাঠ্য)। (৩) মৌলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবেও চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। H চিহ্নটি স্থান বিশেষে (১) একটি হাইড্রোজেন পরমাণু, (২) তাহার পরমাণু-ভার বা (৩) হাইড্রোজেন বুঝাইতে পারে। দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু বুঝাইতে 2H লেখা হয়।

প্রশ্ন। মৌলের রাসায়নিক কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়?

III-3.2. রাসায়নিক সংকেত (Chemical Formula)। প্রকৃতিতে মৌলগুলি কখনও আলাদা ভাবে আবার কখনও অন্য মৌলের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে মিলিত হইয়া যৌথ গঠন করিয়া যৌগরূপে থাকে। উহারা যে যেরূপে অবস্থান করে রাসায়নিক সংকেতের সাহায্যে প্রথমত তাহাই বুঝান হয়। তাহা ছাড়া ইহাদের অন্যান্য বিশেষ অর্থেও ব্যবহার আছে। নিচে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। মৌলের রাসায়নিক চিহ্ন দিয়া বিভিন্ন রাসায়নিক সংকেত গঠন করা হয়।

(ক) মৌলের আণবিক সংকেত (Molecular formula)। মৌলের পরমাণু বুঝাইতে আমরা মৌলের চিহ্ন লিখি। কিন্তু মৌলের 'অণু' বুঝাইতে আমরা মৌলের 'আণবিক সংকেত' (Molecular formula) ব্যবহার করি। আণবিক সংকেতে অণুগঠনকারী পরমাণুর সংখ্যা মৌলের চিহ্নের ডান পাশে একটু নিচে লেখা হয়।

হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), ফসফরাস (P) ও সালফারের (S-এর) অণুতে যথাক্রমে ইহাদের দুইটি, দুইটি, চারিটি ও আটটি পরমাণু থাকে। সেজন্য ইহাদের আণবিক সংকেত যথাক্রমে H_2, O_2, P_4 ও S_8 লেখা হয়। দুইটি হাইড্রোজেন অণু, তিনটি অক্সিজেন অণু ইত্যাদি বুঝাইতে হইলে যথাক্রমে $2H_2$, $3O_2$ ইত্যাদি লিখিতে হয়।

যে সমস্ত মৌলের (যেমন হিলিয়াম, নিয়ন, সোডিয়াম, আয়রন (লোহা) ইত্যাদির অণু নাই, তাহাদের আণবিক সংকেতও নাই।

বিভিন্ন অর্থে মৌলের আণবিক সংকেতের ব্যবহার। (i) ইহা মৌলের অণু বুঝাইতে ব্যবহার হয়; (ii) ইহা হইতে অণু গঠনকারী পরমাণুর সংখ্যা জানা যায়; (iii) এই সংখ্যা ও মৌলের পরমাণু-ভারের (Atomic weight) সাহায্যে

মৌলের আণবিক-ভার (Molecular weight) হিসাব করা হয় (H_2 অণুর আণবিক-ভার 2×1·0079=2·0158।) (iv) গ্যাসীয় মৌলের ক্ষেত্রে উহার আণবিক সংকেত 'এক আয়তন' (One volume) গ্যাসের প্রতীক। বিভিন্ন গ্যাসের 'এক আয়তন' বলিতে একই উষ্ণতা ও চাপে যে কোন আয়তন বুঝায়।

(খ) যৌগের সংকেত। যৌগের সংকেত তিন রকমের হইতে পারে (i) আণবিক সংকেত (Molecular formula), (ii) আনুপাতিক সংকেত (Empirical formula) ও (iii) গঠন বা সংযুতি সংকেত (Structural formula)। মৌলের চিহ্ন দিয়া যৌগের বিভিন্ন ধরনের সংকেত লেখার বিশেষ নিয়ম আছে। ইহা একটু পরেই বলা হইতেছে।

(i) যৌগের আণবিক সংকেতে কোন যৌগের অণু গঠনকারী বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সঠিক সংখ্যা দেখান হয়। জলের অণু দুইটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু দিয়া গঠিত ; এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি জলের আণবিক সংকেত 'H_2O' লিখিয়া বুঝান হয়। 'জল' কথাটির বদলে H_2O লেখা প্রচলিত। মৌলের আণবিক সংকেতের মত যৌগের আণবিক সংকেতও একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় (পূর্ববর্তী 'ক' অংশে 'বিভিন্ন অর্থে মৌলের আণবিক সংকেতের ব্যবহার' দেখ)।

যৌগের আণবিক সংকেত লেখার নিয়ম ঃ

(১) দুই বা ততোধিক মৌল দিয়া কোন যৌগ গঠিত হইলে উহাদের চিহ্ন পাশাপাশি লিখিয়া ঐ যৌগের অণু গঠনকারী প্রত্যেকটি মৌলের পরমাণুর সংখ্যা তাহাদের চিহ্নের ডান পাশে একটু নিচে লিখিয়া দেখাইতে হয়। হাইড্রোজেন পেরক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের আণবিক সংকেত যথাক্রমে H_2O_2 ও CO_2।

(২) যৌগ গঠনকারী মৌলের চিহ্ন পাশাপাশি লেখার সময় কম ইলেক্ট্রোনিগেটিভ মৌলের চিহ্ন আগে (বাঁয়ে) এবং তার চেয়ে বেশী ইলেক্ট্রোনিগেটিভ মৌল ডাইনে লিখিতে হয়। ইলেক্ট্রোনিগেটিভ (Electronegative) কথাটির আলোচনা এখানে করা যাইবে না। তবে সুবিধার জন্য নিচে কতকগুলি সাধারণ মৌলকে ক্রমবর্ধমান ইলেক্ট্রোনিগেটিভ ধর্ম অনুসারে সাজাইয়া দেখান হইল। দেখিবে ইহার গোড়ার বিভিন্ন ধাতু ও শেষে বিভিন্ন অধাতু।

Cs, Rb, K, Na, Ca, Mg, Al, Sn, Sb, Si, B, As, H, P, I, C, S, Br, N, Cl, O, F।

উপরের ক্রম অনুযায়ী হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, ক্লোরিন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রিক এসিডের আণবিক সংকেত যথাক্রমে HCl, ClO_2 ও HNO_3 রূপে লিখিতে হইবে।

(ii) আনুপাতিক সংকেত (**Empirical formula**)। আমরা এই বিভাগের গোড়ার দিকে জানিয়াছি যে সব যৌগের অণু নাই। ইহাদের অণু নাই বলিয়া ইহাদের আণবিক সংকেতও লেখা যায় না। সেইজন্য এইসব যৌগ গঠনকারী বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সঠিক সংখ্যার তুলনামূলক হিসাব বুঝাইতে 'আনুপাতিক সংকেত' (Empirical formula) ব্যবহার করা হয়। যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইডের কোন অণু নাই ; কিন্তু ইহাতে সোডিয়াম ও ক্লোরিনের পরমাণুর সংখ্যা সমান অর্থাৎ Na : Cl=1 : 1। সুতরাং সোডিয়াম ক্লোরাইডের আনুপাতিক সংকেত NaCl। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডেরও কোন অণু নাই। ইহার আনুপাতিক সংকেত Al_2O_3 অর্থাৎ ইহাতে অ্যালুমিনিয়াম ও অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত=2 : 3। আনুপাতিক সংকেতে উপরের ইলেক্ট্রোনিগেটিভিটির ক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন মৌলের চিহ্ন পাশাপাশি লেখা হয়।

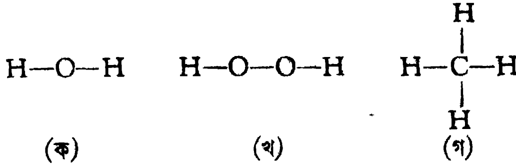
কোন যৌগ অণু দিয়া গঠিত হইলে উহার আনুপাতিক সংকেত ও আণবিক সংকেত এক হইতে পারে, আবার দুইটির মধ্যে পার্থক্যও থাকিতে পারে। যেমন জলের H_2O সংকেত বা মিথেনের CH_4 সংকেতটি উহাদের উভয় প্রকারের সংকেত বুঝায়। কিন্তু হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের আনুপাতিক সংকেত HO ও উহার আণবিক সংকেত H_2O_2। লক্ষ্য কর হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের আণবিক সংকেতটি উহার আনুপাতিক সংকেতের দ্বিগুণ। ইহা উপরের দুই প্রকারের সংকেতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ইঙ্গিত দিতেছে। লক্ষ্য কর আণবিক সংকেতে আনুপাতিক সংকেত নিহিত রহিয়াছে।

আনুপাতিক সংকেতের ব্যবহার। (১) ইহা কোন যৌগ গঠনকারী বিভিন্ন পরমাণুর আনুপাতিক হিসাব জানায়। (২) যে সমস্ত যৌগের আণবিক সংকেত নাই তাহাদের ক্ষেত্রে আণবিক ভারের (Molecular weight-এর) মত আনুপাতিক সংকেত অনুযায়ী 'সংকেত-ভার' (Formula weight) হিসাব করা হয়।

[পরমাণু-ভার (Atomic weight), আণবিক-ভার (Molecular weight) ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয় দশম শ্রেণীতে পাঠ্য করা হইয়াছে। কাজেই নবম শ্রেণীতে এগুলি পুরাপুরি বোঝা না যাইতে পারে। না বুঝিলে মুখস্থ করার কোন দরকার নাই।]

(iii) গঠন বা সংযুতি সংকেত (**Structural formula**)। আণবিক সংকেত জানা থাকিলেও অণুতে কোন্ পরমাণু অন্য কোন্ পরমাণুর সঙ্গে কিভাবে যুক্ত রহিয়াছে তাহা জানা যায় না। কিন্তু তাহা জানা ও সংযুতি সংকেতে প্রকাশ করা রসায়নের

অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সংযুতি সংকেতের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে 'যোজ্যতা' (Valency) সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। কিন্তু 'যোজ্যতা' দশম শ্রেণীর আলোচ্য বিষয়। যাহা হউক, এখানে অল্প সংখ্যক উদাহরণ দিয়া আমরা সংযুতি সংকেতের প্রকৃতি বুঝাইব। জল, হাইড্রোজেন পেরক্সাইড ও মিথেনের সংযুতি সংকেত নিচে দেখান হইয়াছে। এই সংকেতে দুইটি পরমাণুর চিহ্নের মাঝখানে ড্যাশ চিহ্ন (—) দিয়া পরমাণু দুইটির মধ্যে রাসায়নিক বন্ধন (Chemical bond) বুঝান হয়।



জলের সংকেতটি (ক) বুঝায় যে জলের অণুতে অক্সিজেন পরমাণুটির সঙ্গে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু আলাদাভাবে যুক্ত রহিয়াছে। হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের সংযুতি সংকেত (খ) একটি অক্সিজেন পরমাণুর সহিত আর একটি অক্সিজেন পরমাণুর এবং প্রত্যেকটি অক্সিজেন পরমাণুর সহিত একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর রাসায়নিক বন্ধন নির্দেশ করিতেছে। মিথেনের সংযুতি সংকেত (গ)-কেও এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রশ্ন। রাসায়নিক সংকেত (formula) বলিতে কি বুঝায়? মৌলের ক্ষেত্রে সংকেতগুলি কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়? H, 2H এবং H_2-র অর্থে প্রভেদ কি?

যৌগের রাসায়নিক সংকেত কয় প্রকারের হইতে পারে? এই বিভিন্ন প্রকার সংকেতের অর্থ উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

যৌগের আণবিক সংকেত কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়?

III-3.3. রাসায়নিক সমীকরণ (Chemical equation)।

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের পরিবর্তন ঘটিয়া নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়। সাধারণ ভাষায় লিখিয়া কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্বন্ধে তথ্য জানান যায়। কিন্তু বীজগণিতের সমীকরণের মত যৌগের সংকেত এবং ক্ষেত্রবিশেষে মৌলের চিহ্ন অথবা সংকেতের সাহায্যে সমীকরণ লিখিয়াও বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়। এই পদ্ধতিকে **রাসায়নিক সমীকরণ** বলে। কোন বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়জ পদার্থ কি কি তাহা সম্পূর্ণভাবে জানা থাকিলে তবেই ঐ বিক্রিয়াকে রাসায়নিক সমীকরণ রূপে প্রকাশ করা সম্ভব।

রাসায়নিক সমীকরণ দুই রকম—

(i) 'কাঠামো সমীকরণ' (Skeleton equation) ও (ii) 'প্রতিমিত সমীকরণ' (Balanced equation)। সাধারণত সমীকরণ বলিতে প্রতিমিত সমীকরণকেই

বুঝায়। কি কি বিক্রিয়ক হইতে কি কি বিক্রিয়জ উৎপন্ন হইল, কাঠামো সমীকরণে কেবল তাহাই নির্দেশ করে। সমীকরণ লেখার সময় প্রথমে সমীকরণটি ভাষায় ও তারপর কাঠামো সমীকরণে প্রকাশ করিয়া নিলে প্রতিমিত সমীকরণ লিখিতে সুবিধা হয়।

রাসায়নিক সমীকরণ লেখার সময় অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে বিক্রিয়ার ফলে এক বা একাধিক পদার্থ হইতে এক বা একাধিক নূতন রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কোন পরমাণুরই বিনাশ ঘটে না। কাঠামো সমীকরণে এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয় না। কিন্তু প্রতিমিত সমীকরণে এ ত্রুটি থাকে না।

সমীকরণ লেখার নিয়ম। (i) রাসায়নিক সমীকরণে সাধারণত মৌল বা যৌগের আণবিক সংকেত ব্যবহার করা হয়, যেমন হাইড্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে যথাক্রমে H_2 ও CO_2। কিন্তু যে সমস্ত মৌল বা যৌগের অণু না থাকায় আণবিক সংকেত নাই, তাহাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে চিহ্ন ও আনুপাতিক সংকেত ব্যবহার করা হয়। যেমন সোডিয়ামের ক্ষেত্রে Na ও পটাসিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে KCl।

(ii) রাসায়নিক সমীকরণে দুইটি রাসায়নিক পদার্থের চিহ্ন অথবা সংকেতের মাঝে '+' চিহ্ন 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন $Zn+H_2SO_4$।

(iii) সমীকরণের বাঁ দিকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থ (বিক্রিয়ক) ও ডান দিকে রাসায়নিক বিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন পদার্থের (বিক্রিয়জের) সংকেত অথবা ক্ষেত্রবিশেষে চিহ্ন (উপরের (i) নিয়ম অনুযায়ী) লেখা হয়।

(iv) সমীকরণ লিখিয়া অবশ্যই উহাকে **প্রতিমান (balance)** করিতে হয় অর্থাৎ লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়জের চিহ্ন ও সংকেত বাদ না যায় এবং সমীকরণের বাঁ দিকে ও ডান দিকে প্রত্যেকটি মৌলের চিহ্নের নিজস্ব সংখ্যা যেন সমান হয়।

(v) কাঠামো সমীকরণে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়জের মাঝখানে 'তীর চিহ্ন (→)', এবং প্রতিমিত সমীকরণে উহাদের মাঝখানে 'সমান চিহ্ন' (=) দেওয়া হয়। তবে, উভয় ক্ষেত্রেই তীর চিহ্ন দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

নিচে কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়া উহাদের রাসায়নিক সমীকরণে দেখান হইল। এগুলিতে উপরের নিয়মগুলির ব্যবহার দেখান হইয়াছে।

(ক) মারকিউরিক অক্সাইড (HgO) উত্তপ্ত করিলে মারকারি (Hg) ও অক্সিজেন তৈয়ারি হয়। এই তথ্যটি—

(i) সংক্ষেপে ভাষায়—মারকিউরিক অক্সাইড→মারকারি+অক্সিজেন (তীরের দিক বিক্রিয়জ নির্দেশ করে),

(ii) কাঠামো সমীকরণে—$HgO \rightarrow Hg + O_2$, এবং

(iii) প্রতিমিত সমীকরণে—$2HgO = 2Hg + O_2$ রূপে লেখা হয়।

উপরের সমীকরণে বাঁ দিকে বিক্রিয়ক ও ডান দিকে বিক্রিয়জ লেখা হইয়াছে। কাঠামো সমীকরণে ভাষায় লেখা সমীকরণটি দেখান হইয়াছে। ইহাতে 'তীর' চিহ্নের দুই পাশে মারকারির চিহ্নের সংখ্যা সমান হইলেও অক্সিজেন চিহ্নের সংখ্যা সমান নয়। কিন্তু প্রতিমিত সমীকরণটিতে মারকারি ও অক্সিজেন প্রত্যেকটির চিহ্নের সংখ্যা সমীকরণের দুই পাশে সমান।

(খ) রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে। এই তথ্যটি—

(i) সংক্ষেপে ভাষায়—হাইড্রোজেন+অক্সিজেন→জল,

(ii) কাঠামো সমীকরণে—$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$, এবং

(iii) প্রতিমিত সমীকরণে—$2H_2 + O_2 = 2H_2O$ রূপে লেখা হয়।

প্রতিমিত সমীকরণটিতে দেখিবে সমীকরণের দুই পাশেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের চিহ্নের সংখ্যা যথাক্রমে 4 ও 2। কাঠামো সমীকরণে তাহা নয়।

(গ) জিংক ধাতু ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ার ফলে জিংক ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস তৈয়ারি হয়। এই তথ্যটি—

(i) সংক্ষেপে ভাষায়—জিংক+হাইড্রোক্লোরিক এসিড→জিংক ক্লোরাইড+হাইড্রোজেন,

(ii) কাঠামো সমীকরণে—$Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$, এবং

(iii) প্রতিমিত সমীকরণে—$Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2$ রূপে লেখা হয়।

প্রতিমিত সমীকরণটিতে বাঁ ও ডানদিকে দুই পাশেই Zn, H ও Cl চিহ্নের সংখ্যা যথাক্রমে 1, 2 ও 2। কাঠামো সমীকরণে তাহা নয়।

এই উদাহরণগুলি হইতে রাসায়নিক সমীকরণ 'প্রতিমান করা' (balancing) কাহাকে বলে এবং উহা কিভাবে করিতে হয় বুঝিতে পারিবে।

প্রশ্ন। রাসায়নিক সমীকরণ কাহাকে বলে? উহাকে কি কি ভাবে লেখা যায়? সমীকরণ প্রতিমান করা (balancing) বলিতে কি বুঝায়? ইহার দুইটি উদাহরণ দাও। নিচের কাঠামো সমীকরণটি (Skeleton equation) প্রতিমিত কর—


$$H_2O + Cl_2 \rightarrow HCl + O_2$$

এই কাঠামো সমীকরণটি কি বুঝায় তাহা ভাষায় বল।

III-3.4. রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য (Significance of chemical equations)। যে কোন রাসায়নিক প্রতিমিত সমীকরণ দেখিয়া আমরা নিচের তথ্যগুলি জানিতে পারি।

(i) কোন্ কোন্ পদার্থ হইতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে কোন্ কোন্ পদার্থ সৃষ্টি হয়। ইহা বিক্রিয়কের রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দেয়, যেমন $Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2$ সমীকরণটি দেখিয়া বলা যায় যে জিংক ও সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়ার ফলে জিংক সালফেট ও হাইড্রোজেন তৈয়ারি হয়।

(ii) রাসায়নিক সমীকরণ দেখিয়া বোঝা যায় কোন্ কোন্ পদার্থের কয়টি অণু বা পরমাণু বিক্রিয়ার সাহায্যে কোন্ কোন্ পদার্থের কয়টি অণু তৈয়ারি করে। যেমন $2H_2+O_2=2H_2O$ সমীকরণটি দেখিয়া বোঝা যায় যে দুইটি হাইড্রোজেন অণু একটি অক্সিজেন অণুর সহিত বিক্রিয়া করিয়া জলের দুইটি অণু তৈয়ারি করে।

(iii) প্রত্যেক মৌলের পরমাণু-ভার (Atomic weight) জানা থাকায় বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়জের সংকেত ও চিহ্ন হইতে প্রত্যেকটির পরিমাণ হিসাব করা যায়।

(iv) বিক্রিয়ক অথবা বিক্রিয়জ অথবা দুই-ই গ্যাসীয় পদার্থ হইলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে ও পরে গ্যাসীয় রাসায়নিক পদার্থের আয়তন জানা যায়।

একই চাপে ও উষ্ণতায় যে কোন গ্যাসীয় পদার্থের অণুর সংকেত উহার 'এক আয়তন' (one volume) পরিমাণ আয়তনের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, H_2 লিখিলে 'এক আয়তন' হাইড্রোজেন গ্যাস বুঝায়। (111 পৃষ্ঠার প্রথম প্যারা দেখ।) নিচের সমীকরণগুলিতে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়জের আয়তন লক্ষ্য কর।


(a) $H_2+Cl_2=2HCl$

এই বিক্রিয়ায় 'এক আয়তন' হাইড্রোজেন ও 'এক আয়তন' ক্লোরিন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে 'দুই আয়তন' হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। সুতরাং এই বিক্রিয়ার আগে ও পরে গ্যাসীয় পদার্থের মোট আয়তন সমান।


(b) $2H_2+O_2=2H_2O$

এই বিক্রিয়ায় 'দুই আয়তন' হাইড্রোজেন ও 'এক আয়তন' অক্সিজেন রাসায়নিক মিলনে 'দুই আয়তন' জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে অর্থাৎ বিক্রিয়কের তুলনায় বিক্রিয়জের আয়তনের পরিমাণ 'এক আয়তন' কম।

প্রশ্ন। প্রতিমিত রাসায়নিক সমীকরণ (balanced chemical equation) হইতে আমরা কি কি তথ্য আহরণ করিতে পারি তাহা একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বল।

III-4. বৈদ্যুত বিভাজন (**Electrolysis**)। বিশুদ্ধ জলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ কার্যত যাইতে পারে না। কিন্তু কোন কোন যৌগের জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-ধারা সহজেই প্রবাহিত হইতে পারে। প্রবাহকালে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটি.তে দেখা যায়। এই ঘটনাকে 'বৈদ্যুত বিভাজন' বা ইলেকট্রোলাইসিস (Electrolysis) বলে।

বৈদ্যুত বিভাজন বুঝিতে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে আমাদের সামান্য একটু জ্ঞান দরকার হইবে। দশম শ্রেণীতে গঠন সম্বন্ধে তোমরা বিশদভাবে জানিতে পারিবে। এখানে অল্পকথায় উহা বলা হইতেছে।

পরমাণু তিন প্রকার অতি ক্ষুদ্র কণায় গঠিত। ইহাদের নাম ইলেকট্রন (Electron), প্রোটন (Proton) ও নিউট্রন (Neutron)। ইলেকট্রন নিগেটিভ বিদ্যুৎ-আধানের (Electric charge-এর) ক্ষুদ্রতম কণা। প্রোটন পজিটিভ বিদ্যুৎ-আধানের ক্ষুদ্রতম কণা এবং ইহাতে পজিটিভ আধানের পরিমাণ ইলেকট্রনের নিগেটিভ আধানের পরিমাণের ঠিক সমান। নিউট্রনে কোন প্রকার আধান নাই ; কিন্তু ওজনে উহা কার্যত প্রোটনের সমান। সাধারণ অবস্থায় যে কোন পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা ও প্রোটনের সংখ্যা সমান ; অতএব পরমাণুতে পজিটিভ বা নিগেটিভ কোন প্রকার আধানের আধিক্য থাকে না।

আয়ন (Ion)। পরমাণুতে ইলেকট্রন যুক্ত হওয়া অথবা পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হওয়াকে পরমাণুর আয়নিত হওয়া বা 'আয়নন' (Ionization) বলে।

পরমাণু হইতে একটি বা একাধিক ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইলে বাকী যে অংশ থাকে তাহাকে **'পজিটিভ আয়ন'** (**Positive ion**) **বা ক্যাটায়ন** (**Cation**) বলে। ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন পরমাণুতে পজিটিভ আধানের আধিক্য থাকে। হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি মাত্র ইলেকট্রন ও একটি মাত্র প্রোটন আছে। অতএব হাইড্রোজেন হইতে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইলে কেবল পজিটিভ আধানবিশিষ্ট প্রোটনটি থাকে।

ইলেকট্রন-বিচ্ছিন্ন হাইড্রোজেন পরমাণুকে 'হাইড্রোজেন আয়ন' বলা হয়, এবং উহাকে H^+ চিহ্ন দিয়া বুঝান হয়। H-এর উপরে ডান দিকের যোগ চিহ্নটিতে বুঝায় যে H পরমাণু হইতে একটি ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং ফলে বাকী অংশে এক পজিটিভ আধানের আধিক্য ঘটিয়াছে। এই বাকী অংশ অর্থাৎ H^+-ই প্রোটন। তামার (Copper-এর) পরমাণু Cu হইতে একটি বা দুটি ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। একটি গেলে বাকী অংশ Cu^+ লিখিয়া বুঝান হয়। দুটি বিচ্ছিন্ন হইলে বাকী অংশকে লেখা হয় Cu^{++} অথবা Cu^{2+}। Cu^+ ও Cu^{2+}

আয়ন দুটি আলাদা করিয়া বুঝাইতে প্রথমটিকে কিউপ্রাস (Cuprous) আয়ন ও দ্বিতীয়টিকে কিউপ্রিক (Cupric) আয়ন বলা হয়। মৌলের চিহ্ন ও ইলেকট্রন কথাটির বদলে e^- চিহ্ন ব্যবহার করিয়া পরমাণু হইতে পজিটিভ আয়ন সৃজন সংক্ষেপে বুঝান যায়। হাইড্রোজেন ও কপার-এর বেলায় ইহা নিম্নরূপ :



$$H = H^+ + e^-$$



$$Cu = Cu^+ + e^-$$



$$Cu = Cu^{2+} + 2e^-$$

ধাতুর পরমাণু হইতে অনেকটা সহজেই এক বা একাধিক ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, এবং উহারা সহজেই পজিটিভ আয়নে পরিণত হয়। এই কারণে ধাতুকে ইলেকট্রোপজিটিভ (Electropositive) বলা হয়।

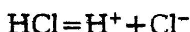
নিগেটিভ আয়ন (**Negative ion**) **বা অ্যানায়ন** (**Anion**)। এক পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন অন্য পরমাণুতে বা পরমাণুগুচ্ছে যুক্ত হইতে পারে। যখন কোন পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন যুক্ত হওয়ায় উহার ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী হয়, তখন উহাকে 'নিগেটিভ আয়ন' বা 'অ্যানায়ন' বলে। নিগেটিভ আয়নে নিগেটিভ আধানের আধিক্য থাকে। অধাতুর পরমাণুতে ইলেকট্রন সহজেই যুক্ত হইয়া নিগেটিভ আয়ন সৃষ্টি করিতে পারে। এই কারণে অধাতুকে ইলেকট্রোনিগেটিভ (Electronegative) বলা হয়।

পজিটিভ আয়নে যেভাবে পজিটিভ আধানের আধিক্য বুঝান হয়, নিগেটিভ আয়নেও সেইরূপ, যেমন $Cl + e^- = Cl^-$ লিখিয়া ক্লোরিন পরমাণু হইতে ক্লোরিন আয়ন সৃষ্টি বুঝান হয়। অক্সিজেন পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রন যুক্ত হইলে উহা O^{--} বা O^{2-} নিগেটিভ আয়নে পরিণত হয়। সোডিয়াম নাইট্রেটে ($NaNO_3$-তে) সোডিয়ামের ত্যক্ত ইলেকট্রন বাকী NO_3 অংশে যুক্ত হইয়া উহাকে NO_3^- আয়নে পরিণত করে।

সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl), হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ইত্যাদিকে জলে দ্রবীভূত করিলে উহারা আয়নিত হয়। NaCl হইতে Na^+ ও Cl^- আয়ন, HCl হইতে H^+ ও Cl^- আয়ন এবং H_2SO_4 হইতে $2H^+$ ও SO_4^{2-} (সালফেট আয়ন) উৎপন্ন হয়।



$$NaCl = Na^+ + Cl^-$$



$$HCl = H^+ + Cl^-$$



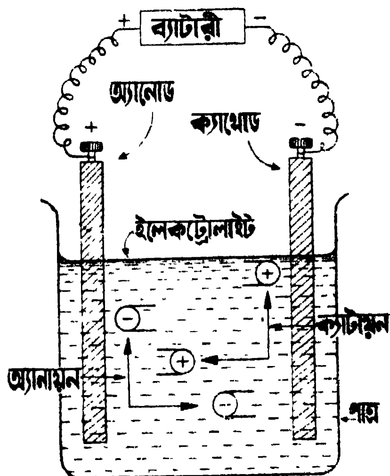
$$H_2SO_4 = 2H^+ + SO_4^{2-}$$

প্রশ্ন। পজিটিভ ও নিগেটিভ আয়ন কাহাদের বলে দুইটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

III-4.1. ইলেকট্রোলাইট ও নন-ইলেকট্রোলাইট (Electrolytes and Non-electrolytes)। যে সকল পদার্থ তরল বা দ্রাবিত অবস্থায় পজিটিভ ও নিগেটিভ আয়নের সাহায্যে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে তাহাদের **'ইলেকট্রোলাইট'** বলে। (এই পরিবহণ পারদ (Mercury) বা গলিত ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবহণের প্রক্রিয়া হইতে পৃথক। গলিত ধাতু কেবল ইলেকট্রনের সাহায্যে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে।) সোডিয়াম ক্লোরাইড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, ইত্যাদি ইলেকট্রোলাইটের উদাহরণ। ইহারা জলে দ্রবীভূত হইয়া বিভিন্ন আয়ন উৎপন্ন করে। ইলেকট্রোলাইটের ধর্ম অনুসারে উহাদের 'জোরাল' (Strong) ও 'দুর্বল' (Weak) দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা এ স্তরে করা হইবে না।

যে সকল পদার্থ তরল বা দ্রাবিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না তাহাদের 'নন-ইলেকট্রোলাইট' বলে, অর্থাৎ যাহারা ইলেকট্রোলাইট নয় তাহারাই নন-ইলেকট্রোলাইট। চিনির জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না—চিনি নন-ইলেকট্রোলাইট।

ইলেকট্রোলাইসিস সেল (Electrolysis cell), অ্যানোড (Anode) ও ক্যাথোড (Cathode)। কোন পাত্রে ইলেকট্রোলাইটের দ্রবণে একই ধাতুর দুখানা পাত ডুবাইয়া উহাদের ইলেকট্রিক ব্যাটারী (Electric battery) বা বিদ্যুৎ উৎপাদক কোন ব্যবস্থার দুই প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দ্রবণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালনা করা যায়। দ্রবণে ডুবান ধাতু-পাত দুইটিকে **'ইলেকট্রোড'** (Electrodes) বলে। ধাতুর যে পাতটি ব্যাটারীর নিগেটিভ প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহাকে 'নিগেটিভ ইলেকট্রোড' বা 'ক্যাথোড' (Negative electrode বা Cathode) বলে। ধাতুর যে পাতটি ব্যাটারীর পজিটিভ প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহাকে 'পজিটিভ ইলেকট্রোড' বা 'অ্যানোড' (Positive electrode বা Anode) বলে। ব্যাটারীর মত ক্যাথোড ও অ্যানোড বুঝাইতে যথাক্রমে '−' চিহ্ন ও '+' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। ব্যাটারী হইতে দ্রবণে ক্যাথোড দিয়া ইলেকট্রন প্রবেশ করে ও অ্যানোড দিয়া দ্রবণ হইতে ইলেকট্রন ব্যাটারীতে ফিরিয়া যায়। কোন পাত্রের অ্যানোড, ক্যাথোড ও



III-2 চিত্র

ইলেকট্রোলাইটের সমষ্টিকে **ইলেকট্রোলাইসিস সেল (Electrolysis cell)** বা **ইলেকট্রোলাইটিক সেল (Electrolytic cell)** বলে। (III-2 চিত্র দেখ)।

ইলেকট্রোলাইসিস সেলে ব্যাটারীর সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করিলে উহাতে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি ঘটনা ঘটে :

(i) ইহার ফলে ক্যাথোডে ইলেকট্রনের আধিক্য ও অ্যানোডে ইলেকট্রনের অভাব দেখা দেয়।

(ii) ক্যাথোড দ্রবণের পজিটিভ আয়নগুলিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ও উহাদের ইলেকট্রন দান করে।

(iii) পজিটিভ আয়ন ইলেকট্রন পাইয়া উহার আয়নিত অবস্থা হারায়।

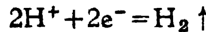
(iv) অ্যানোড নিগেটিভ আয়নগুলিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ও উহাদের নিকট হইতে উহাদের বাড়তি ইলেকট্রন সংগ্রহ করে। ইহার ফলে নিগেটিভ আয়ন উহার আয়নিত অবস্থা হারায়।

(v) উপরের সমগ্র ক্রিয়ার ফলে দ্রবণের ভিতরে ক্যাথোড হইতে অ্যানোডে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলার মত কার্য হয়।

ইলেকট্রোলাইসিস সেলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করিলে সেলের মধ্যে ক্রমান্বয়ে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তাহাদেরই সমষ্টিগতভাবে **ইলেকট্রোলাইসিস (Electrolysis)** বা **বৈদ্যুত বিভাজন** বলে।

উদাহরণ : হাইড্রোক্লোরিক এসিডের দ্রবণ ইলেকট্রোলাইসিস করিলে

(i) হাইড্রোজেন আয়ন ক্যাথোডে ইলেকট্রন সংগ্রহ করিয়া হাইড্রোজেন মৌলে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেন গ্যাসরূপে মুক্ত হয় ;



$$2H^{+}+2e^{-}=H_2\uparrow$$

(হাইড্রোজেন মৌলের ডান পাশে '↑' চিহ্ন দিয়া উহার গ্যাসরূপে উৎপন্ন হওয়া বুঝান হইয়াছে।)

(ii) ক্লোরাইড আয়ন অ্যানোডে ইলেকট্রন ছাড়িয়া ক্লোরিন মৌলে পরিণত হয় ও ক্লোরিন গ্যাসরূপে উৎপন্ন হয় ;



$$2Cl^{-}=Cl_2\uparrow+2e^{-}\text{।}$$

পরীক্ষাগারে ও বিভিন্ন শিল্পে ইলেকট্রোলাইসিস প্রক্রিয়া বহুল ব্যবহৃত হয়। এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হইতেছে :

(*a*) নানা প্রকার যৌগ হইতে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন, সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতু ও অধাতু পাইতে ; (*b*) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (Sodium hydroxide, NaOH), হাইড্রোজেন পেরক্সাইড (H_2O_2) প্রভৃতি

বিভিন্ন যৌগ পাইতে ; (*c*) ইলেকট্রোপ্লেটিং করিতে, ইত্যাদি। অন্যান্য বহু কাজেও ইলেকট্রোলাইসিসের ব্যবহার আছে।

প্রশ্ন। ইলেকট্রোলাইট ও ইলেকট্রোলাইসিস কথা দুইটির অর্থ উদাহরণ দিয়া বুঝাও। ইলেকট্রোলাইসিস সেলের গঠন বর্ণনা কর। ইহার অ্যানোড ও ক্যাথোড কাহাদের বলে ?

III-4.2. জলের ইলেকট্রোলাইসিস বা বৈদ্যুত বিভাজন (Electrolysis of water)। (ক) তত্ত্ব (Principle) : বিশুদ্ধ জলে খুব কম পরিমাণ (10^7 অংশে একটি) অণু নিজ হইতে আয়নিত হইয়া হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ও হাইড্রক্সিল আয়ন (Hydroxyl ion, OH^-)-রূপে থাকে।



$$H_2O = H^+ + OH^-$$

আয়নের সংখ্যা এত কম বলিয়া বিশুদ্ধ জলের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চালনা কার্যত করা যায় না। কিন্তু উহাতে সালফিউরিক এসিড, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ইত্যাদি সামান্য একটু ইলেকট্রোলাইট দিলেই জলে উহারা আয়নিত হওয়ার ফলে জল পরিবাহী হয়।

জলে সালফিউরিক এসিড দিয়া উহাতে প্ল্যাটিনাম ধাতুর দুইটি ইলেকট্রোড ডুবাইয়া ব্যাটারীর সাহায্যে বিদ্যুৎ চালনা করিলে জলের ইলেকট্রোলাইসিস হয়। ইহাতে নিগেটিভ ইলেকট্রোড অর্থাৎ ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং পজিটিভ ইলেকট্রোড অর্থাৎ অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। সমীকরণে এই বিক্রিয়া নিম্নরূপে লেখা হয়,



$$2H_2O = 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$$

জলের ইলেকট্রোলাইসিসে নিচের ক্রিয়াগুলি ঘটে বলিয়া এই গ্যাস দুইটি উৎপন্ন হয় :

(*a*) জলের আয়নিত হওয়ায় : $4H_2O = 4H^+ + 4OH^-$;

(*b*) জলের ইলেকট্রোলাইসিসে :

(i) ক্যাথোড-বিক্রিয়া : $4H^+ + 4e^- = 2H_2$;

(ii) অ্যানোড-বিক্রিয়া : $4OH^- = O_2 + 2H_2O + 4e^-$ ।

গণিতের সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী (*a*) ও (*b*) যোগ করিলে নিচের সমীকরণ পাওয়া যায়,

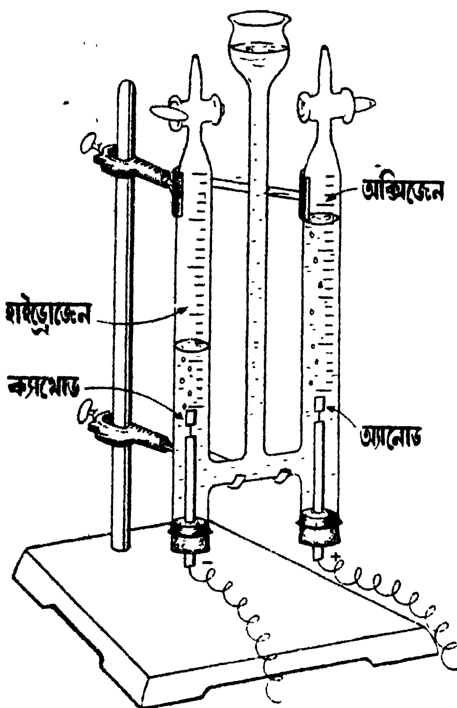


$$2H_2O = 2H_2 + O_2$$

(খ) জলের ইলেকট্রোলাইসিসের যন্ত্র ও তাহার ক্রিয়া। জলের বৈদ্যুত বিভাজনের জন্য পরীক্ষাগারে বিবিধ যন্ত্র (Apparatus) ব্যবহৃত হয়। এই রকম একটি ইলেকট্রোলাইসিস যন্ত্র III-3 চিত্রে দেখান হইয়াছে। উহাতে U-নলের দু পাশের দুটি বাহুর মাথায় স্টপকক (Stopcock, অর্থাৎ দরকার মত খোলা বা বন্ধ করা যায় এমন ছিপি) লাগান আছে। U-নলের মাঝখানে আর একটি সোজা নল জোড়া আছে ; উহার মাথায় একটি ফানেল (Funnel)। দুই বাহুর মাথার স্টপকক

খোলা রাখিয়া এই ফানেল দিয়া অল্প সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত জল ঢালিয়া পাশের নল দুটি ভরা হয়। তারপর দুই নলের মাথার ছিপি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

U-নলের দুই বাহুর নিচের দিকে দুইটি ছিপির মধ্য দিয়া কাচের সরু দুটি নল ঢুকান আছে। নল দুইটির ভিতরের প্ল্যাটিনাম ধাতুর তারের মাথায় দুইখানা প্ল্যাটিনাম পাত লাগান। এই পাত দুইটি এসিড মিশ্রিত জলের সংস্পর্শে থাকে। ইহাদের একটি ক্যাথোড ও অন্যটি অ্যানোডরূপে ব্যবহৃত হয়। এ উদ্দেশ্যে তারের সাহায্যে এই পাত দুইটির একটিকে ব্যাটারীর '+' চিহ্ন যুক্ত প্রান্তে ও অন্যটিকে '−' চিহ্ন যুক্ত প্রান্তে যোগ করা হয়। ইহাতে প্রথম পাতটি সেলের অ্যানোড ও দ্বিতীয়টি সেলের ক্যাথোড হয়। এইভাবে ব্যাটারীর সঙ্গে যুক্ত হইলে জলের বৈদ্যুত বিভাজন হয়। বিভাজন কিভাবে হয় তাহা (ক)-তে বলা হইয়াছে। ইলেকট্রোলাইসিস যন্ত্রের ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস ও অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। উদ্ভূত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন মাপিলে দেখা যায়, হাইড্রোজেন গ্যাস অক্সিজেন গ্যাসের দ্বিগুণ পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে।



III-3 চিত্র

প্রশ্ন। জলের ইলেকট্রোলাইসিস করার একটি যন্ত্র বর্ণনা কর। জলের ইলেকট্রোলাইসিস কিভাবে হয় বল।

III-4.3. ইলেকট্রোপ্লেটিং (Electroplating)। ইলেকট্রোপ্লেটিং বলিতে ইলেকট্রোলাইসিসে কোন ধাতব বস্তুকে দেখিতে সুন্দর, বা কম ক্ষয়িষ্ণু, বা জল ও বায়ুর ক্রিয়া বেশী প্রতিরোধ করিতে পারে এমন অন্য কোন ধাতুর প্রলেপ দিয়া আচ্ছাদন করা বুঝায়। ধাতব কোন যন্ত্রাংশ ক্ষয় হইয়া ছোট হইলে ইলেকট্রোলাইসিসে উহার উপরে উপযুক্ত ধাতব প্রলেপ জমাইয়া ক্ষয়িত অংশকে ঠিকমত মানে আনা যায়।

যে বস্তুতে প্রলেপ দেওয়া হইবে তাহাকে খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া উহাকে ইলেকট্রোলাইটিক সেলের ক্যাথোড করা হয়। যে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হইবে তাহাকে করা হয় ঐ সেলের অ্যানোড। ইলেকট্রোলাইট হিসাবে সেলে এমন যৌগ নেওয়া হয় যাহাতে দ্বিতীয় ধাতুটি (অর্থাৎ যাহার প্রলেপ দেওয়া হইবে তাহা) আয়নিত অবস্থায় আছে। যাহাতে প্রলেপ্য ধাতব বস্তুটির উপর প্রলেপ সকল দিকে সুষমভাবে পড়িতে পারে সেজন্য কখন কখন উহাকে (ক্যাথোডকে) আস্তে আস্তে ঘুরান হয়। কখনও বা অ্যানোড (অর্থাৎ যে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হইবে তাহা) প্রলেপ্য বস্তুটিকে সম্পূর্ণ ঘেরিয়া রাখে।

নিচের সারণিতে বাঁদিকে প্রথম স্তম্ভে যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হইবে তাহার নাম, দ্বিতীয় স্তম্ভে যে ধাতুর উপরে প্রলেপ পড়িবে তাহার নাম ও তৃতীয় স্তম্ভে যে উদ্দেশ্যে ধাতব প্রলেপ দেওয়া হয় সেই উদ্দেশ্যগুলি লেখা হইয়াছে।

যে ধাতুর প্রলেপ	যে ধাতুর উপর প্রলেপ	প্রলেপের উদ্দেশ্য
সোনা	পিতল	নকল গহনা বানান।
রূপা	তামা, পিতল	টেবিলে ব্যবহার্য বাসনপত্র বানান।
নিকেল	লোহা	সাইকেল ইত্যাদির লোহার অংশে মরিচা না ধরার জন্য।
তামা	লোহা	লোহার উপর নিকেল, সোনা বা রূপার প্রলেপ দেওয়ার ভিত (ভিত্তি) হিসাবে।
ক্রোমিয়াম	পিতল	মোটর গাড়ির অংশ, দরজার হাতল, পরদা ঝুলাইবার ডাণ্ডা ইত্যাদির উপর যাহাতে আঁচড় না লাগে বা উহা ময়লা না হয়।
জিংক বা ক্যাডমিয়াম	লোহা	মরিচা না পড়ার জন্য।
প্ল্যাটিনাম	পিতল	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির উপরটা শক্ত করা এবং এসিড ইত্যাদিতে ক্ষয় হওয়া বন্ধ করা।

প্রশ্ন। ইলেকট্রোপ্লেটিং কাহাকে বলে? উহাতে কি কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? কোন ধাতব বস্তুকে ইলেকট্রোপ্লেট করিতে কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়?

III-5. এসিড (Acids), ক্ষারক (Bases) ও লবণ (Salts)। জগতে অগণিত প্রকারের যৌগ আছে। উহাদের নামকরণের নিয়মও নির্দিষ্ট হইয়াছে। বহু যৌগের অনেকটা একই ধরনের রাসায়নিক ধর্ম থাকিতে দেখা যায়। অনুরূপ ধর্মবিশিষ্ট যৌগগুলিকে অনেক সময় বিশেষ নাম দেওয়া হয়। এসিড (Acids), ক্ষারক (Bases) ও লবণ (Salts) এই রকম তিনটি নাম। ইহাদের প্রত্যেকের নিজেদের মধ্যে রাসায়নিক ধর্মের মিল আছে। এই বিভাগে ও ইহার উপরিভাগগুলিতে আমরা ইহাদের বৈশিষ্ট্যমূলক রাসায়নিক ধর্মগুলি আলোচনা করিব।

স্থূলভাবে দেখিতে পাই এসিডগুলির স্বাদ টক, ক্ষারক (যেমন চুনের জল) নোনতা-কষায় এবং লবণ (যেমন বাজারের নুন) নোনতা। কিন্তু কেবল স্বাদ দিয়া এই তিন শ্রেণীর পদার্থের প্রভেদ করা যায় না। আরহেনিয়াস (Arrhenius, 1859-1927) সংজ্ঞা হিসাবে এক সময় (1884) প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে যে-সকল পদার্থের জলীয় দ্রবণে H^+ (হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন ; III-4 বিভাগ দেখ) আছে তাহারা এসিড, এবং যাহাদের জলীয় দ্রবণে OH^- আয়ন (হাইড্রক্সিল আয়ন, Hydroxyl ion) আছে তাহারাই ক্ষারক। দ্রবণ সংক্রান্ত জ্ঞান বাড়িতে থাকিলে ক্রমে দেখা যায় এ সংজ্ঞা যথেষ্ট নয়। 1923 খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের সংজ্ঞা হিসাবে ডেনমার্ক-দেশীয় রাসায়নিক ব্রনস্টেড (Bronsted) বলেন 'যে সকল পদার্থ অন্য পদার্থকে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+ বা প্রোটন) দান করিতে পারে, তাহারা **এসিড** এবং রাসায়নিক ক্রিয়ায় যে সকল পদার্থ ইহা (H^+) নিতে পারে তাহারা **ক্ষারক** (Base)'। এখন এই সংজ্ঞা দুটি সর্বসম্মত। এসিডের সঙ্গে ক্ষারকের রাসায়নিক ক্রিয়ায় **লবণ** (এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে জলও) গঠিত হয়।

III-5.1. হইতে III-5.4. পর্যন্ত উপবিভাগগুলিতে আমরা এসিড, ক্ষারক ও লবণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রশ্ন। এসিড, ক্ষারক (Base) ও লবণ কাহাদের বলে ?

III-5.1. এসিডের ধর্ম (Proeprties of acids)।

(১) এসিডের স্বাদ সাধারণত টক।

(২) ইহাদের প্রত্যেকটিই হাইড্রোজেন যুক্ত যৌগ। ইহারা জলে দ্রবিত হইলে আয়নিত হইয়া হাইড্রোজেন আয়ন H^+ উৎপন্ন করে। (উদাহরণস্বরূপ HCl গ্যাস ধরা যাইতে পারে। উহা আয়নিত হইয়া H^+ ও Cl^- আয়ন দেয়।

(৩) ইহা ক্ষারকের সহিত বিক্রিয়ায় লবণ (Salt) উৎপন্ন করে। (III-5.2 উপবিভাগ দেখ)। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে জলও উৎপন্ন হয়।

(৪) ধাতুর সহিত বিক্রিয়ার অনেক এসিডই হাইড্রোজেন গ্যাস ও লবণ উৎপন্ন করে। সালফিউরিক এসিডের সঙ্গে জিংক ধাতুর বিক্রিয়ার ফলে জিংক সালফেট লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

(৫) হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড ইত্যাদির সংস্পর্শে লিটমাস (Litmus) নামক পদার্থের রং নীল হইতে লালে পরিবর্তিত হয়।

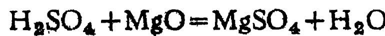
এসিডের কোনটি তরল, যেমন সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ও ফরমিক এসিড (Formic acid ; H_2CO_2), আবার কোনটি কঠিন (যেমন অক্সালিক এসিড (Oxalic acid ; $H_2C_2O_4$, $2H_2O$)। কোন কোন গ্যাসের জলীয় দ্রবণই এসিড। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) ইহার উদাহরণ। ইহার জলীয় দ্রবণই হাইড্রোক্লোরিক এসিড।

প্রশ্ন। এসিডের ধর্মগুলি বল ও পাঁচটি এসিডের নাম কর।

III-5.2. ক্ষারক ও লবণ (**Bases and Salts**)। ক্ষারকের সংজ্ঞা আগে দিয়া থাকিলেও সুবিধার জন্য আমরা এখানে বলিব 'যে সকল "যৌগ" এসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া উহার এসিড ধর্ম (Acidic properties) দূর করে তাহাদের **ক্ষারক** (Base) বলে'। নিচের সমীকরণে দেখান বিক্রিয়া কয়টিতে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH), ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO) এবং অ্যামোনিয়া ক্ষারক :



$$HCl + NaOH = NaCl + H_2O$$



$$H_2SO_4 + MgO = MgSO_4 + H_2O$$



$$HNO_3 + NH_3 = NH_4NO_3$$

এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় জল ছাড়া অন্য যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে **লবণ** (Salt) বলে। উপরের বিক্রিয়াগুলিতে উৎপন্ন সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl), ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ($MgSO_4$) ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3) ইহারা লবণের উদাহরণ। রসায়নে খাওয়ার নুনকে আমরা সাধারণ লবণ (Common salt) বলিয়া উল্লেখ করি।

বিভিন্ন ক্ষারকের রচনা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-) উহাদের অনেকের একটি বিশিষ্ট অংশ, যেমন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড—NaOH, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড—$Ca(OH)_2$ ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড—$Mg(OH)_2$ ইত্যাদি। ইহাদের **ক্ষার** (Alkali) বলে। তবে জলে ইহাদের যে কয়টির দ্রাব্যতা খুব বেশী, তাহাদেরই সাধারণত ক্ষার বলা হয়, যেমন NaOH ও পটাসিয়াম হাই-

ড্রক্সাইড (KOH)। শরীরের ত্বকের ক্ষতি করে বলিয়া NaOH ও KOH-কে কষ্টিক সোডা (Caustic soda) ও কষ্টিক পটাশ (Caustic potash)-ও বলা হয়।

ক্ষারকের ধর্ম (i) ইহারা এসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ উৎপন্ন করে। (ii) ইহারা লিটমাসের লাল রং নীলে পরিবর্তিত করে। (iii) অনেক ক্ষারকই জলে দ্রবিত হইয়া হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-) উৎপন্ন করে।

প্রশ্ন। ক্ষারক ও লবণ কাহাদের বলে প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও। ক্ষারকের ধর্মগুলি বল।

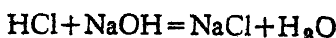
III-5.3. প্রশমন (Neutralisation)। এসিড ও ক্ষারকের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে **প্রশমন** বলে। III-5.2. উপবিভাগের সমীকরণগুলি ইহার উদাহরণ।

উপরের এসিড ও ক্ষারের আলোচনায় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে এসিডের সংস্পর্শে লিটমাসের রং লাল, কিন্তু ক্ষারের সংস্পর্শে উহা নীল। সুতরাং কোন ক্ষারের (যেমন NaOH-এর) দ্রবণে লিটমাস দিলে উহার রং নীল হইবে। উহাতে ক্রমাগত অল্প পরিমাণে এসিড (যেমন HCl) দিতে থাকিলে বিক্রিয়ার ফলে দ্রবণে ক্ষারের পরিমাণ ক্রমশ কমিতে থাকিবে। এক সময়ে দ্রবণে ক্ষার বা এসিড কোনটির আধিক্য থাকিবে না ; তখন প্রশমন সম্পূর্ণ হইয়াছে বলা হইবে। ক্ষার সম্পূর্ণ প্রশমিত হইয়া দ্রবণে এসিডের পরিমাণ বেশী হওয়ামাত্র দ্রবণের রং পরিবর্তিত হইয়া লাল হইবে। লিটমাসের বদলে ফেনলথেলিন (Phenolthalein), মিথাইল রেড (Methyl red) ইত্যাদি নিলে উহাদেরও এসিডের দ্রবণ ও ক্ষারের দ্রবণে বিভিন্ন রং দেখা যায়। যে রাসায়নিক পদার্থের রংয়ের পরিবর্তন দেখিয়া এসিড অথবা ক্ষারের প্রশমন অনুসরণ করা যায়, তাহাকে **এসিড-ক্ষারক সূচক** (**Acid base indicator**) বলে লিটমাস, ফেনলথেলিন, মিথাইল রেড ইত্যাদি এইরূপ সূচক।

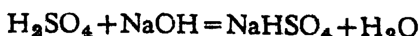
প্রশ্ন। প্রশমন কাহাকে বলে ? প্রশমন সম্পূর্ণ হইল কি না কিভাবে বোঝা যায় ?

III.-5.4. প্রশমন অনুযায়ী লবণের শ্রেণীবিভাগ।

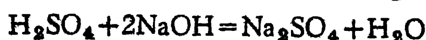
নিচের সমীকরণ তিনটি লক্ষ্য কর :



$$HCl + NaOH = NaCl + H_2O$$



$$H_2SO_4 + NaOH = NaHSO_4 + H_2O$$



$$H_2SO_4 + 2NaOH = Na_2SO_4 + H_2O$$

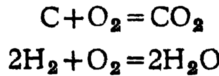
HCl ও H_2SO_4 এসিডের বিক্রিয়ায় উহাদের সংকেত অনুযায়ী যথাক্রমে একটি ও দুইটি H^+ আয়ন কোন ধাতুর আয়ন, যেমন Na^+ আয়ন, দিয়া প্রতিস্থাপিত হইতে পারে।

কোন এসিডের H^+ আয়ন সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত হইয়া যে লবণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে **শমিত লবণ** (Normal salt) বলে, যেমন উপরের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন NaCl ও Na_2SO_4। কিন্তু H_2SO_4, H_3PO_4 (ফসফরিক এসিড, Phosphoric acid) ইত্যাদির H^+ আয়ন আংশিক প্রতিস্থাপিত হইয়াও লবণ উৎপন্ন হয়। ইহাদের **এসিড লবণ** (Acid salt) বলে। যেমন $H_2SO_4+NaOH=NaHSO_4+H_2O$ সমীকরণ অনুযায়ী বিক্রিয়ায় উৎপন্ন $NaHSO_4$ (সোডিয়াম এসিড সালফেট, (Sodium acid sulphate)। ইহাকে সোডিয়াম বাইসালফেটও (Sodium bisulphate) বলে। সোডিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (Sodium dihydrogen phosphate), NaH_2PO_4, এইরূপ আর একটি এসিড-লবণ।

ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইডের (Magnesium hydroxide, $Mg(OH)_2$-এর), মত কোন কোন ক্ষারকের সংকেত অনুযায়ী দুইটি হাইড্রক্সিল (OH^-) আয়নই অন্য আয়ন, (যেমন Cl^- আয়ন) দিয়া প্রতিস্থাপিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু সংকেত অনুযায়ী প্রাপ্তিসাধ্য হাইড্রক্সিল আয়ন সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত না হইয়া যে লবণ উৎপন্ন হয়, যেমন Mg (OH)Cl, তাহাকে **ক্ষারকীয় লবণ** (Basic salt) বলে।

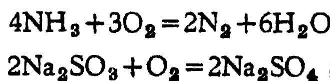
প্রশ্ন। শমিত লবণ, এসিড লবণ ও ক্ষারকীয় লবণ কাহাদের বলে প্রত্যেকের একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

III-6. জারণ ও বিজারণ (Oxidation and Reduction)। কার্বন ও হাইড্রোজেন আগুনে জ্বালাইলে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া উহারা যথাক্রমে কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide, CO_2), ও জল তৈয়ারি করে,



$$C+O_2=CO_2$$
$$2H_2+O_2=2H_2O$$

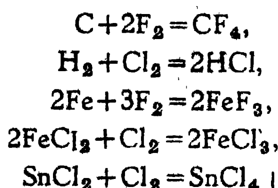
লোহায় মরিচা পড়াও লোহার সহিত অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফল। অ্যামোনিয়া, সোডিয়াম সালফাইট (Sodium sulphite, Na_2SO_3) ইত্যাদিও অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করে :



$$4NH_3+3O_2=2N_2+6H_2O$$
$$2Na_2SO_3+O_2=2Na_2SO_4\text{।}$$

উপরের বিক্রিয়াগুলি একই শ্রেণীভুক্ত, কারণ প্রত্যেকটিতে অক্সিজেনের সহিত অন্য কোন মৌল বা যৌগের বিক্রিয়া হইয়াছে। অক্সিজেনের মত ফ্লুওরিন, ক্লোরিন

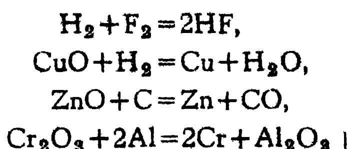
ইত্যাদি কার্বন, হাইড্রোজেন, লোহা এবং অন্যান্য যৌগ যেমন ফেরাস ক্লোরাইড (Ferrous chloride, $FeCl_2$) ইত্যাদির সহিত বিক্রিয়া করে :



$$C + 2F_2 = CF_4,$$
$$H_2 + Cl_2 = 2HCl,$$
$$2Fe + 3F_2 = 2FeF_3,$$
$$2FeCl_2 + Cl_2 = 2FeCl_3,$$
$$SnCl_2 + Cl_2 = SnCl_4 \text{ ।}$$

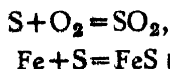
জারণ (Oxidation) বলিতে কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে অক্সিজেন, ফ্লুওরিন, ক্লোরিন প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি মৌলের রাসায়নিক বিক্রিয়া বুঝায়। এই বিশেষ মৌলগুলিকে **জারক** (Oxidising agent বা Oxidant) বলে। জারণে এই বিশেষ মৌল কয়টি অপর কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে যুক্ত হয়, এবং ক্ষেত্রবিশেষে কোন যৌগ হইতে হাইড্রোজেন সরাইয়া নেয়। এই বিক্রিয়াগুলির উদাহরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে।

জারণের বিপরীত ক্রিয়া বিজারণ। যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাতু, হাইড্রোজেন, কার্বন ইত্যাদি অন্য কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে যুক্ত হয়, এবং ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন যৌগ হইতে অক্সিজেন, ফ্লুওরিন ইত্যাদি জারক সরাইয়া নেয়, তাহাকে **বিজারণ** (Reduction) বলে। এরূপ বিক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাতু, হাইড্রোজেন ও কার্বন ইত্যাদিকে '**বিজারক**' (Reducing agent বা Reductant) বলে। নিচের সমীকরণগুলিতে বিজারণের উদাহরণ দেখান হইয়াছে।



$$H_2 + F_2 = 2HF,$$
$$CuO + H_2 = Cu + H_2O,$$
$$ZnO + C = Zn + CO,$$
$$Cr_2O_3 + 2Al = 2Cr + Al_2O_3 \text{ ।}$$

জারক ও বিজারক কথা দুইটি আপেক্ষিক, কেননা একই মৌল জারক কি বিজারক হিসাবে কাজ করিবে তাহা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অন্য মৌল বা যৌগের ধর্মের উপর নির্ভর করে। যেমন, সালফার ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় সালফার বিজারক ; কিন্তু লোহার সহিত বিক্রিয়ায় সালফার জারক :



$$S + O_2 = SO_2,$$
$$Fe + S = FeS \text{ ।}$$

অতএব জারণ-বিজারণের সংজ্ঞা এমন হইতে হইবে যাহাতে বোঝা যায় কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন্‌টি জারক, কোন্‌টি বিজারক এবং কেন। যে সংজ্ঞা

আমরা দিয়াছি তাহা প্রাথমিক স্তরের সংজ্ঞা। স্পষ্টতর সংজ্ঞা এ স্তরে দেওয়া যাইবে না। (ইহার জন্য পরমাণুর গঠন ছাড়া রাসায়নিক বন্ধন সম্বন্ধেও জ্ঞান দরকার হইবে। জারণ-অবস্থা (Oxidation-state) নামক কল্পনের সাহায্যেও ইহা করা যায়। কিন্তু এ সকলই আমাদের বর্তমান গণ্ডীর বাহিরে।)

ব্যাপকতর সংজ্ঞা এখন দিতে না পারিলেও লক্ষ্য কর দুইটি মৌল বা যৌগের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটি জারকের কাজ করিলে অন্যটি বিজারকের কাজ করে, অর্থাৎ **জারণ ও বিজারণ একই সঙ্গে ঘটে।** আগেকার উদাহরণগুলিতে অক্সিজেন, ফ্লুওরিন, ক্লোরিন, কপার অক্সাইড (CuO) ইত্যাদি জারক, কিন্তু হাইড্রোজেন, কার্বন, লোহা, স্ট্যানাস ক্লোরাইড ($SnCl_2$), ফেরাস ক্লোরাইড ($FeCl_2$) ইত্যাদি বিজারক।

প্রশ্ন। জারণ ও বিজারণ কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়ে বুঝাও। তিনটি করিয়া জারক ও বিজারকের নাম বল।

সমীকরণ লিখিয়া জারণ ও বিজারণ যে এক সঙ্গে ঘটে তাহা দেখাও।

III-7. বায়ু সম্বন্ধীয় (About air)। বায়ু আয়তনে প্রায় 78% নাইট্রোজেন ও 21% অক্সিজেনের মিশ্রণ। ইহা ছাড়া বায়ুতে প্রায় 1% আর্গন (Argon) নামে একটি গ্যাস এবং অতি সামান্য পরিমাণে আরও কয়েকটি গ্যাস আছে। শিল্প ও অন্যান্য কাজে বায়ুর অক্সিজেন নাইট্রোজেনের বহুল ব্যবহার হয়। এই সকল ব্যবহারের জন্য বায়ুকে তরল করিয়া গ্যাস দুটি আলাদা করা হয়। নিচের III-7.1. উপবিভাগে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। আর্গন ও বায়ুর অন্য কয়েকটি গ্যাসের কথা III-7.2. উপবিভাগে বলা হইয়াছে।

এগুলি ছাড়া বায়ুতে প্রায় 0·03% কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এবং সামান্য জলীয় বাষ্পও আছে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে বিভিন্ন হয়; ইহার কথা আমরা আলোচনা করিব না। বাকী গ্যাসগুলির অনুপাত কার্যত স্থির থাকে। কিন্তু উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ গঠনে নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড দরকার। বায়ু হইতে এ দুটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নেওয়া হয়। অনবরত নিতে থাকিলে গ্যাস দুটির পরিমাণ বায়ুতে ক্রমশ কমার কথা। কিন্তু তাহা হইলে উহাদের পরিমাণ স্থির থাকে কি করিয়া? নিশ্চয়ই নেওয়া গ্যাস আবার বায়ুতে ফিরিয়া আসার প্রাকৃতিক কোন ব্যবস্থা আছে। প্রকৃতির এই ব্যবস্থা দুটি III-7.3. ও III-7.4. উপবিভাগে বলা হইয়াছে।

III-7.1. তরল বায়ু (Liquid air)। সকল গ্যাসকেই তাহার পক্ষে বিশিষ্ট কোন এক উষ্ণতার নিচে আনিয়া যথেষ্ট চাপ দিয়া তরল করা যায়। বায়ুকে

তরল করিতে উহাকে অন্তত $-141^{\circ}C$-র নিচে ঠাণ্ডা করা দরকার, এবং এই উষ্ণতায় প্রায় 38 বায়ুমণ্ডল চাপে উহা তরল হইবে।

শিল্পে বহু পরিমাণ তরল বায়ুর দরকার হয় বলিয়া উহাকে তরল করিবার একাধিক উপায় ও যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেশী চাপে রাখা বায়ুর চাপ হঠাৎ কমাইলে উহা শীতল হয়। এই ক্রিয়ার পৌনঃপুনিক প্রয়োগে বায়ুকে এত শীতল করা যায় যে তখন এক বায়ুমণ্ডল চাপেই উহা তরল হইয়া যায়। (ইহা ছাড়াও অন্যান্য উপায় আছে; কিন্তু সেগুলি আলোচনার স্থান ইহা নয়।)

এক বায়ুমণ্ডল চাপে নাইট্রোজেনের স্ফুটনাঙ্ক $-196^{\circ}C$ ও অক্সিজেনের স্ফুটনাঙ্ক $-183^{\circ}C$। তরল বায়ু হইতে স্ফুটনাঙ্কের প্রভেদের জন্য গ্যাস দুটিকে আংশিক পাতনে (Fractional distillation-এ) আলাদা করিয়া নেওয়া যায়। গঠনে থার্মফ্লাস্কের (Thermos flask-এর) মত, কিন্তু আকারে বড় ও ধাতুতে তৈয়ারী পাত্রে তরল বায়ু প্রথমে বায়ু তরলন যন্ত্র হইতে আসিয়া জমে। নাইট্রোজেনের স্ফুটনাঙ্ক অক্সিজেনের চেয়ে কম বলিয়া ঐ তরল মিশ্রণ হইতে নাইট্রোজেন উবিয়া যাইতে থাকে ও পাত্রের তরলে অক্সিজেনের অংশ বাড়ে। পাত্রের অর্ধেক তরল উবিয়া গেলে বাকী তরলে অক্সিজেনের অংশ 21% হইতে বাড়িয়া 35% হয়। উভয় গ্যাসকে আলাদাভাবে পাইতে বায়ু তরল করিবার যন্ত্রের সঙ্গে 'রেকৃটিফায়ার' (Rectifier) নামে একটি অংশ যোগ করা হয়। উহার সাহায্যে তরল বায়ু হইতে তরল অক্সিজেন ও গ্যাসীয় নাইট্রোজেন আলাদাভাবে পাওয়া যায়। এইভাবে 99·5% বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাওয়া যাইতে পারে। আর্গনও এই অংশে তরলিত অবস্থায় থাকে। গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে আবার তরল করিয়া নেওয়া যায়। রাসায়নিক সার উৎপাদনে নাইট্রোজেন দরকার।

প্রশ্ন। কি অবস্থায় বায়ু তরল হইতে পারে? তরল বায়ুতে প্রধানত কি কি মৌল থাকে? তরল বায়ুর কোন স্থির স্ফুটনাঙ্ক আছে কি? কেন?

III-7.2. 'বিরল' গ্যাসগুলির ব্যবহার (Use of the rare gases) এবং নিয়ন আলো (Neon lighting)। বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ছাড়া বিশেষ পাঁচটি গ্যাস সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। এই গ্যাস পাঁচটি রাসায়নিক ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় (Inert), অর্থাৎ অন্য মৌলের সঙ্গে ইহারা রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। এজন্য যৌথভাবে ইহাদের 'নিষ্ক্রিয় গ্যাস' (Inert gases) নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহারা নিষ্ক্রিয় বলিয়া ইহাদের দুই বা ততোধিক পরমাণু মিলিয়া অণু গঠন করে না। পরমাণুগুলিই স্বাধীনভাবে থাকে। পরিমাণে খুব কম বলিয়া ইহারা 'বিরল গ্যাস' (Rare gases) নামেও পরিচিত।

গ্যাসগুলির নাম, চিহ্ন, বায়ুতে শতকরা আয়তনিক অনুপাত ও এক বায়ুমণ্ডল চাপে নিকটতম সেলসিয়াস ডিগ্রীতে উহাদের স্ফুটনাঙ্ক নিচে দেওয়া হইল। [সারণির সংখ্যাগুলি মুখস্থ করার কোন দরকার নাই। গ্যাসগুলি সম্বন্ধে যাহা বলা হইবে তাহা বুঝিবার সুবিধার জন্য সংখ্যাগুলি দেওয়া হইয়াছে।]

নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি সম্বন্ধীয় সারণি

নাম	চিহ্ন	শতকরা আয়তন	স্ফুটনাঙ্ক (°C)
হিলিয়াম (Helium)	He	0·0005	−269°
নিয়ন (Neon)	Ne	0·0015	−246°
আর্গন (Argon)	A	0·94	−186°
ক্রিপ্‌টন (Krypton)	Kr	0·00011	−153°
জেনন (Xenon)	Xe	0·000009	−107°

গ্যাসগুলির 'বিরলত্ব' সারণি হইতে বোঝা যায়। ইহাদের মধ্যে আর্গনই সবচেয়ে বেশী—প্রায় শতকরা এক ভাগ, অর্থাৎ প্রতি একশত বায়ুকণায় প্রায় একটি। কিন্তু অন্যগুলির পরিমাণ এত কম যে শতকরা হারে সংখ্যা না বলিয়া বলিতে হয় প্রতি দশ লক্ষ (10^6 বা মিলিয়ন) বায়ুকণায় হিলিয়াম আছে 500টি, নিয়ন আছে 1500টি ক্রিপটন 110টি ও জেনন আছে মাত্র 9টি।

এত বিরল ও নিষ্ক্রিয় হইলেও মানুষ ইহাদের কাজে লাগাইয়াছে। বিভিন্ন গ্যাস কাজে লাগাইতে হইলে বায়ু হইতে ইহাদের আলাদা করিয়া নিতে হয়। স্ফুটনাঙ্কের বিভিন্নতার সাহায্যে (এবং অন্য প্রক্রিয়ার সাহায্য লইয়াও) ইহাদের আলাদা করা হয়। তরল বায়ু হইতে নাইট্রোজেনের সঙ্গে হিলিয়াম এবং নিয়নও উবিয়া আসে। নাইট্রোজেনকে আবার তরলিত করিলে হিলিয়াম ও নিয়ন গ্যাস রূপে থাকিয়া যায়। তরল হাইড্রোজেনে (স্ফুটনাঙ্ক −253°C) এই গ্যাস ঠাণ্ডা করিলে নিয়ন তরল হয়, এবং হিলিয়াম গ্যাস রূপেই থাকে।

তরল বায়ুর তরল অক্সিজেনের সঙ্গে আর্গনও থাকে। একটু জটিল প্রক্রিয়ায় আর্গনকে পৃথক করিতে হয়, কারণ উভয়ের স্ফুটনাঙ্ক খুব কাছাকাছি।

ভূত্বক হইতে যে সব জায়গায় প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) পাওয়া যায় তাহাতে হিলিয়ামও থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস (Texas) অঞ্চলে তেলের সঙ্গে যে গ্যাস আসে তাহাতে শতকরা প্রায় 2 ভাগ হিলিয়াম আছে। মানুষের প্রয়োজনের হিলিয়াম গ্যাস বেশীর ভাগ ইহা হইতেই আসে।

নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ব্যবহার। সবচেয়ে শীতল অবস্থা সৃষ্টি করিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়। ইহা বায়ুর চেয়ে হালকা এবং দাহ্য নয় বলিয়া যন্ত্রপাতি সমেত ঊর্ধ্বে উঠিবার বেলুনে ভরা হয়। গভীর জলের নিচে যে সব ডুবুরির কাজ করিতে হয়, শ্বাস নিতে তাহাদের বায়ু না দিয়া অক্সিজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ দেওয়া হয়। নাইট্রোজেনের চেয়ে হিলিয়াম রক্তে দ্রাবিত হয় কম। ডুবুরি যখন উপরে উঠিয়া আসে তখন তাহার রক্তে দ্রাবিত নাইট্রোজেন তাড়াতাড়ি মুক্ত হইলে তাহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। হিলিয়ামে এরূপ সম্ভাবনা অনেক কম।

ধাতুবিদ্যায় (Metallurgy-তে) টাইট্যানিয়াম (Titanium) প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশনে নিষ্ক্রিয় পরিবেশের দরকার হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রধানত আর্গন, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়।

তারের বৈদ্যুত বাল্‌ব্‌গুলির বায়ুশূন্য করিয়া উহাদের এক বায়ুমণ্ডলের তিন-চতুর্থাংশ চাপে আর্গন গ্যাস দিয়া ভরা হয়। ভিতরে বায়ু থাকিলে তার পুড়িয়া যাইত। আর্গন নিষ্ক্রিয় বলিয়া উষ্ণ তারের সঙ্গে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া করে না। দ্রুত ফটোগ্রাফ তোলার জন্য যে ফ্ল্যাশ বাল্‌ব্‌ (Flash bulb) ব্যবহৃত হয় তাহাতে ক্রিপটন বা জেনন ভরা থাকে। রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তা ও কম তাপপরিবাহিতা গুণের জন্য এ সকল এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে এই গ্যাসগুলির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

নিয়ন গ্যাস প্রধানত রাত্রে আলোকিত বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহৃত হয়। কাচের এক বা একাধিক নলকে অক্ষরের আকারে বাঁকাইয়া বা উহাকে বিজ্ঞাপনীয় বস্তুর আকার দিয়া নলে নিম্নচাপে নিয়ম গ্যাস ভরা হয়। এই গ্যাসের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ স্রোত পাঠাইলে নিয়ন উজ্জ্বল কমলা-লাল রঙের আলো দেয়। বিদ্যুৎ স্রোত জোরাল হইলে আলো বেশী উজ্জ্বল হয়। ইহাকে **নিয়ন আলোকন (Neon lighting)** বলে। অনেকে অল্প নিয়ন ভরা বৈদ্যুত বাল্‌ব্‌ রাত্রে ঘরে জ্বালাইয়া রাখেন। এগুলি হইতে মৃদু কমলা রঙের আলো বাহির হয়। ইহাতে বিদ্যুৎ খরচ খুব কম হয়, ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয় না এবং রাত্রে অন্ধকারে উঠিতে হয় না। বৈদ্যুতিক লাইনে বিদ্যুৎ আছে কি না তাহা দেখিবার জন্য পেনসিলের মত নলে একটু নিয়ন ভরা থাকে। লাইনে বিদ্যুৎ থাকিলে উহাতে ঐ পেনসিল ছোঁয়াইলে, এমন কি কাছে নিয়া গেলেও, উহা কমলা রঙের আলো দেয়। 'ভোল্টেজ' (Voltage), অর্থাৎ লাইনে বৈদ্যুত চাপ, বেশী থাকিলে আলো বেশী উজ্জ্বল হয়।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য গ্যাসগুলিও ব্যবহার হয়। হিলিয়াম হলদে আলো দেয়; আর্গনের আলো লাল, ক্রিপটনের সবুজ-হলদে ও জেননের নীল। ক্রিপটন ও জেনন খুব কম পাওয়া যায় বলিয়া উহাদের ব্যবহারও খুব সীমিত।

প্রশ্ন। 'বিরল' গ্যাসগুলির নাম ও উহাদের ব্যবহার বল। নিয়ন লাইটিং বলিতে কি বুঝায়?

III-7.3. নাইট্রোজেনের আবর্তন বা নাইট্রোজেন-চক্র (Nitrogen cycle)। বাতাসে প্রচুর পরিমাণে (78%) নাইট্রোজেন মৌল রূপে আছে। তাহা ছাড়া সোডিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি বিভিন্ন যৌগ রূপে ইহা ভূত্বকে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণীজগতে বিভিন্ন যৌথ রূপে (যেমন বিভিন্ন এমিনো এসিড (Amino acid), প্রোটিন (Protin) ইত্যাদিতে) ইহা বর্তমান। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাঁচিয়া থাকার ও বৃদ্ধির জন্য অক্সিজেনের মত ইহারও প্রয়োজন।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের নাইট্রোজেনঘটিত বিভিন্ন যৌগ তৈয়ারিতে যে নাইট্রোজেন প্রয়োজন তাহার উৎস বায়ুর নাইট্রোজেন। অক্সিজেনের মত বায়ুর নাইট্রোজেন প্রশ্বাস নেওয়ার সঙ্গে জীবদেহে প্রবেশ করিলেও তাহা বিভিন্ন যৌগ গঠন করিতে কাজে লাগে না। উদ্ভিদ ও প্রাণী বিভিন্ন যৌগ গঠন করার জন্য বায়ুর নাইট্রোজেন অন্যভাবে নেয়। প্রকৃতি তাহার সুবন্দোবস্ত নিজেই করিয়াছে।

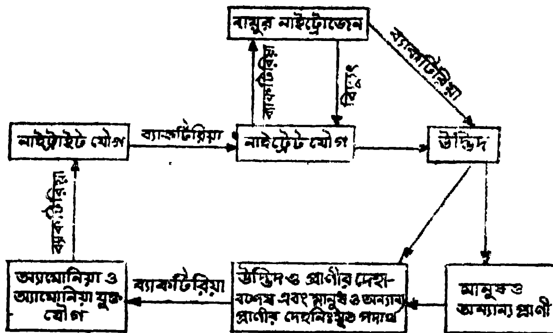
বর্ষার দিনে বিদ্যুৎ চমকানো ও বাজ পড়ার সময় বিদ্যুতের প্রভাবে বায়ুর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের বিক্রিয়ায় বিভিন্ন নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈয়ারি হয়। উহারা বৃষ্টির জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়া নাইট্রাস এসিড (Nitrous acid, HNO_2) ও নাইট্রিক এসিড (HNO_3) রূপে মাটিতে নামিয়া আসে। মাটির ক্ষারজাতীয় যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া উহারা বিভিন্ন নাইট্রাইট ও নাইট্রেট উৎপন্ন করে।

প্রকৃতিতে আর একটি উপায়েও বায়ুর নাইট্রোজেন মৌল হইতে যৌগে পরিণত হয়। তোমরা হয়তো অনেকেই শিম জাতীয় গাছের শিকড়ে আবের মত স্ফীতি (Nodules) লক্ষ্য করিয়াছ। উহাতে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া (Bacteria) বাসা বাঁধিয়া থাকে। উহারা সরাসরি বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ তৈয়ারি করিয়া উদ্ভিদকে যোগায়। শিম জাতীয় গাছ ছাড়াও লবঙ্গ জাতীয় গাছের, যেমন ক্লোভার (Clover) ও লুসার্ন (Lucerne)-এর, শিকড়েও এইরূপ স্ফীতি ও তাহাতে এই ধরনের ব্যাকটিরিয়া দেখা যায়। কয়েক জাতীয় মস (Moss), অ্যালগি (Algae) এবং ফাংগাস (Fungus)-ও বায়ুর নাইট্রোজেনকে যৌগে পরিণত করে।

মাটির নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ হইতে উদ্ভিদ নাইট্রোজেনযুক্ত অন্যান্য যৌগ তৈয়ারি করে। উদ্ভিদ খাইয়া পশু, মাছ প্রভৃতি জন্তু উহার শরীরে প্রোটিন ও অন্যান্য যৌগারে তৈয়ারি করে। মানুষ বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীজ বিভিন্ন বস্তু, যেমন মাছ, দুধ, ম বিশুদ্ধ ইত্যাদি হইতে শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও অন্যান্য নাইট্রোজেনযুক্ত ম্রে দেশে গ্রহণ করে।

এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে বায়ুতে নাইট্রোজেনের ভাগ কমিলেও প্রকৃতি নাইট্রোজেনকে অন্যভাবে বায়ুতে ফিরাইয়া নেয়। প্রাণীদেহের নিঃসারিত পদার্থ ও জীবের মৃত্যুর পর দেহাবশেষ হইতে ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে পচনে অ্যামোনিয়া ও অ্যামোনিয়াযুক্ত যৌগ উৎপন্ন হয়। ইহার কিছু অংশ উদ্ভিদ ব্যবহার করে ; বাকীটা বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন নাইট্রাইট, নাইট্রেট ও শেষে নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়।

প্রকৃতিতে এইভাবে বায়ুর নাইট্রোজেনের অপসারণ ও প্রত্যাবর্তন চলিতেছে, ইহাকে নাইট্রোজেনের আবর্তন বা নাইট্রোজেন-চক্র (Nitrogen cycle) বলে। নিচের III-4 লিপিচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে।



III-4 চিত্র – নাইট্রোজেন-চক্র

প্রশ্ন। নাইট্রোজেনের আবর্তন বা নাইট্রোজেন-চক্র (Nitrogen cycle) বলিতে কি বোঝ ? উহা কি ভাবে ঘটে তাহা ভাষায় বা লিপিচিত্রের সাহায্যে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

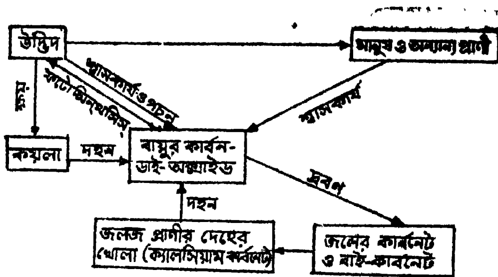
III-7.4. কার্বন ডাইঅক্সাইড আবর্তন বা কার্বন ডাইঅক্সাইড-চক্র (Carbon dioxide cycle)। বায়ুতে নাইট্রোজেনের মত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও সবসময় এক (0.03%) এবং প্রকৃতিতে ইহাও আবর্তিত হয়। III-5 লিপিচিত্রে সংক্ষেপে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আবর্তন দেখান হইয়াছে। ইহাকে **কার্বন-চক্রও** বলা হয়।

বিভিন্ন জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ শ্বাসকার্যের জন্য বায়ু হইতে অক্সিজেন নেয় ও বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়িয়া দেয়। জীবের শ্বাসকার্য ছাড়াও প্রধানত জীবদেহের
নে, কয়লা, কাঠ ইত্যাদি পোড়ানয়, চুন তৈরির জন্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট
lcium carbonate) পোড়ানয় বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে।
দেয় ;
ঝুক, শামুক ইত্যাদি বিভিন্ন জলজ প্রাণীর খোলা ও পাথরচুন প্রধানত
জেনন
লসিয়াম কার্বনেট দিয়া গঠিত

উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষ (ফটোসিন্‌থেসিস, Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় সূর্যের আলো ও ক্লোরোফিলের (Chlorophyll, গাছের পাতার সবুজ-কণা) সাহায্যে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়া স্টার্চ (Starch), শর্করা (Sugar) ইত্যাদি বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) তৈয়ার করে এবং অক্সিজেন বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়।

জল ও জলীয় দ্রবণে কার্বন ডাইঅক্সাইড কিছু পরিমাণে দ্রবণীয় হওয়ায় বৃষ্টির জলের সঙ্গে কার্বনিক এসিডরূপে বায়ু হইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড মাটিতে চলিয়া আসে। ভূত্বকের বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে কার্বনিক এসিড বিক্রিয়া করিয়া বিভিন্ন বাইকার্বনেট (Bicarbonate) ও উহাদের জলীয় দ্রবণ তৈয়ারি করে। এই দ্রবণ হইতে বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী উহাদের প্রয়োজনীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে।

এইভাবে বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রকৃতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আবর্তন চলে ও বায়ুতে উহার সমতা রক্ষা হয়।



III-5 চিত্র—কার্বন-চক্র

প্রশ্ন। কার্বন ডাইঅক্সাইড-চক্র কাহাকে বলে? ভাষায় বা লিপিচিত্রের সাহায্যে উহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

III-8. মৌল ও যৌগ তৈয়ারি (Preparation of elements and compounds)।

প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় কোন মৌল বা যৌগ সাধারণত পাওয়া যায় না। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সোনা, রূপা ইত্যাদি অল্প কয়েকটি মৌল যৌগ ও মৌল উভয়রূপেই থাকে। এই কয়েকটি মৌল ও নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি বাদে আর সব মৌলই প্রকৃতিতে যৌগরূপে আছে।

বিভিন্ন সময়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া রসায়ন বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষাগারে (ল্যাবরেটরীতে, Laboratory-তে) বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে বিভিন্ন বিশুদ্ধ মৌল ও যৌগ প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। বর্তমানেও এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে

বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতেছেন। পরীক্ষাগারে কোন মৌল বা যৌগ অল্প পরিমাণে তৈয়ারি করার জন্য যে সব সহজ পদ্ধতি সাধারণত অনুসৃত হয় তাহাই 'পরীক্ষাগার পদ্ধতি' বা 'ল্যাবরেটরী পদ্ধতি' (Laboratory method) নামে পরিচিত।

অনেক মৌল ও যৌগ বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করার পদ্ধতিকে 'শিল্প পদ্ধতি' (Industrial method বা Manufacture) বলে। কোন মৌল বা যৌগের শিল্প পদ্ধতি আবিষ্কার ও তাহার ব্যবহার কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারিং (Chemical engineering) নামক বিষয়ের অন্তর্গত। ল্যাবরেটরী পদ্ধতির মত শিল্প পদ্ধতিও ল্যাবরেটরীতেই বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে অনেক ল্যাবরেটরী পদ্ধতিই অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া শিল্প পদ্ধতিরূপে ব্যবহৃত হয়। বস্তুত ল্যাবরেটরী পদ্ধতি ও শিল্প পদ্ধতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়াগত মূল তত্ত্বে কোন পার্থক্য নাই।

এই অধ্যায়ে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন; অ্যামোনিয়া ইত্যাদি কয়েকটি মৌল ও যৌগ তৈয়ারি সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলা হইতেছে। ইহাদের তৈয়ারির প্রধান রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি বিভিন্ন সমীকরণে লেখা হইয়াছে এবং মৌল ও যৌগের প্রত্যেকটিরই অন্তত একটি সহজ ল্যাবরেটরী পদ্ধতি সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষাগারে এই সব মৌল ও যৌগ তৈয়ারি করিয়া কেহ বিভিন্ন পরীক্ষা করিতে চাহিলে তাহাকে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানিতে হইবে।

III-3.1. অক্সিজেন (Oxygen)। সমস্ত মৌলের মধ্যে অক্সিজেন ভূত্বকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। বায়ুতে ইহা মৌলরূপে এবং জল ও অন্যান্য বহু পদার্থে ইহা যৌগ রূপে আছে।

মানুষের শ্বাসকষ্ট কমাইতে অক্সিজেন গ্যাস ব্যবহৃত হয়। গ্যাস-ঝালাইয়ের (gas-welding-এর) কাজে, মহাকাশে রকেট উড়াইতে ও বিভিন্ন শিল্পে অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

অক্সিজেন তৈয়ারি (Preparation of oxygen)। তরল বায়ুর আংশিক পাতনের (Fractional distillation-এর) সাহায্যে (III-7. 1 উপবিভাগ দেখ) অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তা ছাড়া জল ও সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ইলেকট্রোলাইসিসেও (III-4.2 উপবিভাগ দেখ) অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শিল্পের প্রয়োজন ইহাতে মেটে। এখানে আমরা দুইটি ল্যাবরেটরী পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

(ক) পটাসিয়াম ক্লোরেট (Potassium chlorate) হইতে।

(i) তত্ত্ব (Principle) : পটাসিয়াম ক্লোরেট গরম করিলে ভাঙিয়া গিয়া পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে ;



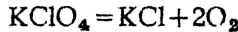
$$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2 \uparrow$$

সাধারণত পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (Manganese dioxide, MnO_2) মিশাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কম উষ্ণতায় (240°C-তে) পটাসিয়াম ক্লোরেট উপরের সমীকরণ অনুযায়ী ভাঙে ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড প্রভাবকরূপে কাজ করে।

পটাসিয়াম ক্লোরেট গরম করিলে প্রথমে পটাসিয়াম পারক্লোরেট (Potassium perchlorate, $KClO_4$) ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড (Potassium chloride, KCl) উৎপন্ন হয়। বেশী উষ্ণতায় (630°C-তে) পটাসিয়াম পারক্লোরেট ভাঙিয়া অক্সিজেন সৃষ্ট হয়। নিচে এই বিক্রিয়া দুইটি সমীকরণে দেখান হইয়াছে।

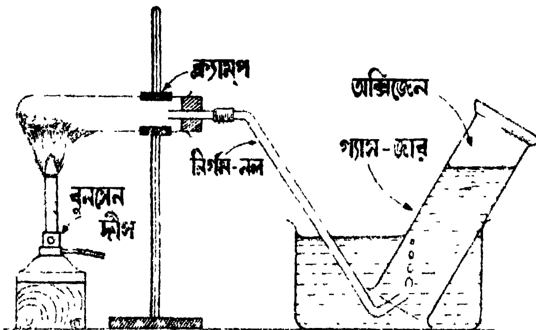


$$4KClO_3 = 3KClO_4 + KCl$$



$$KClO_4 = KCl + 2O_2$$

(ii) প্রক্রিয়া (Method) : পরীক্ষাগারে অক্সিজেন তৈয়ারির জন্য উচ্চ তাপসহ কাচের পরীক্ষা নলে (Test tube-এ) চার ভাগ পটাসিয়াম ক্লোরেট ও এক ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড নেওয়া হয় (III-6 চিত্র দেখ)। নলটিতে একটি



III-6 চিত্র

নির্গম নল (Outlet tube)-যুক্ত ছিপি লাগান হয়। নির্গম নলের অন্য প্রান্ত একটি জলের পাত্রে ডুবান হয়। এই নলের প্রান্তে জলপূর্ণ গ্যাস জার (Gas jar) উপুড় করিয়া রাখা হয়। তারপর সাবধানে গ্যাস বার্নারের (Gas burner-এর) সাহায্যে পরীক্ষা নলের মিশ্রণ গরম করা হয়। তখন অক্সিজেন তৈয়ারি হইয়া নির্গম নল দিয়া গ্যাস জারে আসে এবং জল সরাইয়া জারে জমা হয়

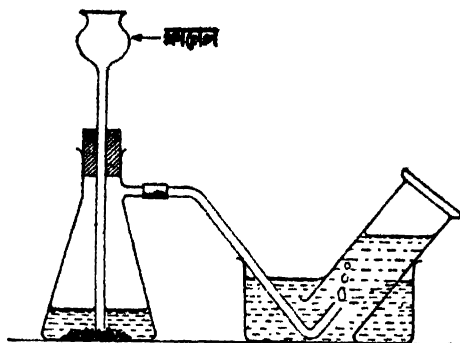
(খ) সোডিয়াম পেরক্সাইড (Sodium peroxide, Na_2O_2) হইতে।

(i) তত্ত্ব : সোডিয়াম পেরক্সাইড জলের সঙ্গে নিচের সমীকরণ অনুযায়ী বিক্রিয়া করে ;



$$2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2$$

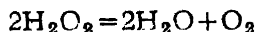
(ii) প্রক্রিয়া : একটি বুখ্‌নার ফ্লাস্কে (Buchner flask-এ) সোডিয়াম পেরক্সাইড নিয়া তাহাতে ফানেলযুক্ত ছিপি ও নির্গম নল লাগান হয় (III-7 চিত্র



III-7 চিত্র

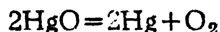
দেখ)। এই নলের অন্য প্রান্ত একটি পাত্রের জলে ডুবান হয়। ফানেলের নলের প্রান্ত ফ্লাস্কের প্রায় তলা পর্যন্ত যায়। ফানেলের মধ্য দিয়া জল ঢালিলে সোডিয়াম পেরক্সাইডের সহিত জলের বিক্রিয়া ঘটে ও অক্সিজেন সৃষ্ট হয়। ইহা নির্গম নল দিয়া জলে বুদ্‌বুদের আকারে বাহির হইতে থাকে। নির্গম নলের প্রান্তে জলপূর্ণ গ্যাস জার উপুড় করা থাকিলে জারের জল সরাইয়া জারে অক্সিজেন জমিতে থাকে।

(গ) অন্যান্য পদ্ধতি : (i) সোডিয়াম পেরক্সাইডের বদলে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড নিয়া তাহাতে প্রভাবকরূপে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড দিলেও অক্সিজেন পাওয়া যায়।



$$2H_2O_2 = 2H_2O + O_2$$

(ii) মারকিউরিক অক্সাইড (HgO) গরম করিয়া অক্সিজেন পাওয়া যায় ;

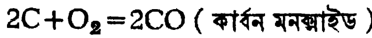


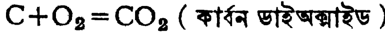
$$2HgO = 2Hg + O_2$$

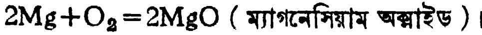
অক্সিজেনের ভৌত ধর্ম। ইহা স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধবিহীন একটি গ্যাস। বায়ুর তুলনায় ইহা কিছুটা ভারী। জলে ইহা খুব অল্প পরিমাণ দ্রবীভূত হয়। মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণী এবং বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ শ্বাসক্রিয়ায় এই দ্রাবিত অক্সিজেন নেয়।

অক্সিজেনের রাসায়নিক ধর্ম। (i) অক্সিজেন নিজে দাহ্য নয়, কিন্তু অন্য পদার্থের দহনে সহায়তা করে। দহনে ও অন্যান্য বিক্রিয়ায় অক্সিজেন **জারকরূপে** কাজ করে।

(ii) কার্বন, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি বেশীর ভাগ মৌলই বিশেষ উষ্ণতায় অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া উহাদের অক্সাইড উৎপন্ন করে।


$2C+O_2=2CO$ (কার্বন মনক্সাইড)


$C+O_2=CO_2$ (কার্বন ডাইঅক্সাইড)


$2Mg+O_2=2MgO$ (ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড)।

(iii) বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিভিন্ন যৌগের সঙ্গে অক্সিজেন বিক্রিয়া করে। কার্বন মনক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড (Nitric Oxide, NO) অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া যথাক্রমে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) উৎপন্ন করে।


$2CO+O_2=2CO_2$

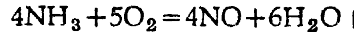

$2NO+O_2=2NO_2$

সোডিয়াম সালফাইড (Sodium sulphite, Na_2SO_3) অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া সোডিয়াম সালফেটে (Sodium sulphate, Na_2SO_4-এ) পরিণত হয় ;


$2Na_2SO_3+O_2=2Na_2SO_4$

প্রভাবকের উপস্থিতিতে ও বিশেষ উষ্ণতায় সালফার ডাইঅক্সাইড (Sulphur dioxide, SO_2) ও অ্যামোনিয়া অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া যথাক্রমে সালফার ট্রাইঅক্সাইড (Sulphur trioxide, SO_3) ও নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে ;


$2SO_2+O_2=2SO_3$


$4NH_3+5O_2=4NO+6H_2O$।

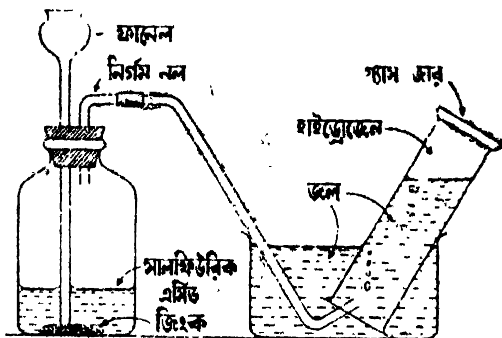
(iv) পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডযুক্ত পটাসিয়াম পাইরোগ্যালেটের (Potassium pyrogallate-এর জলীয় দ্রবণে অক্সিজেন বিক্রিয়া করিয়া দ্রবীভূত হয়।

প্রশ্ন। পরীক্ষাগারে অক্সিজেন তৈয়ারির একটি উপায় এবং অক্সিজেনের ভৌত ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম। অক্সিজেন আমাদের কি কাজে দরকার হয় ?

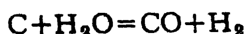
III-8.2 হাইড্রোজেন। ভূত্বকে মৌলরূপে হাইড্রোজেন খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার অসংখ্য যৌগের মধ্যে জল প্রধান।

হাইড্রোজেন তৈয়ারি (Preparation of hydrogen)। বিশুদ্ধ ধাতু, অ্যামোনিয়া, বনস্পতি ইত্যাদি তৈয়ারিতে এবং অন্য গ্যাসের সহিত জ্বালানীরূপে ব্যবহারের জন্য হাইড্রোজেন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা হয়। শিল্পে ব্যবহারের জন্য ইহা সাধারণত জল হইতে তৈয়ারি হয়। কোন কোন দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) ও অয়েল রিফাইনারি গ্যাস (Oil refinery gas) হইতেও ইহা প্রস্তুত হয়। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ইহা সাধারণত এসিড হইতে তৈয়ারি হয়।

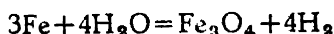
(ক) **জল হইতে**। ইহা বিভিন্ন উপায়ে তৈয়ারি হয়। (i) জলের সহিত বিভিন্ন মৌলের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। উত্তপ্ত কার্বন, উত্তপ্ত লোহা ইত্যাদি জলীয় বাষ্পের সহিত বিক্রিয়া করিয়া হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।



III-8 চিত্র

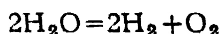


$$C + H_2O = CO + H_2$$

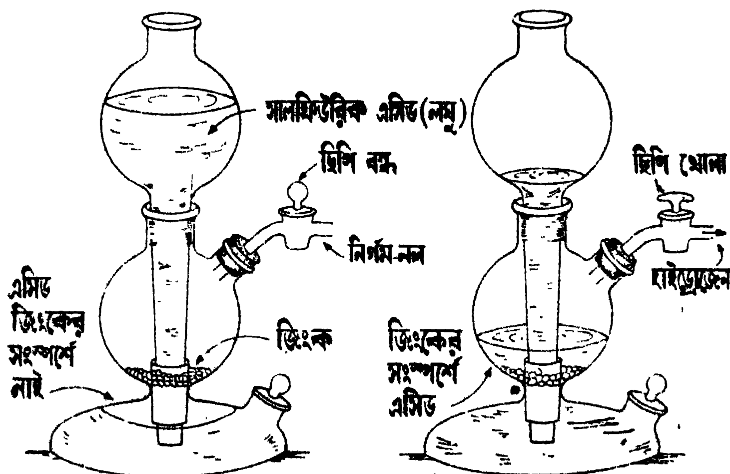


$$3Fe + 4H_2O = Fe_3O_4 + 4H_2$$

(ii) সালফিউরিক এসিড অথবা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড মিশ্রিত জলের ইলেকট্রোলাইসিসে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।



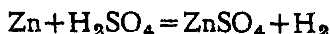
$$2H_2O = 2H_2 + O_2$$



III-9 চিত্র

হা III-4.2 উপবিভাগে বলা হইয়াছে।

(খ) এসিড হইতে। বিভিন্ন ধাতুর সহিত এসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। এ উদ্দেশ্যে পরীক্ষাগারে (Laboratory-তে) সাধারণত জিংক ধাতু ও সালফিউরিক এসিড নেওয়া হয়।



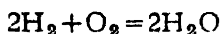
$$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2$$

ফানেল ও নির্গম-নল (Outlet tube)-যুক্ত কোন বোতলে (III-8 চিত্র) অথবা কিপের যন্ত্রে (Kipp's apparatus) (III-9 চিত্র) অপরিশোধিত জিংক ধাতুর ছোট ছোট টুকরা নেওয়া হয় এবং লঘু সালফিউরিক এসিড ফানেলের মধ্য দিয়া ঐ বোতলে অথবা কিপের যন্ত্রে ঢালা হয়। জিংক ধাতুর সংস্পর্শে এসিড আসা মাত্র হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় ও নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া আসে। এই গ্যাস সংগ্রহ করিতে হইলে নির্গম-নল কোন পাত্রের জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। বুদ্বুদের আকারে কিছুক্ষণ হাওয়া মিশ্রিত গ্যাস বাহির হইয়া যাওয়ার পর নির্গম-নলের মুখে জলপূর্ণ গ্যাস-জার (Gas jar) উপুড় করিয়া রাখা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্যাস-জারের জল বাহির করিয়া দিয়া হাইড্রোজেন উহার স্থান অধিকার করে। গ্যাস জারের গ্যাস নিয়া হাইড্রোজেনের বিভিন্ন ধর্ম পরীক্ষা করা যায়।

হাইড্রোজেনের ভৌত ধর্ম। ইহা বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধবিহীন একটি গ্যাস। মৌল ও যৌগের মধ্যে ইহা সবচেয়ে হাল্কা। সেজন্য বেলুন উড়াইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা খুব কম উষ্ণতায় ($-252.7^\circ C$) তরলে পরিণত হয়। জলে ইহা খুব কম পরিমাণে দ্রাবিত হয়।

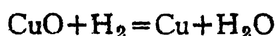
হাইড্রোজেনের রাসায়নিক ধর্ম। সাধারণ অবস্থায় ইহা সক্রিয় নয়। কিন্তু বিশেষ পরিবেশে ইহা **বিজারকরূপে** বিভিন্ন মৌল বা যৌগের সহিত বিক্রিয়া করে।

(i) বায়ুতে বা অক্সিজেন গ্যাসে ইহা জ্বলে ও জল উৎপন্ন করে। শিখার রং ঈষৎ নীলাভ।



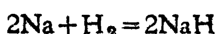
$$2H_2+O_2=2H_2O$$

(ii) উত্তপ্ত ধাতব অক্সাইডকে ইহা বিজারিত করিয়া বিশুদ্ধ ধাতু উৎপন্ন করে। এইরূপে কপার অক্সাইড হইতে কপার (তামা) পাওয়া যায়।



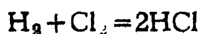
$$CuO+H_2=Cu+H_2O$$

(iii) লিথিয়াম (Lithium), সোডিয়াম ইত্যাদি ধাতুর সহিত বিক্রিয়া করিয়া ইহা উহাদের হাইড্রাইড (Hydride) গঠন করে ;



$$2Na+H_2=2NaH$$

(iv) বিশেষ পরিবেশে ক্লোরিন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি অধাতুর সহিত বিক্রিয়া করিয়া ইহা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন যৌগ উৎপন্ন করে ;



$$H_2+Cl_2=2HCl$$



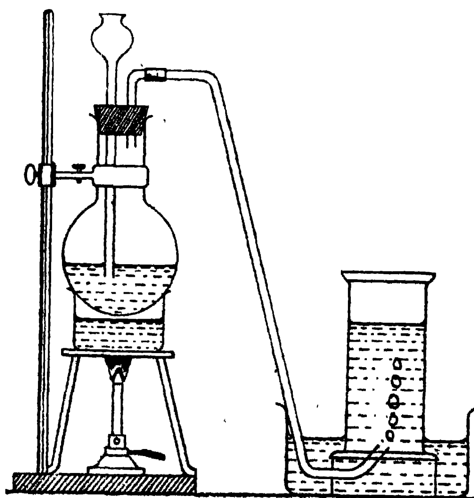
$$3H_2+N_2=2NH_3$$

প্যালাডিয়াম (Palladium), প্ল্যাটিনাম (Platinum) ইত্যাদি কয়েকটি ধাতু হাইড্রোজেন গ্যাস অধিশোষণ (Adsotption) করে। অধিশোষণ একপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া। অধিশোষণের পর ধাতু গরম করিয়া সহজেই হাইড্রোজেন ফেরত পাওয়া যায়।

প্রশ্ন। পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন তৈয়ারির একটি উপায় এবং হাইড্রোজেনের ভৌত ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বল। বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হাইড্রোজেন আমাদের কি কাজে লাগে ?

III-8.3 নাইট্রোজেন (Nitrogen)। মৌলরূপে নাইট্রোজেন বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে আছে। ভূত্বকে নাইট্রেটরূপে ইহা সাধারণত পাওয়া যায়। প্রোটিন (Protein) ও অন্যান্য বহু যৌগের উপাদানরূপে ইহা প্রাণীদেহে ও উদ্ভিদে বর্তমান।

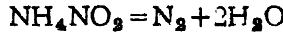
নাইট্রোজেন তৈয়ারি। (ক) বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া নাইট্রিক এসিড ইত্যাদি বিভিন্ন যৌগ তৈয়ার করা হয়। এ উদ্দেশ্যে



III-10 চিত্র

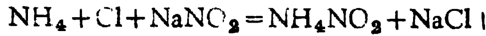
বায়ু তরল করিয়া আংশিক পাতন ক্রিয়ার সাহায্যে নাইট্রোজেন আলাদা করা হয় (III-7.1 উপবিভাগ দেখ)। ইউরিয়া (Urea) প্রভৃতি সারে নাইট্রোজেন আছে।

(খ) পরীক্ষাগার পদ্ধতি। (i) **তত্ত্ব :** অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের ভাঙনে নাইট্রোজেন গ্যাস তৈয়ারি করা হয়।



$$NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O$$

(ii) **প্রক্রিয়া :** ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত একটি ফ্লাস্কে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম নাইট্রাইটের মিশ্রণ রাখা হয় (III-10 চিত্র দেখ)। তারপর ফানেল দিয়া জল ঢালা হয়। ইহাতে নিচের সমীকরণ অনুসারে দ্রবণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট তৈয়ারি হইয়া ভাঙিতে থাকে ;



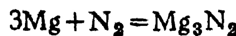
$$NH_4 + Cl + NaNO_2 = NH_4NO_2 + NaCl$$ ।

একটি পাত্রে জল নিয়া ফ্লাস্কটি তাহার উপরে রাখিয়া পাত্রটি গরম করা হয়। তখন পাত্রের জল বাষ্পীভূত হইয়া ফ্লাস্কটিকে গরম করে। ইহাতে নাইট্রোজেন গ্যাস তৈয়ারি হইয়া নির্গম-নল দিয়া বাহিরে আসে। এই গ্যাস সংগ্রহ করার জন্য নির্গম-নল জলে ডুবাইয়া তাহার উপরে জল-ভরা গ্যাসজার উপুড় করিয়া রাখা হয়। তখন জল সরাইয়া গ্যাসজারে নাইট্রোজেন জমে।

নাইট্রোজেনের ভৌত ধর্ম। ইহা স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন একটি গ্যাস। ইহা বায়ুর মতই ভারী। জলে ইহার দ্রাব্যতা খুবই কম।

রাসায়নিক ধর্ম। (i) ইহা দাহ্য নয় এবং দহনেও সাহায্য করে না। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইহা বেশ নিষ্ক্রিয়। সেজন্য পরীক্ষাগারে ও বিভিন্ন শিল্পে নাইট্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে নিষ্ক্রিয় আবহমণ্ডল (Inert atmosphere) সৃষ্টি করা হয়।

(ii) ইহা ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর সহিত বেশী উষ্ণতায় বিক্রিয়া করিয়া উহাদের নাইট্রাইড (Nitride) উৎপন্ন করে।

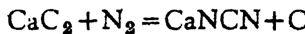


$$3Mg + N_2 = Mg_3N_2$$



$$2Al + N_2 = 2AlN$$

(iii) ক্যালসিয়াম কারবাইডের (Calcium carbide, CaC_2-র) সহিত বেশী উষ্ণতায় নাইট্রোজেন বিক্রিয়া করিয়া ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড (Calcium cyanamide, CaNCN) ও কার্বন সৃষ্টি করে।



$$CaC_2 + N_2 = CaNCN + C$$

(iv) প্রভাবকের উপস্থিতিতে বিশেষ উষ্ণতায় ও চাপে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করিয়া অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে।



$$3H_2 + N_2 = 2NH_3$$

(v) ইলেকট্রিক আর্কের (Electric arc-এর) উষ্ণতায় (প্রায় 3000°C) নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে ;



$$N_2 + O_2 = 2NO$$

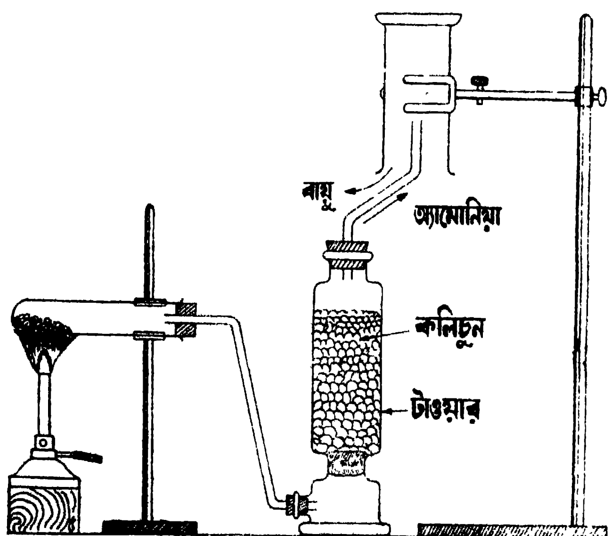
প্রশ্ন। নাইট্রোজেন প্রস্তুত করার একটি উপায় বর্ণনা কর। নাইট্রোজেনের ভৌত ধর্ম ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বল। নাইট্রোজেন আমাদের কি কাজে লাগে ?

III-8.4 অ্যামোনিয়া (Ammonia)। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের পচনে ভূত্বকে অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের সাররূপে বিভিন্ন অ্যামোনিয়াঘটিত যৌগ ব্যবহৃত হয়। সোডিয়াম কার্বনেট উৎপাদনে ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণেও (Refrigeration-এ) অ্যামোনিয়া লাগে। সেজন্য প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করা হয়।

অ্যামোনিয়া তৈয়ারি। (ক) শিল্প পদ্ধতিঃ আয়রন অক্সাইড (Iron oxide) ও অন্যান্য অক্সাইডের উপস্থিতিতে বিশেষ উষ্ণতায় ও চাপে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করিয়া অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে ;



$$N_2 + 3H_2 = 2NH_3$$



III-11 চিত্র

(খ) পরীক্ষাগার পদ্ধতি। তত্ত্বঃ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড (Calcium oxide, CaO), ইত্যাদি ক্ষারকের সহিত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (Ammonium chloride, NH_4 Cl), ও অন্যান্য অ্যামোনিয়াযুক্ত যৌগের বিক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়।



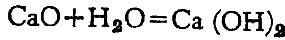
$$NH_4Cl + NaOH = NaCl + NH_3 + H_2O$$



$$2NH_4Cl + CaO = CaCl_2 + 2NH_3 + H_2O$$

প্রক্রিয়া ঃ একটি টেস্টটিউবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম অক্সাইডের (চুনের) মিশ্রণ নিয়া উহাতে একটি নির্গম-নল লাগান হয় (III-11 চিত্র দেখ) নির্গম-লের অন্য প্রান্ত একটি ক্যালসিয়াম অক্সাইড পূর্ণ টাওয়ারের (Tower-এর) নিচের কে লাগান হয়। টাওয়ারের মাথায় লাগান নির্গম-নলের প্রান্তে একটি গ্যাস জার ড় করিয়া রাখা হয়।

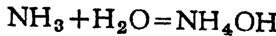
টেস্টটিউবটি গরম করার সঙ্গে সঙ্গে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হইয়া টাওয়ারের মধ্য বিশুষ্ক হইয়া গ্যাস জারে আসে। অ্যামোনিয়া গ্যাসের সহিত উৎপন্ন জলীয় বাষ্প য়ারের ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া উহাতে থাকিয়া যায়।



$$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$$

অ্যামোনিয়ার ভৌত ধর্ম। ইহা বর্ণহীন ও তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত একটি গ্যাস। ইহা বায়ুর তুলনায় হাল্কা।

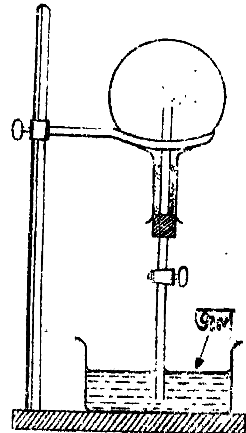
অ্যামোনিয়ার রাসায়নিক ধর্ম। (i) জলে ইহা প্রচুর পরিমাণে দ্রাবিত হয় ও অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে।



$$NH_3 + H_2O = NH_4OH$$

ইহার গাঢ় দ্রবণকে লাইকার অ্যামোনিয়া (Liquor ammonia) বলে। ইহা ত্বকের ক্ষতি করে।

ফোয়ারা পরীক্ষা। একটি ফ্লাস্কে ছিপি আঁটিয়া তাহাতে স্টপককযুক্ত নল লাগান হয়। স্টপকক খুলিয়া ফ্লাস্কে অ্যামোনিয়া গ্যাস ভরা হয় ও স্টপকক বন্ধ করা হয়। তারপর ফ্লাস্কটি উপুড় করিয়া একটি পাত্রের জলে নলের প্রান্ত ডুবাইয়া দিয়া স্টপকক খোলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে অ্যামোনিয়া গ্যাসের সহিত জলের বিক্রিয়ায় জল শোষিত হইয়া নলের মধ্য দিয়া ফ্লাস্কে ওঠে ও ফোয়ারার মত উহার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে (III-12 চিত্র)।



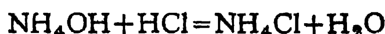
III-12 চিত্র

(ii) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের সহিত অ্যামোনিয়া ক্ষারকরূপে বিক্রিয়া করিয়া অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে।



$$NH_3 + HCl = NH_4Cl$$

অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ ব্যবহৃত হইলে উপরের বিক্রিয়ায় জলও উৎপন্ন হয়।



$$NH_4OH + HCl = NH_4Cl + H_2O$$

একইরূপে অন্যান্য এসিডের সঙ্গে অ্যামোনিয়া বিক্রিয়া করে।

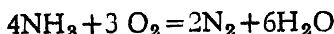
(iii) অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বিভিন্ন যৌগের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া উহাদের হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে। যেমন, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (Magnesium chloride, $MgCl_2$) ও অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড, $Mg(OH)_2$ উৎপন্ন হয়। ইহা জলে খুবই কম দ্রাবিত হয় বলিয়া এই বিক্রিয়ায় দ্রবণের মধ্যে ইহা আলাদা সাদা পদার্থরূপে দেখা দেয়। এই ঘটনাকে **অধঃক্ষেপ হওয়া** বা **প্রিসিপিটেশান** (Precipitation) বলে।

দ্রবণের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে পৃথকীকৃত পদার্থকে বলে **অধঃক্ষেপ** (Precipitate)।



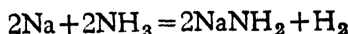
$$MgCl_2 + 2NH_4OH = Mg(OH)_2 + 2NH_4Cl$$

(iv) অ্যামোনিয়া গ্যাস অন্য পদার্থের দহনে সাহায্য করে না। কিন্তু অক্সিজেন গ্যাসে ইহা জ্বালান যায়।



$$4NH_3 + 3O_2 = 2N_2 + 6H_2O$$

(v) ইহা উত্তপ্ত সোডিয়াম ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া সোডিয়াম অ্যামাইড বা সোডামাইড (Sodium amide বা Sodamide, $NaNH_2$) ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।



$$2Na + 2NH_3 = 2NaNH_2 + H_2$$

(vi) নেসলার দ্রবণের (Nessler's solution-এর) সহিত বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া গাঢ় বাদামী রংয়ের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে।

প্রশ্ন। অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করার একটি উপায় বর্ণনা কর। উহার ভৌতধর্ম ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বল। অ্যামোনিয়া আমাদের কি কাজে লাগে?

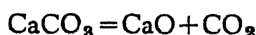
III-8.5. কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide)। বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড অল্প পরিমাণে (0.03%) আছে। চুনাপাথর (Marble, মার্বল) ও বিভিন্ন যৌগে ইহা কার্বনেটরূপে ভূত্বকে থাকে।

উদ্ভিদ বায়ু হইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়া শর্করা জাতীয় বিভিন্ন পদার্থ তৈয়ারি করে।

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে (Fire extinguisher-এ) এবং সোডিয়াম কার্বনেট, বাতান্বিত জল (Aerated water বা Soda water) ইত্যাদি তৈয়ারিতে কার্বন

ডাইঅক্সাইড ব্যবহৃত হয়। চাপে ও ঠাণ্ডায় জমান কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড অন্যান্য দ্রব্য ঠাণ্ডা করার কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা 'শুকনা বরফ' (Dry ice) নামে পরিচিত।

কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি। শিল্পে ব্যবহারের জন্য চুনাপাথর (Calcium carbonate, $CaCO_3$) উত্তপ্ত করিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করা হয়।

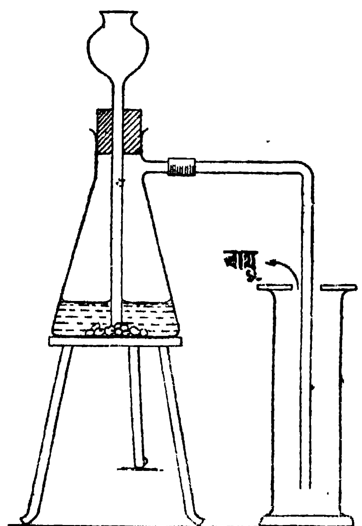


$$CaCO_3 = CaO + CO_2$$

পরীক্ষাগার পদ্ধতি তত্ত্ব : যে কোন কার্বনেট বা বাইকার্বনেটে হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফিউরিক এসিড ইত্যাদি দিলে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। পরীক্ষাগারে সাধারণত চুনাপাথর ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করা হয়।



$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$$



III-13 চিত্র

প্রক্রিয়া : ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত ফ্লাস্কে (III-13 চিত্র) অথবা কিপের যন্ত্রের গোলাকার অংশগুলির মাঝেরটিতে (III-9 চিত্র) মার্বেলের টুকরা নেওয়া হয় এবং ফানেল দিয়া জল মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড ঢালা হয়। এসিড মার্বেলের সংস্পর্শে আসা মাত্র কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। গ্যাসজার খাড়া রাখিয়া উহাতে নির্গম-নল ঢুকান হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসজারের বায়ু দূর করিয়া উহাতে জমা হয়, কারণ উহা বায়ুর চেয়ে ভারী।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভৌত ধর্ম। ইহা বর্ণহীন, খুব মৃদু গন্ধযুক্ত ও অম্লস্বাদযুক্ত একটি গ্যাস। ইহা বায়ুর তুলনায় প্রায় দেড়গুণ ভারী। খুব ঠাণ্ডায় ও চাপে ইহাকে সহজেই তরলে অথবা কঠিনে পরিণত করা যায়।

রাসায়নিক ধর্ম। (i) ইহা দাহ্য নয় এবং দহনেও সাহায্য করে না। সেজন্য আগুন নিভাইবার কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়।

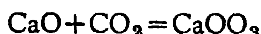
(ii) ইহা জলে দ্রবীভূত হইয়া কার্বনিক এসিড (Carbonic acid, H_2CO_3) উৎপন্ন করে।



$$H_2O+CO_2=H_2CO_3$$

এই কারণে জলীয় দ্রবণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিক্রিয়া আসলে কার্বনিক এসিডের বিক্রিয়া।

(iii) ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ইহা ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন করে।



$$CaO+CO_2=CaOO_3$$

(iv) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, ইত্যাদি ক্ষারজাতীয় পদার্থের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ইহা ক্রমান্বয়ে উহাদের কার্বনেট ও বাইকার্বনেট (বা এসিড-কার্বনেট) উৎপন্ন করে। $Ca(OH)_2$-র দ্রবণ, অর্থাৎ চুনের জলের ক্ষেত্রে বিক্রিয়া হয়



$$Ca(OH)_2+H_2CO_3=CaCO_3+2H_2O$$



$$CaCO_3+H_2CO_3=Ca(HCO_3)_2$$

সমীকরণে দেখান এই বিক্রিয়ায় প্রথমে $CaCO_3$ অধঃক্ষেপরূপে পাওয়া যায়; কিন্তু অতিরিক্ত কার্বনিক এসিডে ইহা বাইকার্বনেটে রূপান্তরিত হইয়া জলে দ্রাবিত হয়।

(v) বেশী উষ্ণতায় ক্ষেত্রবিশেষে কার্বন ডাইঅক্সাইড জারকরূপে বিক্রিয়া করে। যেমন, উত্তপ্ত কার্বনের সহিত বিক্রিয়ায় ইহা কার্বন মনক্সাইড উৎপন্ন করে।



$$CO_2+C=2CO$$

উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় ইহা ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ও কার্বন উৎপন্ন করে।



$$2Mg+CO_2=2MgO+C$$

প্রশ্ন। পরীক্ষাগারে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈয়ারির একটি উপায় বর্ণনা কর। উহার ভৌত ধর্ম ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বল।

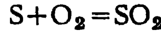
কার্বন ডাইঅক্সাইড আমাদের কি কাজে লাগে? 'শুকনা বরফ' বা Dry ice বলিতে কি বুঝায়?

III-8.6. সালফার ডাইঅক্সাইড (Sulphur dioxide)। সালফারের (গন্ধকের) সহিত বিভিন্ন অনুপাতে অক্সিজেন যুক্ত হইয়া উহার বিভিন্ন যৌগ উৎপন্ন করে। ইহাদের মধ্যে একমাত্র সালফার ডাইঅক্সাইড খুব সহজে তৈয়ারি করা যায়।

সালফিউরিক এসিড তৈয়ারির জন্য সালফার ডাইঅক্সাইড প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা হয়। রোগবীজাণু নাশ করিতে এবং বিভিন্ন শিল্পে বিজারকরূপে ক্রিয়া করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

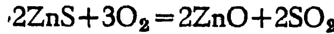
সালফার ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি। (ক) শিল্প পদ্ধতিঃ

(i) প্রধানত বায়ুতে অথবা অক্সিজেনে সালফার পোড়াইয়া সালফার ডাই-অক্সাইড তৈয়ারি হয়।



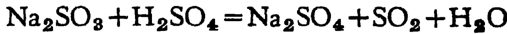
$$S+O_2=SO_2$$

(ii) বিভিন্ন ধাতুর সালফাইড পোড়াইয়াও সালফার ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি হয়। জিংক সালফাইড (Zinc sulphide, ZnS) হইতে জিংক অক্সাইড (Zinc oxide, ZnO) ও SO_2 এইরূপে পাওয়া যায় ;

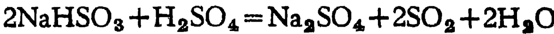


$$2ZnS+3O_2=2ZnO+2SO_2$$

(খ) পরীক্ষাগার পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতি। (i) **তত্ত্বঃ** সোডিয়াম সালফাইট (Sodium sulphite, Na_2SO_3) অথবা সোডিয়াম বাইসালফাইটে (Sodium bisulphite, $NaHSO_3$-তে) সালফিউরিক এসিড দিলে সোডিয়াম সালফেট (Sodium sulphate, Na_2SO_4) ও সালফার ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি হয়।



$$Na_2SO_3+H_2SO_4=Na_2SO_4+SO_2+H_2O$$



$$2NaHSO_3+H_2SO_4=Na_2SO_4+2SO_2+2H_2O$$

প্রক্রিয়াঃ কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি করার মত (III-13 চিত্র দেখ) যন্ত্র সাজাইয়া ফ্লাস্কে সোডিয়াম সালফাইট অথবা সোডিয়াম বাইসালফাইটের গাঢ় জলীয় দ্রবণ নেওয়া হয় এবং ফানেলের মধ্য দিয়া গাঢ় সালফিউরিক এসিড দেওয়া হয়। এসিড ও সালফাইটের বিক্রিয়ায় সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হইয়া নির্গম-নল দিয়া বাহিরে আসে ও গ্যাসজারে জমা হয়। বায়ুর তুলনায় ভারী বলিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডের মত ইহাও গ্যাসজারের বায়ু উপর দিকে ঠেলিয়া দিয়া উহার স্থান অধিকার করে।

(ii) **দ্বিতীয় পদ্ধতি। তত্ত্বঃ** কপার, সালফার, মারকারি ইত্যাদি বিভিন্ন মৌল গরম অবস্থায় গাঢ় সালফিউরিক এসিডকে বিজারিত করিয়া সালফার ডাই-

অক্সাইড উৎপন্ন করে। কপারের এইরূপ বিক্রিয়ায় কপার সালফেটও ($CuSO_4$) তৈয়ারি হয়।



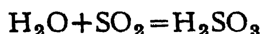
$$Cu + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$

প্রক্রিয়া: ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত ফ্লাস্কে কপার ধাতু নেওয়া হয়। গাঢ় সালফিউরিক এসিড ফানেলের মধ্য দিয়া ঢালিয়া মিশ্রণটি সাবধানে গরম করা হয়। উদ্ভূত সালফার ডাইঅক্সাইডকে আগের মতই সংগ্রহ করা হয়।

সালফার ডাইঅক্সাইডের ভৌত ধর্ম। ইহা তীব্র গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস ও বায়ুর তুলনায় ভারী। ঠাণ্ডা করিয়া ইহাকে সহজেই তরল করা যায়।

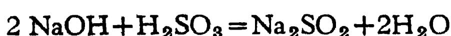
(খ) রাসায়নিক ধর্ম। (i) ইহা দাহ্য নয় এবং সাধারণত অন্য পদার্থের দহনে সহায়তা করে না।

(ii) ইহা জলে দ্রাবিত হইয়া সালফিউরাস এসিড (Sulphurous acid, H_2SO_3) উৎপন্ন করে,

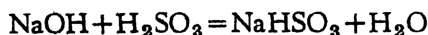


$$H_2O + SO_2 = H_2SO_3$$

(iii) ইহা ক্ষার জাতীয় পদার্থের সহিত বিক্রিয়া করে। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া ইহা ক্রমান্বয়ে সোডিয়াম সালফাইট ও বাইসালফাইট উৎপন্ন করে।

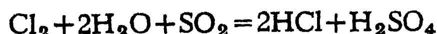


$$2\ NaOH + H_2SO_3 = Na_2SO_2 + 2H_2O$$

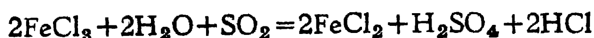


$$NaOH + H_2SO_3 = NaHSO_3 + H_2O$$

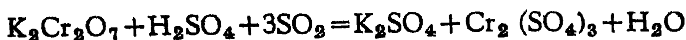
(iv) ক্লোরিন, ফেরিক ক্লোরাইড (Ferric chloride, $FeCl_3$) সালফিউরিক এসিডযুক্ত পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট (Potassium dichromate, $K_2Cr_2O_7$) ইত্যাদিকে ইহা বিজারিত করিয়া যথাক্রমে হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ফেরাস ক্লোরাইড (Ferrous chloride, $FeCl_2$) ও ক্রোমিক সালফেটে (Chromic sulphate, $Cr_2(SO_4)_3$-তে) পরিণত করে এবং নিজে সালফিউরিক এসিডে অথবা সালফেটে জারিত হয়।



$$Cl_2 + 2H_2O + SO_2 = 2HCl + H_2SO_4$$



$$2FeCl_3 + 2H_2O + SO_2 = 2FeCl_2 + H_2SO_4 + 2HCl$$



$$K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 + 3SO_2 = K_2SO_4 + Cr_2\ (SO_4)_3 + H_2O$$

(v) বিশেষ উষ্ণতায় ও প্রভাবকের উপস্থিতিতে সালফার ডাইঅক্সাইড অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া সালফার ট্রাইঅক্সাইড (Sulphur trioxide, SO_3) গ্যাস উৎপন্ন করে।



$$2SO_2 + O_2 = 2SO_3$$

(vi) হাইড্রোজেন সালফাইডের সঙ্গে ইহা জারকরূপে বিক্রিয়া করে।



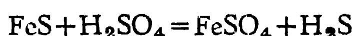
$$SO_2+2H_2S=3S+2H_2O$$

প্রশ্ন। সালফার ডাইঅক্সাইড তৈয়ারি করার একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। উহার ভৌত ধর্ম ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বল। এই গ্যাস আমাদের কি কাজে লাগে? সালফার ট্রাইঅক্সাইড কি ভাবে তৈয়ারি করা যায়?

III-8.7 সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন বা হাইড্রোজেন সালফাইড (Sulphuretted hydrogen or Hydrogen sulphide)। হাইড্রোজেনের সঙ্গে সালফারের বিভিন্ন যৌগের মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) প্রধান। বায়ুতে ইহা খুব কম পরিমাণে থাকে। পচা ডিম ও অন্যান্য অনেক পচা জিনিসের দুর্গন্ধ এই যৌগটির জন্যই।

হাইড্রোজেন সালফাইড তৈয়ারি : আয়রন, কপার ইত্যাদি কয়েকটি সালফাইডের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক এসিড অথবা লঘু সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সালফাইড তৈয়ারি হয়।

ল্যাবরেটরী পদ্ধতি : (ক) তত্ত্ব : পরীক্ষাগারে ফেরাস সালফাইড (Ferrous sulphide, FeS) ও লঘু সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়ায় H_2S তৈয়ারি হয়।



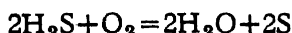
$$FeS+H_2SO_4=FeSO_4+H_2S$$

এই সঙ্গে ফেরাস সালফেট (Ferrous sulphate, $FeSO_4$)-ও উৎপন্ন হয়।

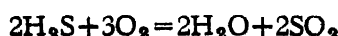
(খ) প্রক্রিয়া : হাইড্রোজেন তৈয়ারির মত যন্ত্র সাজাইয়া (III-8 ও III-9 চিত্র দেখ) ফ্লাস্কে অথবা কিপের যন্ত্রের মধ্যেকার গোলাকার অংশে ফেরাস সালফাইড নেওয়া হয় ও লঘু সালফিউরিক এসিড ফানেল দিয়া ঢালা হয়। ফেরাস সালফাইডের সংস্পর্শে এসিড আসা মাত্র হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হইয়া নির্গম-নল দিয়া বাহির হয়। ইহা জলে দ্রবীভূত হয় বলিয়া জলের প্রতিস্থাপনে (Displacement-এ) ইহাকে সংগ্রহ করা হয় না। বায়ুর তুলনায় ভারী বলিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইডের মত বায়ুর প্রতিস্থাপনে ইহা সংগ্রহ করা হয়।

হাইড্রোজেন সালফাইডের ভৌত ধর্ম। ইহা বর্ণহীন ও পচা ডিমের মত গন্ধযুক্ত একটি বিষাক্ত গ্যাস ও বায়ুর তুলনায় ভারী।

(গ) রাসায়নিক ধর্ম। (i) ইহা দহনে সহায়তা করে না, কিন্তু নিজে দাহ্য। ইহার জ্বলনে সালফার অথবা সালফার ডাইঅক্সাইড ও জল তৈয়ারি হয়।



$$2H_2S+O_2=2H_2O+2S$$



$$2H_2S+3O_2=2H_2O+2SO_2$$

(ii) ইহা জলে দ্রাবিত হয় ও এসিডজাতীয় দ্রবণ উৎপন্ন করে। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ইহা ক্রমান্বয়ে সোডিয়াম সালফাইড ও সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইড (Sodium hydrosulphide, NaHS) উৎপন্ন করে।



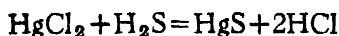
$$2NaOH + H_2S = Na_2S + 2H_2O$$



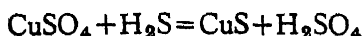
$$NaOH + H_2S = NaHS + H_2O$$

অন্যান্য ক্ষারের সঙ্গেও ইহা একইরূপে বিক্রিয়া করে।

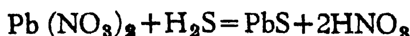
(iii) মারকিউরিক ক্লোরাইড (Mercuric chloride, $HgCl_2$), কপার সালফেট, লেড নাইট্রেট (Lead nitrate, $Pb(NO_3)_2$) ইত্যাদির দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস প্রবেশ করাইলে যথাক্রমে মারকিউরিক সালফাইড (HgS), কপার সালফাইড (CuS) ও লেড সালফাইড (PbS) অধঃক্ষেপরূপে পাওয়া যায়।



$$HgCl_2 + H_2S = HgS + 2HCl$$



$$CuSO_4 + H_2S = CuS + H_2SO_4$$

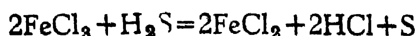


$$Pb(NO_3)_2 + H_2S = PbS + 2HNO_3$$

(iv) ক্লোরিন, ফেরিক ক্লোরাইড ইত্যাদির সঙ্গে ইহা বিজারক রূপে বিক্রিয়া করে এবং যথাক্রমে হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও ফেরাস ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। ইহার জারণে সালফার উৎপন্ন হয়।



$$Cl_2 + H_2S = 2HCl + S$$



$$2FeCl_3 + H_2S = 2FeCl_2 + 2HCl + S$$

প্রশ্ন। হাইড্রোজেন সালফাইডের অন্য নাম কি? ইহা কিভাবে তৈয়ারি করা যায়? ইহার ভৌতধর্ম ও তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বল।

বিবিধ প্রশ্ন

প্রথম অংশ—রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যা উভয়ে প্রযোজ্য

(I-1 হইতে I-1.5 বিভাগ পর্যন্ত)

1. মাপনের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম কর, এবং উহাদের কোনটিতে দৈর্ঘ্য ভর ও কালের একক কি কি বল।

2. শক্তি কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার শক্তির নাম কর ও উহাদের রূপান্তরের তিনটি উদাহরণ দাও।

3. ভর ও শক্তির নিত্যতা বা সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর।

ভর ও ভারে প্রভেদ কি? ভর আছে অথচ ভার নাই ইহা কোন্ অবস্থায় হইতে পারে?

4. পদার্থের বিভিন্ন প্রকার অবস্থান্তর উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর। স্ফুটন ও বাষ্পনে প্রভেদ কি?

5. গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কাহাদের বলে? উহারা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? জলের স্ফুটনাঙ্ক কি ভাবে বাড়ান বা কমান যায়? বরফ 0°C-র নিচে কি ভাবে গলাইতে পার?

6. লীন তাপ কাহাকে বলে? বরফের লীন তাপ প্রতি গ্রামে 80 ক্যালরি বলিলে কি বুঝায়? এক শিশি জল বরফ দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে উহা জমিবে কিনা বুঝাইয়া বল।

দ্বিতীয় অংশ—পদার্থ-বিদ্যা

(II-1 হইতে II-6 বিভাগ পর্যন্ত)

1. স্থিতি ও গতিকে আপেক্ষিক বলা হয় কেন? বেগ ও দ্রুতিতে প্রভেদ কি? ত্বরণ ও মন্দন কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বুঝাও। ত্বরণ বা মন্দনের উল্লেখে সময়ের একক দুবার আসে কেন?

2. নিউটনের গতিবিষয়ক সূত্রগুলি বল। জাড্য বলিতে কি বুঝায় উদাহরণ দিয়া বল।

3. নিউটনের প্রথম সূত্র হইতে বলের কি সংজ্ঞা পাওয়া যায়? দ্বিতীয় সূত্র বল মাপনের কি উপায় নির্দেশ করে? তৃতীয় সূত্র প্রথম দুটি হইতে কি বিষয়ে পৃথক?

4. বলের সংজ্ঞা দাও ও ক্রিয়াগুলি বল।

10 গ্রাম ভরকে প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে 30 সেমি ত্বরণ দিতে কত বলের প্রয়োজন? 40 পাউণ্ডাল বলে 2 পাউণ্ড ভরে কত ত্বরণ হইবে?

5. কার্য ও ক্ষমতা বলিতে কি বুঝায়? কোন বল দ্বারা কৃত কার্য ও উহা দ্বারা ব্যয়িত ক্ষমতা জানিতে হইলে কি কি রাশি জানা থাকা দরকার?

গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি কি? উহাদের একটি হইতে অন্যটিতে রূপান্তরের উদাহরণ দাও।

6. আর্গ, জুল, ওয়াট, ফুট-পাউণ্ড, হর্স পাওয়ার কাহাদের বলে?

ভূমি হইতে 10 মিটার উচ্চতায় এক কিলোগ্রাম ভর সেকেণ্ডে 5 মিটার বেগে চলিতেছে। উহার স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি কত?

7. বিভিন্ন শ্রেণীর লিভারের একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া উহাদের সুবিধা অসুবিধা বুঝাইয়া বল।

8. নত-তল বা চক্র-ও অক্ষদণ্ডের সাহায্যে আমাদের কার্য করিতে কি সুবিধা হয় বুঝাও।

9. তাপ ও উষ্ণতার প্রভেদ কি? কোন বস্তু উষ্ণ করিতে যে তাপ লাগিবে তাহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

10. তাপ এক প্রকার শক্তি এ সিদ্ধান্তে কি ভাবে আসা যায়? কার্যের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? তাপশক্তি কি প্রকারের শক্তি, এ সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

11. প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সূত্রগুলি বল এবং উহাতে ব্যবহৃত বিশেষ কথাগুলির অর্থ বুঝাও। প্রতিসরাঙ্ক কাহাকে বলে? উহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

12. সমান গভীর জলে দাঁড়াইয়া থাকিলে পায়ের কাছেই জল সব চেয়ে গভীর মনে হয় কেন?

13. পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কি অবস্থায় ঘটে বুঝাইয়া বল। কিরূপ অবস্থা হইলে মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা যাইতে পারে?

14. উত্তল লেন্সের সাহায্যে আলো কি করিয়া কেন্দ্রীভূত হয়? আলো কেন্দ্রীকরণের ক্ষমতা লেন্সের কি কি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে? উত্তল লেন্সের ফোকস ও ফোকস-দূরত্ব কাহাদের বলে? ফোকস-দূরত্ব কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

15. উত্তল লেন্সের সাহায্যে ছোট জিনিসকে কি ভাবে বড় করিয়া দেখা যায়, ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া বল।

16. আলোর বিচ্ছুরণ কাহাকে বলে? দীপকের বর্ণালি বলিতে কি বুঝায়? সূর্যের আলোর বর্ণালি কি ভাবে দেখা যায়? বর্ণালির সাহায্যে দীপক সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা যায় কি?

তৃতীয়-অংশ—রসায়ন

(III-1 হইতে III-8 বিভাগ পর্যন্ত)

1. বিশুদ্ধ পদার্থ কি কারণে তিন অবস্থায় থাকিতে পারে বুঝাইয়া বল। গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বলিতে কি বুঝায়? সকল পদার্থেরই কি এগুলি থাকে? কি প্রকার ক্ষেত্রে গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক এক হয়।

2. দেখিতে এক রকম দুটি পদার্থকে উহাদের (ক) ভৌতধর্মের, (খ) রাসায়নিক ধর্মের সাহায্যে কি ভাবে চেনা যাইতে পারে, তাহা দুইটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

3. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন তুলনা কর।

তাপ উৎপাদক ও তাপ শোষক পরিবর্তনের একটি করিয়া ভৌত রাসায়নিক উদাহরণ দাও।

4. কি কি বিষয় রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করিতে পারে তাহাদের নাম কর ও প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

5. মৌল ও যৌগ কাহাদের বলে? প্রত্যেকের তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও। ধাতু ও অধাতুর ধর্ম তুলনা কর। সকল মৌলকেই কি এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? উদাহরণ দাও।

6. দ্রবণ, দ্রাবক ও দ্রাব কথাগুলির অর্থ বল। সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত দ্রবণ কাহাদের বলে? ইহাদের উপর উষ্ণতার ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। উদাহরণ দাও।

দ্রাব্যতা কাহাকে বলে? উহার উপর উষ্ণতার ক্রিয়া কি? গ্যাসীয় দ্রবণে চাপের ক্রিয়া কি?

7. রাসায়নিক চিহ্ন (Symbol) ও সংকেত (Formula) বলিতে কি বুঝায়? মৌল ও যৌগের ক্ষেত্রে ইহাদের কি কি বিভিন্ন তাৎপর্য আছে বল।

8. রাসায়নিক সমীকরণ বলিতে কি বুঝায়? সমীকরণ প্রতিমান (balance) করার অর্থ কি? উদাহরণ দিয়া অপ্রতিমিত ও প্রতিমিত সমীকরণের প্রভেদ বুঝাও।

9. ইলেকট্রোলাইসিস কাহাকে বলে? ইলেকট্রোলাইট বলিতে কি বোঝ? জলকে ইলেকট্রোলাইসিসের সাহায্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে বিচ্ছিন্ন করার কোন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

10. ইলেকট্রোপ্লেটিং কাহাকে বলে? উহার উদ্দেশ্য কি? ইলেকট্রোপ্লেটিং করিতে কি প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়?

11. এসিড, ক্ষারক ও লবণ কাহাদের বলে? প্রত্যেকের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

এসিড ও ক্ষারকের ধর্মগুলি বর্ণনা কর।

প্রশমন বলিতে কি বুঝায়? সম্পূর্ণ প্রশমন কি ভাবে বোঝা যায়?

12. শমিত লবণ, এসিড লবণ ও ক্ষারকীয় লবণ কাহাদের বলে একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

13. জারণ ও বিজারণ কাহাকে বলে? তিনটি জারক ও তিনটি বিজারকের নাম বল। জারণ ও বিজারণ একই সঙ্গে ঘটে এ কথা বলার তাৎপর্য কি?

14. বায়ুকে কি অবস্থায় তরল করা যায়? তরলবায়ু রাখিয়া দিলে উহা হইতে কোন্ গ্যাস বেশী উবিয়া যায়? তরল বায়ু কি রকম পাত্রে রাখা হয়?

বায়ুতে যে পাঁচটি বিরল গ্যাস আছে তাহাদের নাম কর। উহাদের প্রত্যেকের একটি করিয়া প্রয়োগ বল।

হিলিয়াম গ্যাস আমরা প্রধানত কোথা হইতে পাই?

15. নাইট্রোজেন-চক্র ও কার্বন ডাইঅক্সাইড-চক্র বলিতে কি বুঝায় লিপিচিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

16. নিচের যে কোন একটি পদার্থ পরীক্ষাগারে কি করিয়া তৈয়ার করা যায় বল। উহার ধর্মগুলিও বল।

(১) অক্সিজেন; (২) হাইড্রোজেন; (৩) নাইট্রোজেন, (৪) আমোনিয়া, (৫) সালফার ডাইঅক্সাইড; (৬) হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), (৭) কার্বন ডাইঅক্সাইড।

1. শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ কর :—

(১) সিজিএস্ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক —, ভরের একক —, সময়ের একক —।

(২) এম্‌কেএস্ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক —, ভরের একক —, সময়ের একক—।

(৩) এফ্‌পিএস্ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক —, ভরের একক —, সময়ের একক —

(৪) দৈর্ঘ্যের মাপন যন্ত্র —, ভরের মাপন যন্ত্র —, আয়তনের মাপন যন্ত্র —।

(৫) শূন্যস্থানে আলোর বেগ সেকেণ্ডে — মিটার বা — মাইল।

(৬) জুল — একক, হর্স পাওয়ার — একক, ফুট-পাউণ্ড — একক। (কোন্ রাশির একক তাহা বল।)

(৭) ওয়াট — একক, কিলোওয়াট হর্স পাওয়ার অপেক্ষা —।

(৮) এসিডে — যোগ করিলে উহা লবণে পরিণত হয়।

(৯) ইলেকট্রোলাইসিস সেলে পজিটিভ আয়নগুলি — যায়; নিগেটিভ আয়নগুলি — যায়।

(১০) 'শুকনা বরফ' বা 'Dry ice' বলিতে কঠিন — বুঝায়।

2. ডানদিকের কথাগুলি হইতে ঠিক কথাটি নিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(১) তামা —, সিলিকন —, সালফার —। (ধাতুকল্প, অধাতু, ধাতু)

(২) চিনির দ্রবণ বিদ্যুৎ —, বিশুদ্ধ জল —, নুনের দ্রবণ —। (পরিবাহী, অপরিবাহী)

(৩) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস —, কিন্তু উহার দ্রবণ —। (এসিড, এসিড নয়)

(৪) — ও — -এর ক্রিয়ায় — উৎপন্ন হয়। (এসিড, ক্ষারক, লবণ)

(৫) — — কৈ প্রশমিত করে। (এসিড, ক্ষারক, লবণ)

(৬) — জারক ও —বিজারক। (অক্সিজেন, হাইড্রোজেন)

(৭) হিলিয়াম প্রধানত আসে — হইতে। (বায়ু, ভূত্বকের প্রাকৃতিক গ্যাস)

(৮) নিয়ন গ্যাস হইতে আলো পাওয়া যায় — জন্য। ভাস্বরতার, বিদ্যুৎপ্রবাহের।

৪. শুদ্ধ কথাটি রাখিয়া অন্যটি কাটিয়া দাও :—

(১) মেট্রিক পদ্ধতিতে মিটার দৈর্ঘ্যের একক/মানক।

(২) এম্‌কেএস্ পদ্ধতিতে কিলোগ্রাম ভরের একক/মানক।

(৩) এফপিএস্ পদ্ধতিতে গজ (yard) দৈর্ঘ্যে একক/মানক।

(৪) সিজিএস্ পদ্ধতিতে আয়তনের একক মিলিলিটার/এক ঘন সেন্টিমিটার।

(৫) তুলায় যে ভর মাপা হয় তাহা মহাকর্ষীয়/জড়ত্বীয় ভর।

(৬) ত্বরণের সাহায্যে যে ভর মাপা যায় তাহা মহাকর্ষীয়/জড়ত্বীয় ভর।

(৭) নকল উপগ্রহে তুলার সাহায্যে ভর মাপা যায়/যায় না।

(৮) সকল প্রকার গ্যাসকে তরল করা যায়/যায় না।

(৯) কাচের নির্দিষ্ট গলাঙ্ক আছে/নাই।

(১০) বরফের গলনের লীন তাপের চেয়ে জলের বাষ্পনের লীন তাপ বেশী/কম।

(১১) চক্র-ও-অক্ষদণ্ডের ক্রিয়া লিভারের মত/মত নয়।

(১২) আলোক রশ্মি বাস্তব/কল্পিত।

(১৩) স্বচ্ছ পদার্থে আলোর বেগ শূন্য স্থানের চেয়ে বেশী/কম।

(১৪) কাচে আলোর বেগ জলে আলোর বেগের চেয়ে কম/বেশী।

(১৫) কাচে লাল আলোর বেগ নীল আলোর চেয়ে কম/বেশী।

(১৬) দহন তাপশোষক/তাপ বিকিরক বিক্রিয়া।

(১৭) নির্দিষ্ট পরিমাণ জলে যত ইচ্ছা চিনি দ্রবিত করা যায়/যায় না।

(১৮) পিতলের চামচে নিকেলের প্রলেপ দিতে চামচকে অ্যানোড/ক্যাথোড করা হয়।

(১৯) তরলবায়ু উবিতে থাকিলে উহাতে অক্সিজেনের/নাইট্রোজেনের আধিক্য ঘটে।

(২০) বায়ুর রাসায়নিক সংকেত আছে/নাই।

4. শুদ্ধ কথাটির আগে ✓ চিহ্ন দাও :—

(১) (ক) অণুর স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তিই তাপ শক্তি।

(খ) উষ্ণতার প্রভেদে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যে শক্তি যায় তাহাই তাপশক্তি।

(গ) কার্যই তাপশক্তি।

(২) (ক) নিয়ন বাতি উষ্ণ হইয়া আলো দেয়।

(খ) নিয়ন বাতিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ গেলে উহা আলো দেয়।

(গ) নিয়ন বাতি নিজ হইতেই আলো দেয়; অন্ধকার হইলে তাহা দেখা যায়।

(৩) (ক) উত্তল লেন্‌স্ কেবল সমান্তরাল আলোক কিরণকে এক বিন্দুতে সংহত করিতে পারে।

(খ) উত্তল লেন্‌স্ যে কোন বিন্দু দীপক হইতে আগত আলোক কিরণকে এক বিন্দুতে সংহত করিতে পারে।

(গ) বিন্দু দীপক উত্তল লেন্‌সের ফোকাসের চেয়ে দূরে থাকিলে লেন্‌স্ উহা হইতে আগত আলোকে এক বিন্দুতে সংহত করিতে পারে।